Ali Hasan Osama (Hafijullah)

অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম: আলী হাসান উসামা

জন্ম: ২২ - ০৮ - ১৯৯৫

জন্মস্থান: সিলেট

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ১ম স্থান, হিফজ বিভাগ, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ কাওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ); দ্বাদশ স্থান, ফজিলত বিভাগ, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ কাওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ); ষষ্ঠ স্থান, তাকমিল (মাস্টার্স) বিভাগ, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ কাওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ)।

কর্মজীবন: অনুবাদক শিক্ষা-সমাপনের পর ২০১৭ সনে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। বর্তমানে তিনি মাদানি নেসাবের আলোকে পরিচালিত একটি স্বনামধন্য কাওমি মাদরাসায় বিভাগীয় প্রধান হিসেবে এবং পাশাপাশি একটি ইসলামিক ফিকহ ইনস্টিটিউটে সহযোগী মুফতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও কয়েকটি প্রকাশনী এবং ইসলামি মাসিক পত্রিকার সাথে নিয়মিত কাজ করছেন।

অনুবাদকের প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য অন্যান্য বই: মাযহাব বিরোধিতার খণ্ডন (অনুবাদ), তাবেয়িদের চোখে দুনিয়া (অনুবাদ), শাসকের দরবারে আলিমদের গমনাগমনে সতর্কবাণী (অনুবাদ), উলামা চরিত (অনুবাদ), ফিতনার বজ্রধ্বনি (মৌলিক রচনা), মিল্লাতে ইবরাহিম (মৌলিক রচনা), ইসলামে রাষ্ট্রের বিভাজন

এক রাসূলদ্রোহীর করুণ সাজা
July 24, 2015 at 5:18 AM

আলী হাসান উসামা:

কা’ব বিন আশরাফ। আরবের বিখ্যাত কবি। সারা আরব জুড়ে তার বেশ নামডাক। বদর যুদ্ধে কাফের গোষ্ঠীর নির্মম পরাজয়ের সংবাদ তার কানে পৌঁছলে শরবিদ্ধ ঈগলের মতো ছটফট করতে থাকে সে। ক্রোধের অনলে দগ্ধ হয়ে ভাবে ‘যেভাবে হোক মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিছু একটা করতে হবে, নইলে যে মক্কা ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি জমাতে হবে।’ এই পরিকল্পনা নিয়ে মদীনা থেকে মক্কার পথে যাত্রা করলো কা’ব। মক্কায় এসে নিহত নেতৃবৃন্দের স্মরণে শোকগাঁথা রচনা করে লোকালয়ে আবৃত্তি করে শোনালো। শুধু এতে ক্ষান্ত হলো না। রাসূল সা. ও তার সঙ্গীদেও বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্ররোচনা দিতে লাগলো। কোরাইশদের নিয়ে হারাম শরীফের গিলাফ ধরে শপথ করে বললো, আমরা এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে ছাড়বো। এরপর সবাইকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে মদীনায় ফিরে এলো।

মদীনায় এসে কা’ব মুসলিম নারীদের বিরুদ্ধে নানা রকম অশ্লীল কবিতা রচনা করে তা আবৃত্তি করতে লাগলো। প্রিয়নবীর বিরুদ্ধেও তার কাব্য রচনা অব্যাহত থাকলো। এরই মাঝে একদিন কৌশল এঁটে সে রাসূল সা.কে তার বাড়িতে সাদর আমন্ত্রণ জানালো। রাসূল সা. ও সরল মনে এসে হাজির হলেন। জিবরীল আ. প্রিয়নবীকে জানিয়ে দিলেন কা’বের দুরভিসন্ধির কথা, প্রাণনাশের চক্রান্তের কথা। ফেরেশতার ডানার ছায়ায় নবীজী ফিরে এলেন আপন ঘরে। ঘোষণা করলেন কা’বের মৃত্যুদণ্ডের রায়। রায় কার্যকর করার দায়িত্ব নিলেন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা.। কৌশল এঁটে কা’বের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করলেন তিনি। তার সামনে তুলে ধরলেন নিজের অসহায় অবস্থা। কোন কিছু বন্ধক রাখার বিনিময়ে সাহায্য চাইলেন তার কাছে। কা’ব বললো, ‘ভেবো না। তোমাদের গরীবদের দেখভাল করার দায়িত্ব তো আমাদেরই। তবে তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখতে হবে।’ মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. বললেন, ‘আপনার মতো সুপুরুষের জন্য আমাদের স্ত্রীরা যে মোটেও মানায় না।’ কা’ব বললো, তাহলে মেয়েদেরকে রেখে যাও।’ মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. বললেন, ‘কিন্তু এতে যে আমাদের কলঙ্ক রটে যাবে। এরচেয়ে কবিপ্রবর আপনি আমাদের অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিন। আপনি সম্মত থাকলে আজ রাতেই আপনার কাছে সেগুলো পৌঁছে দেবো।’ এই প্রস্তাব শুনে কা’ব আশ্বস্ত হলো। তার মুখাবয়বে বয়ে গেলো আনন্দের দ্যুতি।

রাতে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. আরেক সাহাবি আবু নায়েলাকে নিয়ে কা’বের ঘরে এসে হাজির হলেন। চুক্তির কথা জানা থাকায় উচ্চবাচ্য করলো না প্রহরী। দরজায় কড়া নাড়লেন তারা। কা’বের স্ত্রী চমকে উঠলো। কা’ব দরজা খুলতে উদ্যত হলে তার স্ত্রী বারণ করে বললো, আমি তো দেখছি এ ডাকের সাথে রক্ত ঝরছে। দোহাই তোমার, তুমি দরজা খুলো না। স্ত্রীর কথায় ভ্রুক্ষেপ করলো না কা’ব। বললো, নিশ্চয় শরীফ লোক রাতের বেলা বর্ষাঘাতের জন্য আহুত হলেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না। এই বলে কা’ব তার সুউচ্চ

বাসভবন থেকে দরজার দিকে এগিয়ে এলো। ইতিমধ্যেই মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. তার সাথী আবু নায়েলার কানে কানে বলে দিলেন, আমি তার চুলের ঘ্রাণ শুকবো। যখন তুমি দেখবে আমি তার কোঁকড়ানো চুলগুলো শক্ত করে ধরেছি তখন মুহূতের মধ্যেই তার ধর থেকে মস্তক ছিন্ন করে দিবে।

কা’ব বিন আশরাফ ধীর গতিতে দরজা খুলে সামনের দিকে এগিয়ে এলো। আপাদমস্তক তার সুঘ্রাণে ভরা। শরাফত দেখাতে এসেছেন কবিপ্রবর। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. বললেন, এতো উন্নত সুগন্ধি জীবনে কখনো শুকিনি। কবি কা’ব বললো, তোমরা তো গরীব মানুষ। উন্নত মানের সুগন্ধি পাব্্্্ইে বা কোথায়! মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. অনুরোধের স্বরে বললেন, কবিপ্রবর অনুগ্রহ করে যদি মাথাটা একটু ঝোঁকাতেন! জীবনে আর কখনো এতো উন্নত সুগন্ধি শুকতে পারবো কিনা বিধাতাই ভালো জানেন। মন গলে গেলো কা’বের, ঝুঁকিয়ে দিলো মাথা। ঠিক তখনই মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. শক্ত করে আকড়ে ধরলেন কা’বের মাথার কোঁকড়ানো চুল। চোখের পলকে দ্রুত ইশারা করলেন সাথীর দিকে। তখনই তিনি কা’বের ধর থেকে মস্তক ছিন্ন করে দিলেন। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ও আবু নায়েলা রা. কা’ব বিন আশরাফের মাথা নিয়ে উপস্থিত হলেন প্রিয়নবীজীর দরবারে। সমস্বরে সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো ‘আলহামদুলিল্লাহ’। অপ্রত্যাশিত এ ঘটনায় মক্কার কাফেররা ভয়ে একেবারে চুপসে গেলো।

নবীর দুশমনকে পৃথিবী থেকে কিভাবে সরিয়ে দিতে হয় এ ঘটনার মাধ্যমে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ও তার সাথী আবু নায়েলা বিশ্ব মানবতার কাছে বার্তা পৌঁছে দিলেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

লেখক: প্রাবন্ধিক

ইসলামের দাসব্যবস্থা: আলোকিত ভোরের প্রত্যাশা

ALI HASAN OSAMA·SATURDAY, AUGUST 6, 2016

ইসলামের দাসব্যবস্থা: আলোকিত ভোরের প্রত্যাশা
আলী হাসান উসামা

আলোর শত্রু কিছু পাপিষ্ঠকে এ পৃথিবী সর্বদাই বুকে আগলে রেখেছে, যারা নিজেদের দুর্গন্ধময় মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায় সদা সত্যের প্রদীপ; তমসায় ছেয়ে ফেলতে চায় গোটা ধরাধাম। মুসলিম জাতিকে নিশ্চিণ্হ করার মানসে সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ গ্রহণে তারা কোনো ত্রুটি করে না। মুসলমানদের বুকের তপ্ত খুনে নয়া সাম্রাজ্যের লাল মানচিত্র আঁকার স্বপ্নে তারা সদা বিভোর। এ শ্রেণীর বন্য পিশাচেরা হামলে পড়ে বারবার মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপরে। ছিঁড়েফেঁড়ে খেতে চায় মুসলিমদেরকে, শিশু-নারী-যুবা- বৃদ্ধ সবাইকে। মহামহিম আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে রক্ষা পায় মুসলিম জনপদ। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয় তাদের চক্রান্ত। অকালে ভাঙ্গে দিবাস্বপ্ন। নিমিষেই গুড়িয়ে যায় স্বপ্নের প্রাসাদ। দুর্বল মুসলিম কিশোর-তরুণ-যুবকদের হাতে লাঞ্চিত হয় তারা চরমভাবে। কেউ তো পটল তুলে সোজা পাড়ি জমায় জাহান্নামে, কেউবা বন্দি হয়ে আসে মুসলিমদের হাতে।
ধনহীন দুর্বল মুসলিম জনপদবাসী কী আচরণ করবে এসব বন্দিদের সাথে? এতোগুলো প্রাণী! সবার রক্তে সিঞ্চিত করবে পবিত্র মুসলিমভূমি? না, পিশাচদের প্রতিও এতো কঠোর হতে পারে না ইসলাম। তবে? এতোগুলো প্রাণীকে ‘লাল গুদামে’ ভরে রাখবে? তাও তো হওয়ার নয়। এতে এই

দুর্বল জনপদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে চরমভাবে। জেলখানা নির্মাণ, বন্দিদের খাবার-পোশাকের ব্যবস্থা, প্রহরী মোতায়েনসহ কতো ঝক্কি, খরচের সুদীর্ঘ ফিরিস্তি! তাছাড়া স্বাধীন মানুষকে, সে যতো মন্দই হোক, চিড়িয়াখানার প্রাণীদের মতো জেলে পুরে রাখা, খোদার দেয়া খোলা ভূমি-আকাশ, আলো-বাতাস, পরিবেশ-প্রকৃতির নেয়ামত থেকে চিরবঞ্চিত করে এক মানবেতর জীবনযাপনের দিকে ঠেঁলে দেয়া তো কোনো সুস্থ বিবেক-সমর্থিত হতে পারে না। যদিও মুসলিম বন্দিদের সাথে ওদের আচরণ বরাবরই প্রাণী-পশুর সাথে কৃত আচরণ থেকেও নিম্নস্তরের, আবু গারিব আর গুয়ান্তানামোর ধারা তো আর এ যুগের সৃষ্টি নয়, চলে আসছে এই হিংস্রতা প্রাচীন যুগ থেকে, তবুও দয়া-করুণার মূর্ত প্রতীক মুসলমানেরা এতো নিষ্ঠুর-পাষাণ কখনো হয়নি, হতে পারে না। তবে কী আচরণ করবে তারা এসব যুদ্ধবন্দিদের সাথে? প্রশিক্ষিত এতোগুলো সৈন্যকে তো আর মুক্তি দিয়ে মাতৃভূমিতে ফেরত পাঠানো যায় না। নইলে তা হবে নির্ঘাত ভুল সিদ্ধান্ত, যা নিজেদের অস্তিত্বের জন্য হয়ে দাঁড়াবে বিরাট হুমকি। কী করবে তবে? উপায় তো একটিই। এসব প্রাণীকে নিজেদের ক্রীতদাস বানিয়ে মুসলিম সমাজে রাখা, ইসলামের মহান শিক্ষার দীপ্তিতে ধীরে ধীরে তাদের হৃদয়াঞ্চলকে আলোকিত করার প্রয়াস পাওয়া, সত্য-গ্রহণের স্বভাবজাত যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে সরল পথে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। হ্যাঁ, তবেই তো মুক্তি, শান্তি। এতে নিজেদের জন্যও নেই কোনো ঝুঁকি কিবা ঝক্কি, উপরন্তু আছে এই বিশাল মানবগোষ্ঠীর সাফল্যলাভের প্রত্যাশা। মুসলমানদের অপরের জন্য হেদায়াতচিন্তা তো এটাকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। কর্মপন্থা হিসেবে দাসব্যবস্থা তাই ইসলামি শরিয়তে গৃহীত হয়েছে। স্মতর্ব্য যে, যুদ্ধবন্দিদের জন্য একমাত্র শাস্তি এটা নয়। মুসলিম শাসক চাইলে তাদেরকে অন্য শাস্তিও দিতে পারেন, পারেন মুক্ত করে দিতে, কিবা পারেন তাদের দ্বারা বন্দি বনিময় করতে। তদুপরি ইসলাম দাসপ্রথার প্রবর্তক নয়। চলে আসছে দাসপ্রথা সেই আদিযুগ থেকেই। ইসলাম তাতে এনেছে শোভন। দিয়েছে দীপ্তি। তাদেরকে দিয়েছে

পূর্ণ মানবাধিকার। দিয়েছে তাদেরকে অভূতপূর্ব মর্যাদা। ইসলাম দাসশ্রেণীর ভরণ-পোষণ, দেখভালের পূর্ণ দায়ভার দিয়েছে গৃহপতির কাঁধে। বিনিময়ে দাসশ্রেণীকে নির্দেশে দিয়েছে, কায়িক পরিশ্রম করে ব্যয়ভার পুষিয়ে দিতে। এতে দুপক্ষেরই পূর্ণ লাভ।

২.
প্রতিটি মুসলমান, যে মুখে ও হৃদয়ে ইসলামের কালিমা পড়েছে গ্রহণ করে নিয়েছে সে বিশ্বপ্রভুর দাসত্ব। আর যারা মহান আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, তার অবতীর্ণ সত্যধর্মের গতিরোধের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করেছে, তারা বিমুখ হয়েছে সেই মহান স্রষ্টার দাসত্ব থেকে। তাই তাদেরকে শাস্তিস্বরূপ তিনি কিছুকালের জন্য তার অনুগত দাসদের অধীন করে দিয়েছেন। স্রষ্টার দাসত্বে যেহেতু তাদের চিত্তপ্রশান্তি নেই, সৃষ্টির দাসত্ব স্বীকার করে থাক তাই কিছুদিন। হেদায়াতের দীপ্ত পথ থেকে তবুও বিমুখ থাকলে শেষ পরিণামে জাহান্নাম তো আছেই।
এক্ষেত্রে সবিশেষ লক্ষণীয়, দাসত্বের উৎস পবিত্র ইসলামে একটিই। যারা যুদ্ধবন্দি এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম, যাবত না তারা আযাদ হয়, কিবা তাদের ঔরসজাত সন্তান কোনো স্বাধীন নারীর গর্ভজাত না হয়। এছাড়া অন্য কাউকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেনি ইসলাম। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, রাসুল সা. বলেছেন, “তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন আমি নিজে বাদী হবো। ১. ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যে আমার নামে অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে। ২. যে কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভক্ষণ করে। ৩. যে শ্রমিকের থেকে ষোলআনা শ্রম আদায় করে তাকে বঞ্চিত করে তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক থেকে।“ -বুখারি।
৩.
শান্তির ধর্ম ইসলাম এ দাসশ্রেণীর জন্যও এমন সুন্দর ও চমৎকার বিধান ও নির্দেশনা আরোপ করেছে, যা থেকে অধুনা বঞ্চিত সভ্য দেশেরও বহু নাগরিক। কী সেই নির্দেশনা? কী সেই মহান বিধিমালা? আমরা

সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার ওপরে সামান্য আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো।
পবিত্র ইসলাম এই দাসশ্রেণীকে মনিবদের ভাই বলে অভিহিত করেছে।
নির্দেশ দিয়েছে তাদেরকে পরিবারভুক্ত সদস্য জ্ঞান করে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার ও উত্তম আচরণের। হাদিসের বাণী, “নিঃসন্দেহে তোমাদের ভাইয়েরাই তোমাদের সেবক। তাই যার অধীনে রয়েছে তার ভাই। সে যেনো তাকে আহার করায় তা, যা আহার করে নিজে; তাকে যেনো পরিধান করায় তা, যা পরিধান করে নিজে।“ -বুখারি, মুসলিম।
কোরআনে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, ইবাদত করো আল্লাহর। শরিক করো না তার সাথে কাউকে। সদাচরণ করো বাবা-মা'র সাথে, নিকটাত্মীয়দের সাথে, ইয়াতিম মিসকিন আত্মীয়-অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সাথি-সঙ্গী, মুসাফির এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীর সাথে। -সুরা নিসা-৩৬। ওফাতের পূর্বমুহূর্তেও প্রিয়নবির মুখে উচ্চারিত হচ্ছিলো, “নামাজ নামাজ আর তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসী!” “নামাজ নামাজ আর তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসী!”
দাসদাসীর শিক্ষাদান এবং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ-প্রদান প্রসঙ্গে প্রিয়নবি বলেন, “যে ব্যক্তির অধীনে কোনো দাসী থাকে আর সে তাকে উত্তম শিক্ষাদান করে, এরপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করে, সে দুটি পূণ্যের অধিকারী হবে।” বুখারি।
প্রিয়নবি দাসদাসীদেরকে অপমানজনক শব্দে সম্বোধন করতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, “তোমাদের কেউ যেনো এভাবে না বলে, ‘আমার গোলাম’ ‘আমার বাদী’, আর অধীন ব্যক্তি যেনো না বলে, ‘আমার প্রভু’। বরং মালিক যেনো বলে, আমার তরুণ, আমার তরুণী। আর অধীনেরা বলে, আমার সায়্যিদ, আমার সায়্যিদা। -সুনানে আবু দাউদ
ইসলাম মনিব ও দাসত্বের বিভাজিন রেখাকে অবলেপন করে দিয়েছে চিরতরে। দাসদেরকেও বসিয়েছে শাসকের ময়ুরসিংহাসনে। মদিনাতুর রাসুলের জামে মসজিদের মোয়াজ্জিন নিযুক্ত হয়েছিলো এক সাধারণ কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস। দাসকে দাস বলে সম্বোধন করা তো দূরের কথা, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর রা. মসজিদে নববির মুয়াজ্জিন ক্রীতদাস বেলাল রা.কে দেখলেই দাঁড়িয়ে যেতেন।

সশ্রদ্ধ স্বাগত জানাতেন এই বলে, আসুন সরদার, আসুন আমাদের নেতা। - বুখারি।
মহানবি সা. আপন প্রিয় চাচাত বোন যায়নাব বিনতে জাহাশ রা.কে বিয়ে দিয়েছিলেন আযাদকৃত গোলাম যায়দ বিন হারিছা রা.-র সাথে। প্রিয়নবি সা. মনিবদেরকে বারণ করেছেন, তারা যেনো দাসদের ওপরে সাধ্যাতীত দায় চাপিয়ে না দেয়। একান্ত যদি কখনো এরূপ হয়, তবে রাসুলের নির্দেশ, “তোমরা নিজেরা তাদেরকে সহযোগিতা করো।“ -বুখারি, মুসলিম।
দাসদাসীরা কাজ করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি করে ফেলবে বারবার। রাসুল সা. নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের ভ্রান্তি-বিচ্যুতি হলে তোমরা তাদেরকে ক্ষমা করো। কতবার ক্ষমা করবো হে রাসুল? বললেন, সত্তরবার। ইসলাম অধিকার দেয়নি দাসদেরকে অন্যায়ভাবে প্রহার করার। হাদিসের বাণী, যে ব্যক্তি তার দাসিকে চড় মারে কিবা প্রহার করে, তার কাফফারা হলো, সে যেনো তাকে আযাদ করে দেয়। -মুসলিম। বিখ্যাত সাহাবি আবু মাসউদ আনসারি রা. একদিন ক্রদ্ধ হয়ে নিজ দাসকে প্রহার করেন। হঠাৎ পেছন থেকে শুনতে পান গুরুগম্ভীর এক ধ্বনি। “জেনে রেখো আবু মাসউদ, তুমি তার ওপরে যতোটুকু ক্ষমতা রাখো, আল্লাহ তোমার ওপরে এরচে বেশি ক্ষমতা রাখেন।“ আবু মাসউদ রা. বলেন, পেছনে ফিরে দেখি, আল্লাহর রাসুল সা.! আমি বলি, হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর ওয়াস্তে সে আযাদ। রাসুল সা. বলেন, যদি তুমি এটা না করতে, তবে জাহান্নামের বিভীষিকাময় আগুন তোমাকে ভস্মীভূত করে দিতো। -মুসলিম।
দাসরা কি চিরদিন দাসই থেকে যাবে? না, ইসলাম বিভিন্নভাবে তাদের দাসত্ব দূরীকরণের ব্যবস্থা রেখেছে। যিহার-কতলে খাতা-কসমের কাফফারা হিসেবে নির্দেশ দিয়েছে দাস আযাদ করার। এছাড়াও অসংখ্য হাদিসে দাসমুক্তির ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে মুসলিম সম্প্রদায় সন্তুষ্টচিত্তে অধিকারভুক্ত দাসদেরকে আযাদ করে দেয়। হাদিসের বাণী, “যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম দাসকে মুক্ত করে, মহান আল্লাহ তার প্রতিটি অঙ্গকে দাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন। -বুখারি, মুসলিম।

যার সামর্থ্য নেই দাসমুক্তির, সে কীভাবে অধিষ্ঠিত হবে মর্যাদার সুউচ্চ আসনে? রাসুল বলেন, সর্বোত্তম সদকা হলো, দাসমুক্তকরণে সুপারিশ করা। -শু'আবুল ঈমান।
দাস যদি মনিবের সাথে তার মুক্তির জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চায়, কোরআন বলছে, তোমরা তাতে কোনপ্রকার বাধ সাধবে না। কল্যাণ মনে করলে অবশ্যই চুক্তিতে সম্মত হবে।
মনিবের ঔরসজাত সন্তান প্রসবকারিণীর বিকিকিনিকে অবৈধ সাব্যস্ত করেছে ইসলাম।

৪.
ইসলাম মহাপবিত্র ঐশী ধর্ম, শান্তির ধর্ম। যারা প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে ইসলামের গায়ে কালিমা লেপন করতে চায়, আমরা তাদেরকে উদাত্ত আহ্বান করছি, তারা পারলে দেখাক, সমাজের সর্বনিম্নশ্রেণী দাসদের ব্যাপারে ইসলামের যেমন নির্দেশনা, পৃথিবীর আর কোনো ধর্মে কিবা তন্ত্রে রয়েছে এমন মহান বিধান ও নির্দেশনা। আজও দুচোখ মেললে দেখা যায়, শ্বেতাঙ্গদের হাতে কী পরিমাণ নিপীড়িত ও অধিকারবঞ্চিত কৃষ্ণাঙ্গ স্বাধীন ব্যক্তিরা। যেখানে ইসলাম দাসশ্রেণীকে অধিষ্ঠিত করেছে শাসকেরও আসনে। রাসুলের নির্দেশ, “তোমরা শাসকের কথা মানবে, তার পূর্ণ আনুগিত্য করবে, যদিও সে হয় কৃষ্ণবর্ণের কোনো ক্রীতদাস। দিগ্বিজয়ী সুলতান মাহমুদ গযনবী, শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ, গিয়াসুদ্দীন বলবনসহ ইসলামের ইতিহাসে কতো অসংখ্য দাসরা ছিলো নেতৃত্বের আসনে। যায়দ বিন হারিছা এবং তার পুত্র উসামা বিন যায়দ রা.কে যুদ্ধের সেনাপতি বানিয়ে প্রেরণ করেছেন মহান রাসুল। তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এমন সৈন্যদলের, যেখানে ছিলো উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, প্রথম সারির সাহাবিগণ। ছিলেন ফারুকে আজম, আলী মুরতাজার মতো মহান বীরগণ। দাস হিসেবে কি আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা ক্ষীণ? না, কোরআন মর্যাদার মাপকাঠি ঘোষণা করেছে তাকওয়া। আল্লাহ বলেন, “তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানী সে, যে সবচে খোদাভীরু।“-সুরা হুজুরাত-১৩।

প্রভুত্ব কিবা দাসত্বের আলাদা কোনো প্রভাব নেই আকাশে ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে।
ইসলামের বিধানাবলীর সৌন্দর্যে হৃদয়তন্ত্রীতে বিস্ময়ের ঢেউ ছড়িয়ে যায়, ভালোলাগার স্নিগ্ধ আবেশ ছুঁয়ে যায় মন। নামাজের কাতারে পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়ায় মনিব ও দাস। নেই কোনো বিভেদ। নেই বৈষম্য।
মহান তুমি হে ইসলাম। উদার তোমার শাশ্বত বিধিমাল। তবুও যারা তোমার গায়ে কালিমা লেপন করতে চায় ওদের জন্য দুর্ভোগ, শত দুর্ভোগ। ধ্বংস হোক সেসব অথর্ব অর্বাচীনের দল।
পুনশ্চ: বর্তমান পৃথিবীতে দাসব্যবস্থার প্রথা নেই। আমরা দেশ ও জাতিকে ফের এ ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তনের দিকে আহ্বান করছি না। তবে বক্ষমান নিবন্ধে আমরা চেষ্টা করেছি এক প্রজ্ঞাদীপ্ত ব্যবস্থা, যার প্রবর্তক ইসলাম নয়; বরং যা চলে আসছে তারও সহস্র বছর আগ থেকে, ইসলাম তাকে পরিয়েছে সভ্যতা ও শুভ্রতার বসন, তার ওপরে বিরুদ্ধাবাদীদের আরোপিত অভিযোগের খণ্ডন করতে। প্রয়াস পেয়েছি, দাসব্যবস্থার স্বরূপ ও অবস্থানকে সুস্পষ্ট করতে। প্রাচ্যবিদদের মুখরোচক বুলিতে কোনো কোনো অবুঝ সুহৃদ না বোঝেই দাসপ্রথার কারণে ইসলামের দিকে নির্দ্বিধায় তীর্যক বাণ ছুড়ে বসেন। ইসলামকে কলঙ্কিত করতে মূর্খতাপ্রসূত নানাবিধ অভিযোগ উত্থাপন করেন। সেসব সুহৃদদের সুবোধ উদয়ের প্রত্যাশায় আমাদের এই নিবন্ধ...

আলী হাসান উসামা

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া, মিরপুর-১২,ঢাকা

এক অবহেলিত জনপদের আখ্যান: ব্যথাতুর হৃদয়ের কুম্ভীরাশ্রু

ALI HASAN OSAMA·TUESDAY, DECEMBER 6, 2016

ঢাকা থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে। মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানা। বাংলাদেশের বৃহৎ বেদেপল্লীগুলোর একটি। এখন সেখানে ঘরবাড়ি ও পল্লী গড়ে উঠলেও এইতো কিছুকাল আগেও নৌকায়ই বাস করতো বেদেরা। নদীর জলে ভেসে বেড়াতো চার-চারশ নৌকা। প্রতিটি নৌকায় একটি করে বেদে পরিবার। জমাজমি কিংবা অর্থবিত্ত- কিছুই ছিলো না তাদের। তবে সকলেই তারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী। ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির অভাবে দৈনন্দিন জীবন-যাপন ইসলামি তরিকায় ছিলো না ঠিক, তবে প্রত্যেকের

ভেতরে ছিলো সুদৃঢ় ইমানি চেতনা ও ধর্মীয় ভাবাবেগ। যেকোনো মূল্যে ইমানের অমূল্য সম্পদ হারাতে তারা কিছুতেই প্রস্তুত ছিলো না। একসময়ে খ্রিস্টান মিশনারির দৃষ্টি পড়ে তাদের ওপর। মিশনারির কয়েকজন প্রশিক্ষিত উদ্যমী সদস্য প্রবল আত্মবিশ্বাস ও সাফল্যের বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে বেদেদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশে কাজ নেমে পড়ে। কিন্তু টানা কয়েক দিনের অবিশ্রান্ত চেষ্টা-সাধনার ফল দাঁড়ায়- শূন্য। বড় বিস্মিত ও চিন্তিত হয়ে পড়ে তারা। চেষ্টায় কোন ত্রুটি নেই। সাধ্যের অন্ত নেই। তবুও ফলাফল শূন্য কেনো- এর উত্তর তারা খুঁজে পায় না। সরলমনা বেদেদেরকে তারা কতো করে বুঝিয়েছে। আলোকিত জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছে। প্রত্যেককে ডাঙায় জমি কিনে ঘর করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের অঙ্গিকার করেছে। তবুও পার্বত্য চট্টগ্রামের অভাবিত সাফল্যের পর ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানি নিয়েই তাদেরকে ফিরতে হয়েছে। গোত্রপতির দৃপ্তকণ্ঠের ঘোষণা তাদের স্বপ্নের প্রাসাদ গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সর্দার বলেছে, “আমাদের একজন নেতা আছে; হযরত মুহাম্মাদ সা. যার নাম। আমরা কখনো তার অবাধ্য হবো না। তার আনীত ধর্ম ছেড়ে কিছুতেই অন্য ধর্ম গ্রহণ করবো না। আপনারা আপনাদের পথ দেখতে পারেন”।

দুই

বাংলাদেশের সবচেয়ে উপেক্ষিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর নাম বেদে। মরুভূমি বা সমভূমির যাযাবরদের মতো এরা এদেশের একমাত্র যাযাবর সম্প্রদায়। বেদেদের বক্তব্য অনুযায়ী, তাদের উৎপত্তি আরব বেদুইনদের থেকে। বেদুইনদের মতো বেদেদের সকলেই মুসলমান ও সমাজের মূলধারা থেকে তাদের দূরত্বে অবস্থান- এদুটি বিষয় তাদের বক্তব্যের সত্যতার দিকেই ইঙ্গিত করে। বেদেদের নাম শুনলে অনেকেই মনে করেন, তারা হয়তো বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী কিংবা বাদ্যযন্ত্রের সাথে তাদের জীবন-জীবিকা জড়িত। অথচ বাস্তবতা হলো বৌদ্ধধর্ম কিংবা

বাদ্যযন্ত্র- এদুয়ের সাথে বেদেদের নেই দূরতম সম্পর্ক। ভারতের আসামসহ কয়েকটি প্রদেশে বেদেদের বিক্ষিপ্ত অস্তিত্ব থাকলেও তাদের মূল অবস্থান নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশে। ঢাকার সাভার, নাটোরের সিংড়া, মুন্সিগঞ্জের লৌহজং এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে গড়ে ওঠেছে বেদেপল্লী। এছাড়াও সুনামগঞ্জ, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জে বিক্ষিপ্তভাবে একদল বেদের অবস্থান রয়েছে। এরমধ্যে সবচে বিপুল সংখ্যক বেদেদের বসবাস সাভারে। তাই সাভারের বেদেপল্লী বা “বাইদ্যাপাড়া” বেদে সম্প্রদায়ের রাজধানী বলে পরিচিত। সাপ নিয়েও বেশি কারবার এ রাজধানীর বেদেরাই করে।

বাংলাদেশে বেদেদের মোট জনসংখ্যা আট থেকে দশ লাখের মতো। তবে বিক্ষিপ্ত বেদেদের মধ্যে সমন্বয় ও কেন্দ্রীয় সংগঠন না থাকায় তারা অনেক মৌলিক অধিকার ও প্রাপ্য সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত। দেশের উপজাতি সম্প্রদায়গুলোর মতো সরকারের কাছ থেকে নিজেদের দাবি-দাওয়া পূরণ করে নেয়া এবং চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে অল্পশিক্ষায়ও অগ্রাধিকার পাওয়ার সুবিধাদি বেদেরা পায় না। ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকালেও তাদের আর আশানুরূপ উন্নতি ও অগ্রগতি হয় না। প্রতিটি বেদেপল্লীতে একজন করে দলপতি থাকে। সামাজিক বিচারকার্য ও দায়-দায়িত্ব তিনিই পালন করেন। তার আদেশই আইন; সকলেই তাকে মেনে চলে।

বেদে সম্প্রদায়ের আদি পেশা হলো, তাদের মেয়েরা কাঁচের চুড়ি, খেলনা ও হালকা প্রসাধনী ইত্যাদি নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে ফেরি করে ব্যবসা করে। কেউ আবার বাতের ব্যথার চিকিৎসা হিসেবে সিঙ্গা লাগায়। আবার কেউ গাছের শেকড়-বাকল, জুড়ি-বুটি ইত্যাদি দিয়ে নানাবিধ ওষুধ বানিয়ে সেগুলো বিক্রি করে। পুরুষেরা সাধারণত সাপের খেলা দেখায়, মন্ত্র পড়ে সাপ ধরে, সাপে কামড়ালে ওঝা হয়ে তার চিকিৎসা করে। কেউবা বাজারে সাপের খেলা দেখিয়ে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে। ক্ষেত্রবিশেষ একাকী, যৌথ কিংবা দল বেঁধে তাদের ব্যবসায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গাঁয়ে-গ্রামে আগে যেহেতু সাঁপের বেশ

উৎপাত ছিলো। মাঝেমধ্যেই বিষাক্ত সাপ কাউকে না কাউকে কামড়ে দিতো। তাছাড়া সাপে কামড়ালে ওঝা দিয়ে ঝারানো ছাড়া ভিন্ন কোনো চিকিৎসাও ছিলো না। গ্রামগুলোতে বাচ্চাদের খেলনা ও মহিলাদের প্রসাধনী পাওয়া যায়- এমন দোকানপাটও খুব একটা ছিলো না। তাই গাঁয়ে-গ্রামে বেদেদের ছিলো ব্যাপক চাহিদা। নৌকায় বাস করেও তাদের দিনকাল তাই ভালোই কাটছিলো।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন দেশ উন্নতির পথে এগোতে শুরু করে, পাড়াগাঁয়েও বেশ দোকানপাট গড়ে ওঠে, সাপের উপদ্রবও দিনদিন কমে যেতে থাকে; তাছাড়া নদীর নব্যতাও দিনদিন হারিয়ে যেতে থাকে। তাই বেদেরা ডাঙায় উঠে আসতে বাধ্য হয়। সাধ্যমতো জায়গা-জমি কিনে ঘরবাড়ি বানিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপনের প্রয়াস পায়। মসজিদ কেন্দ্রিক গড়ে ওঠে দুস্থ বেদে সমাজ। চেহারায় আলাদা নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য না থাকায় এবং ধর্ম-সংস্কৃতি এক হওয়ায় সহজেই সমাজের মূলধারার সাথে মিশে যাওয়া তাদের জন্য সম্ভবপর ছিলো। কিন্তু এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের অসদাচরণ এবং মুখে ও কর্মে অসমর্থন। সাপ নিয়ে বেদেদের কারবার থাকায়, অবৈধ তাবিজ-তদবির (যেসবের সাথে শিরকি তন্ত্রমন্ত্রের সম্পর্ক বেশি থাকাটাই স্বাভাবিক)-এর সাথে জড়িত থাকায় এবং নারীদেরকে জীবিকার স্বার্থে ব্যবহার করায় তাদের এবং সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে গড়ে ওঠে অঘোষিত বাধার দেয়াল ও ঘৃণার প্রাচীর। তারা যখন স্বাভাবিক জীবনের স্বপ্ন দেখে, সে-লক্ষ্যে প্রয়াস গ্রহণ করে তখন পায় না অপরাপর মুসলমানদের প্রত্যক্ষ কিবা পরোক্ষ সাহায্য-সহযোগিতা, সমর্থন কিবা সাড়া। তাদের দুঃখ ও অসহায়ত্বের করুণ মুহূর্তেও তাদের পাশে কেউ দাঁড়ায় না, একটুখানি আপন করে নেয়ার আগ্রহ, মানবীয় সম্প্রীতি-ভালোবাসা কারো কাছে তারা পায় না। জীবনের এ অধ্যায়ে বড় তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন হয় তাদের। অবশেষে সব বাধা উপেক্ষা করে নিজেদের জীবননায়ের হাল নিজেরাই ধরে। সর্বশক্তি ব্যয় করে স্রোতের উল্টো দিকে একটু একটু করে এগোতে থাকে। আত্মপরিচয় গোপন করে চাকরি ও ব্যবসাক্ষেত্রে কেউ

কেউ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাইমারি ও হাইস্কুলের স্তর ডিঙিয়ে একদল মেধাবী বেদে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অর্থাভাবে বহু সম্ভাবনা ও প্রতিভা অকালেই ঝরে যায়। অন্যদের কটূক্তি ও ঘৃণার মনোভাব সইতে না পেরে কেউবা নিজেকে আঁধারজগতে ঠেলে দেয়। কিছু বেদে হাফিজে কোরআন, মাওলানা ও মুফতি হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করে। তবে সাধারণ মুসলমানদের সহযোগিতা ও সুদৃষ্টির অভাবে গোটা বেদে সম্প্রদায় এখনোও আশানুরূপ উন্নতি ও অগ্রগতি করতে পারেনি।

মাওলানা জালালাবাদীর মুখে বেদেদের প্রতি মুসলমানদের অবহেলার একটি ঘটনা শুনে দুচোখে কুম্ভীরাশ্রুর বন্যা বয়ে যায়। মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে গত এপ্রিল-২০১৪ তে সফরকালে এমন এক নির্মম দৃশ্য দেখার সুযোগ তাদের হয়। এক বেদে মুসলমানের লাশ পড়ে আছে। গোসল করিয়ে কাফনও পড়ানো হয়েছে। কিন্তু ইমাম সাহেব সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোনো বেদের জানাযা পড়াবেন না। সাধারণ মুসলমানদের কেউও সে জানাযায় অংশগ্রহণ করেনি। তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া তো দূরের কথা; বেদেদের বিয়েশাদিত সাধারণ মুসলমানরা উপস্থিত হওয়ার সৌজন্যটুকুও দেখায় না

তিন

মাওলানা আবু সাঈদ মোহাম্মাদ ওমর আলী রহ.। সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.-এর বিশিষ্ট খলিফা। এদেশে অমুসলিমদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের মহান ধারাপাত যার মাধ্যমে হয়েছিল। দেশবাসীর কছে তিনি এতোটাই পরিচিত ও বরিত- নতুন করে তার পরিচয় তুলে ধরা অযথা সময়ক্ষেপণ মাত্র। বেদেসমাজের উন্নয়নে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনিই প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদীর সাথে তার ছিলো গভীর সখ্যতা। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাকে বলেন, “জালালাবাদী সাহেব, আপনি কি জানেন, এই বেদে সমাজের সবাই মুসলমান?

তার কথায় বিস্মিত হয়ে চমকে ওঠেন মাওলানা জালালাবাদী। “কী বলছো তুমি! বেদেরা সবাই মুসলমান!” “জি হুজুর, আর এজন্যই আজ ওদের কপালে এতোটা দুর্ভোগ! মুসলমান বলে এনজিওগুলোর কোনো প্রকার সহযোগিতা ওরা পায় না। ভিন্ন ধারার পেশায় জড়িত বলে মুসলমানরাও ওদেরকে চরমভাবে ঘৃণা করে। কয়েক বছর ধরে ওদের মধ্যে আমার যাতায়াত। লৌহজংয়ে আল্লাহর ফজলে একটি ছোট্ট মসজিদও করে দিয়েছি। এখনও মুসলমানদের তেমন সাড়া পাইনি। তবে আমার স্বপ্ন, কারো সাড়া পাই বা না পাই আমরণ এই দুস্থ বেদেদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবো।”

এই কথোপকথনের কিছুকাল পরেই মুসলিম উম্মাহর দরদী মনীষী মাওলানা ওমর আলী রহ. আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। মাওলানা জালালাবাদীর অন্তরে বিষয়টি তখন দাগ কাটে। তিনি দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যে- করেই হোক অনুজপ্রতিম ওমর আলী রহ.-এর স্বপ্নকে তিনি আঁকড়ে ধরবেন, তার অসম্পূর্ণ মিশনকে সম্পূর্ণ করবেন। অন্যদের পক্ষ থেকে সহযোগিতা কিংবা সাড়ার অপেক্ষা না করে, বয়সের বাধা উপেক্ষা করে একাকী নেমে পড়েন বেদে সমাজ উন্নয়নের আলোকিত স্বপ্ন পূরণে। সাধ্যমতো বেদেদেরকে সহায়তা দেয়ার পাশাপাশি সহৃদয় বিত্তবানদের দৃষ্টি আর্কষণের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। অবশেষে দীর্ঘ অর্ধযুগ পরে তার স্বপ্ন পেখম মেলে। কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির সাড়া পান তিনি। উনিশ সদস্যের ক্ষুদ্র কাফেলা নিয়ে গড়ে ওঠে ‘বেদে সমাজ উন্নয়ন সংস্থা’।

চার

গাড়ি চলছে সাভারের পথে। গন্তব্য সাভার পোড়াবাড়ি বেদেপাড়া জামে মসজিদ। সেখানে আজ জুম‘আ পড়াবেন মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী। লৌহজংয়ের তিনজন বেদে আলিম পূর্বপ্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য অগ্রগামী কাফেলা হিসেবে একদিন আগেই সেখানে গিয়ে পৌঁছেছেন। আমাদের এ ক্ষুদ্র কাফেলায় প্রবীণ আলিম ও

মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা জালালাবাদী ছাড়াও আরো যারা রয়েছেন- ৬৯-এর গনঅভ্যুন্থানের মহানায়ক শহীদ আসাদের অগ্রজ প্রকৌশলী রশীদুজ্জামান সাহেব, দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক চিফ রিপোর্টার সৈয়দ আখতার ইউসুফ এবং মারকাযুদ দাওয়াহ আলই সালামিয়ার ইফতা দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষানবিশ আলী হাসান উসামা। এই কাফেলায় আরো থাকার কথা ছিলো শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মাওলানা আবদুল মালেক দা.বা.-র; কিন্তু ব্যস্ততার কারণে হুজুর আর সময় করে উঠতে পারেননি। খোদার জন্য একনিষ্ঠ এই মহান মানুষটি সর্বদা সেবামূলক কর্মকান্ডে দু’হাতভরে সহযোগিতা প্রদান করেন, প্রয়োজনীয় সব নির্দেশনাও দেন, কিন্তু নিজেকে লুকিয়ে রাখেন পর্দার অন্তরালে, আকাশসম উদারতার কথা জানতে দেন না কাউকে। মানবতার মঞ্চে দানবীর হিসেবে বরিত হতে চান না তিনি। বিনিময় লাভের প্রত্যাশা রাখেন একমাত্র মহামহিম আল্লাহর কাছে। এ যেনো ঠিক মানবতার মুক্তির দিশারী সেই মহান রাসুলের আদর্শেরই মূর্তপ্রতীক। বেদে সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বরাবরই তিনি সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত রেখেছেন, কিন্তু একেবারে সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া সেকথা কেউই জানেনি।

জুম‘আর সময় একেবারে ঘনিয়ে এসেছে। অচেনা অপরিচিত পথে অগ্রে প্রেরিত কাফেলার মুঠোফোনের নির্দেশনার আলোকে আমরা এগিয়ে চলছি গন্তব্যের সন্ধানে। সাভার বাসস্ট্যান্ড থেকে পশ্চিম দিকে রেলকলোনি হয়ে পনেরো বিশ মিনিট এগোলেই পোড়াবাড়ি বেদেপাড়া। কিন্তু বারবার পথ ভুল করে এই পনেরো বিশ মিনিটের পথ পাড়ি দিতে আমাদের সময় লেগেছে প্রায় ঘণ্টাখানেক। উদ্ভ্রান্তের মতো অনেকক্ষণ ঘুরে, পথচারীদেরকে বারবার জিজ্ঞেস করে করে আমরা যখন গন্তব্যে পৌঁছি, বেলা বাজে তখন ১টা। গাড়ি থেকে নেমে দেখি, এই অজপাড়াগাঁ আজ সেজেছে সম্পূর্ণ এক নতুন রঙে। চারদিকে পুলিশ আর পুলিশ। ভাবসাবে মনে হচ্ছে, এখানে বুঝি উদযাপিত হবে বড় কোনো আয়োজন। এগিয়ে এসে আমাদেরকে ইস্তেকবাল জানান ইছলাহুন্নিছা মহিলা মাদরাসার মুহাদ্দিস বন্ধুবর মাওলানা আব্দুল মান্নান এবং আমাদের সেই অগ্রগামী

কাফেলার তিন বেদে মাওলানা। তাদের সাথে আমরা মসজিদে প্রবেশ করি। পুরো মসজিদ কানায় কানায় ভরা। মসজিদে স্থান স্থান সংকুলান না হওয়ায় পাশের সুবিশাল ঈদগাহেও মুসল্লিদের উপচে পড়া ভিড়। জায়নামায বিছিয়ে সামনের কাতার পুরোটাই তারা আমাদের জন্য খালি করে রেখেছে। বেদে মুসল্লিদের আচরণ আমাদেরকে অভিভূত করে। আমি কখনো ভুলবো না, ভুলতে পারবো না সেই মানুষগুলোর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা মিশ্রিত দৃষ্টি, মায়াভরা চাহনি। তাদের সেই সরল হৃদয়কাড়া চাহনি আর অধরে ফোটা শুভ্র হাসির রেখা যেনো স্বগৌরবে ডেকে ডেকে বলছিলো, দেখো, ঐ যে দেখো, আমাদের সুদিন এসে গেছে। বিধাতা আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন ত্রাণকর্তা। আমরাও এখন সভ্য পৃথিবীর অংশে পরিণত হবো। কর্মক্ষেত্রে অপরাপর মুসলমানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারবো। পারবো আমাদের কলজের টুকরো সন্তানদেরকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে। পারবো আমাদের মেয়েদেরকে ভালো ভালো ছেলেদের সাথে বিয়ে দিতে। বিশ্বাস করো পাঠক, দু’চোখের অশ্রু তখন কিছুতেই ধরে রাখতে পারছিলাম না। বেদনারা হৃদয়টাকে প্রবলভাবে ঝাপটে ধরেছিলো। বেদনার্ত হৃদয় থেকে কুম্ভীশ্রুর ধারা উৎসারিত হয়ে দু’চোখ বেয়ে জলপ্রপাতের মতো গড়িয়ে পড়ছিলো তখন। সেখানেই মনে মনে অঙ্গিকার করেছি, আমার তো সামর্থ্য নেই ঠিক, চাইলেই আমি নিমিষে এই অবহেলিত জনপদের দুঃখ-দুর্দশা ঘোচাতে পারবো না; কিন্তু আমি তো এক খুদে লিখিয়ে, কলম আছে আমার হাতে। এর সাহায্যে তাদের করুণ চিত্র আমি তুলে ধরবো বিশ্বমানবতার সামনে। হতেও তো পারে, আমার সেই চিত্র ছুঁয়ে যাবে কোনো পাঠকের হৃদয়, ব্যাথাতুর হৃদয়ে যিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন এই অবহেলিত জনপদের রক্ষায়, মানবেতর জীবনযাপনের অবসান ঘটিয়ে বের করে আনবেন তাদেরকে আলোকিত জীবনের পথে।

মিম্বরে ওঠেন মাওলানা জালালাবাদী। সংক্ষিপ্ত সময়ে সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন তিনি। তার সেই আলোচনা শুনে অনুধাবন করি, বঙ্গভবনে তার জুম‘আর আলোচনা শুনে শুনে তার প্রতি কেনো এতো দুর্বল-অনুরক্ত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান। সেদিন মাওলানা

জালালাবাদীর প্রতিটি বাক্য থেকে ঝরে পড়ছিলো সে কী আবেগ ও মায়া! এখানে তার সারকথা তুলে ধরেছি।

“হামদ ও সালাতের পর। আমার বেদে ভাইয়েরা, আমরা সবাই একই পথের যাত্রী। আমাদের সবার গন্তব্য সেই অন্ধকার কবর। কবর জগত থেকে সূচিত হবে আমাদের নতুন জীবন। তা-ই হবে প্রকৃত জীবন, কখনো যার সমাপ্তি হবে না।

“মওত কো সমঝা হ্যয় গাফিল ইখতেতামে যিন্দেগী

হ্যয় ইয়ে শামে যিন্দেগী, ছুবহে দাওয়ামে যিন্দেগী”।

গাফেল হে, মৃত্যুকে ভেবেছো তুমি জীবনের পরিসমাপ্তি। মৃত্যু এ জীবনের সাঁঝ, চিরস্থায়ী আরেক জীবনের প্রভাত।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার, মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের মধ্যকার বিভেদরেখা চিরতরে মুছি যাবে। সেখানে থাকবে না ধনী-গরীবের পার্থক্য, থাকবে না শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গের বিভেদ। দেখা হবে না, কে বেদে আর কে মাইমল। সেখানে শুধু পরীক্ষা নেয়া হবে ঈমানের । চিহ্নিত করা হবে বিশ্বাসীদের, এরপর বিশ্বাসীরা স্থান পাবে জান্নাতে আর কাফের-বেঈমানেরা চিরদুর্ভোগ কপালে নিয়ে নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে। আমার বেদে ভাইয়েরা, তোমরা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ো। মিনতি ভরা কণ্ঠে করজোড় করে তোমাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমরা তোমাদেরকে ঠকিয়েছি, ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছি। আমরা সর্বদা তোমাদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। আমাদের প্রিয়নবি সা. তার উম্মতের মধ্যকার বিভেদরেখাকে অবলেপন করে দিয়েছেন, দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, “কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অনারবের ওপর আরবের কোনো মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র ভিত্তি হলো তাকওয়া”। আল্লাহ বলেন, “আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে

সবচে’ মর্যাদাবান সে, যে সবচে’ বেশি মুত্তাকি”। আর তাইতো ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরতে গিয়ে আল্লামা ইকবাল বলেছেন-

“আইনে জঙ্গ মেঁ জব আগায়া ওয়াকতে নামায

একহি সফ মেঁ খাড়ে হো গায়ে মাহমুদ ও আয়ায”।

আমার দেহ কেটে গেলে যেমন লাল রক্ত ঝরে, তোমার দেহ কেটে গেলেও তো অনুরূপ রক্তই ঝরে। কোনো পার্থক্যই নেই তোমাদের এবং আমাদের মাঝে। আমরা এখানে এসেছি তোমাদেরকে জাগিয়ে তুলতে এরপর সবাই মিলে এক গণজাগরণ সৃষ্টি করতে। ছ’লক্ষের বেশি ভোট যখন তোমাদের হাতে, এরপরও কেনো তোমরা নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে! তোমাদের উন্নয়নের জন্য আমরা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করেছি। এই কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে প্রতিটি বেদেপাড়ায় আমরা একটি করে উপ-কমিটি গঠন করবো, এরপর সবাই মিলে আলোকিত ভবিষ্যত বিনির্মাণের প্রয়াস পাবো। আমার ভাইয়েরা, আমাদের এ সংগ্রামে তোমারাও কি আমাদের পাশে থাকবে?” গগনবিদারী ধ্বনিতে সকল বেদে সমস্বরে চিৎকার করে তাদের সমর্থন জানায়।

পাঁচ

আমাদের এই আখ্যানে একজন মহৎ হৃদয়ের মানুষের কথা উল্লেখ না করা হলে তার প্রতি বড় অকৃতজ্ঞতা হবে। ঢাকা জেলার পুলিশের ডিআইজি জনাব হাবিবুর রহমান সাহেব। লৌহজংয়ের বেদেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে যেমন সর্বপ্রথম মাঠে নামেন মাওলানা ওমর আলী রহ., তেমনি সাভারের বেদেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন আলোকিত হৃদয়ের এই পুলিশ সুপার। সাভারের বেদেদের জন্য তিনি কী না করেছেন। নিজের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়াও বেদেদের অসহায় ও সুকরুণ অবস্থার প্রতি আরো বহু

সহৃদয় বিত্তবান ব্যক্তির সুদৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। আমরা গাড়ি থেকে নেমেই যে শত শত পুলিশের আনাগোনা ও সুবিশাল আয়োজন দেখেছিলাম, তা মূলত এই আলোকিত মানুষটিরই উদ্যোগে। তার আয়োজনে আজ জুম‘আর পরে এই ঈদগাহে তিন বেদেযুগলের বিয়ে দেয়া হবে। এরপর তাদের প্রত্যেক যুগলকে দেয়া হবে নগদ আশি হাজার টাকা করে। আর সে উপলক্ষে পুরো এলাকাবাসীর জন্য বিয়েভোজনের ব্যবস্থা তো থাকছেই। বেদেদের উন্নয়নে তার প্রতিটি পদক্ষেপই প্রশংসনীয়। এই সফরেরর পরে অন্য একদিন সময় নিয়ে আমরা মিলিত হয়েছিলাম জনাব হাবিবুর রহমান সাহেবের সাথে। আমাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে তিনি এতোটাই খুশি হয়েছিলেন, খুশির কান্না যে কতো গভীর হতে পারে, সেদিনই প্রথম তা উপলব্ধি করেছিলাম। মাওলানা জালালাবাদীকে জড়িয়ে ধরে তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেছিলেন, এতোদিন কোথায় ছিলেন আপনারা! আপনাদেরকেই তো আমি খুঁজে ফিরেছি বছরের পর বছর। দয়াময় আল্লাহর কাছে কেঁদেকেটে কতো বিনিদ্র রাত পার করেছি জায়নামাযে বসে। অবশেষে আল্লাহ আপনাদেরকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এখন আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে, অচিরেই আসবে এই অবহেলিত বেদেজনগোষ্ঠীর শুভ সকাল।

ছয়

সারাদিনের সব কার্যক্রম শেষ করে মাগরিবের পরে আমরা রওয়ানা হই মিরপুরের উদ্দেশ্যে। আজকের সফরের পরিসমাপ্তি এখানেই। আসার আগেই বেদেদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, পরবর্তী সফর হবে ছাতকের বেদেপল্লীতে। ফেরার পথে আমরা যাত্রাবিরতি করি রানা প্লাজার কাছে, অন্ধ সংস্থা মার্কেটের পেছনে অবস্থিত ইছলাহুন্নিছা মহিলা মাদরাসায়। বন্ধুবর মাওলানা আব্দুল মান্নানের দাওয়াতে এখানে আসা। মাদরাসায় এসে কথা হয় তার পরিচালক মাওলানা জুনায়েদ করীমের সাথে। অন্যান্য আলাপচারিতার পরে মাওলানা জালালাবাদী বিনীত কণ্ঠে দু’টো অনুরোধ করেন পরিচালক সাহেবের কাছে।
১. আপনারা এখানে অন্তত বিশটি বেদে মেয়েকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত

বিনা বেতনে পড়ালেখার করার ব্যবস্থা করে দিন। যেহেতু এখানকার ছয়শ ছাত্রীর প্রায় সবাই বেতন দিয়ে লেখাপড়া করে, তাই মাত্র বিশটি মেয়ের জন্য এই ব্যবস্থা করা বোধ করি আপনাদের জন্য মোটেও কঠিন হবে না। ২. আপনারা শিক্ষিকা-ছাত্রীদেরকে ভাগ ভাগ করে সপ্তাহে অন্তত একদিন হলেও পার্শ্ববর্তী বেদে মেয়েদের মধ্যে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনতের সুফলে সাভার বেদেপাড়ার অনেকের জীবনের মধ্যেই আমি দেখেছি সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। আপনারও যদি সে ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারেন, বিশেষ করে বেদে মেয়েদেরকেও সম্পূর্ণ ইসলামি ভাবপরায় পরিচালিত করতে পারেন, তবে এই অবহেলিত বেদেদের ভাগ্যাকাশে অচিরেই উদিত হবে নতুন দিনের সোনালি সূর্য। মাদরাসার পরিচালক সাহেবও প্রস্তাব শুনে অত্যন্ত খুশি হন এবং সাদরে তা গ্রহণ করেন। মাওলানা জালালাবাদী এরপর ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এক আবেগমাখা মর্মস্পশী বক্তৃতা করেন। এশার নামাজের পরে আমরা রওয়ানা করি যে যার গন্তব্যের পথে। পাঠক, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আবারো দেখা হবে অন্য কোনো সফরে। বেদেদের সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায় ইতি টানছি এই আখ্যানের।

আলী হাসান উসামা

মারকাযুদ দাওয়াহ্ ইসলামিয়া, ৩০/১২, পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬

দৃপ্ত পদবিক্ষেপ, দীপ্ত মানস

ALI HASAN OSAMA·THURSDAY, DECEMBER 8, 2016

সুন্দর একটি পৃথিবী। আলোকিত কোনো ভূখণ্ড। মনে করো, ঠিক আমাদের এ পৃথিবীর মতো, কিবা আরো সুন্দর, আলোকোজ্জ্বল। সেখানে অভাব নেই কোনো কিছুর। স্বপ্নেরাও হার মানে তার চিত্র ধারণে। তবে একটি জিনিসের

কমতি। স্রেফ এক জিনিসের ঘাটতি। সেখানকার অধিবাসীদের কোনো ভাষা নেই। মনের ভাব প্রকাশে তারা অক্ষম। সৌন্দর্যের সব উপকরণ তাই তাদের কাছে নিষ্প্রভ। ভোগের রকমারি সামগ্রী মূল্যহীন। তাদের জীবনে সুখ নেই, প্রশান্তি নেই। এমন জীবন-ধারণের কোনো অর্থ নেই।

আমাদের মুখের ভাষা, মনের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা- এ যে অমূল্য সম্পদ, সৃষ্টিকর্তার পরম দান। অপার নেয়ামতরাজির মাঝে এ যে স্বকীয়। ভাষা ছাড়া জীবন প্রকৃত অর্থেই অর্থহীন।স্বপ্নিল পৃথিবী পুরোই আঁধার। কালক্ষেপণ দুরূহ। জীবন দুর্বিষহ।

অধুনা গড়ে ওঠেছে যে সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সব তো ভাষারই অবদান। একটু ভেবে দেখো, এ মানুষগুলো যদি হতো ভাষাহীন, কীভাবে তবে গড়ে উঠতো সভ্যতা সংস্কৃতি শিল্প কল, চরম উৎকর্ষে পৌঁছতো বিজ্ঞান প্রযুক্তি! নির্মিত হতো কি এমন আলোকিত সমাজ?

প্রতিটি প্রাণীর রয়েছে স্বতন্ত্র ভাষা, রয়েছে আলাদা আলাদা ভাব প্রকাশের ক্ষমতা। কিন্তু মানুষের ভাষার মতো এতো সরল স্বচ্ছন্দ সহজাত সমৃদ্ধ ভাষা নেই আর কারো। এ যে মানুষের স্বকীয়তা, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

পৃথিবীতে রয়েছে আড়াই সহস্রাধিক ভাষা। প্রতিটি ভাষারই রয়েছে ইতিহাস, স্বকীয়তা, । তবে হলফ করে বলতে পারি, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত দেশ ও পতাকা, ত্রিশ লক্ষ শহিদের খুনে প্রাপ্ত ভাষা, অগণন ধর্ষিতার গগনবিদারী আর্তস্বর, লাখো নিপীড়িতের বুকভাঙ্গা কান্না, সন্তানহারা সহস্র মায়ের কলজেপোড়া কুম্ভীরাশ্রু সিক্ত যে ভাষা, সে তো শুধুই আমার মায়ের ভাষা- প্রাণের প্রিয় বাংলা ভাষা।

এ ভাষার জন্য রাজপথে খুন ঢেলেছি। অম্লানবদনে সয়েছি কতোশতো নিপীড়ন। হেসে হেসে পান করেছি মৃত্যুর সুধা। বুকে বুলেট খেয়েও গেয়েছি এ ভাষার গান। এ ভাষা আমার অর্জন, অমূল্য অর্জন। যেকোনো মূল্যে ধরে রাখবো তাই এর ইজ্জত-সম্ভ্রম।

লিখন শিল্পকে এককথায় বলা যায় সাহিত্য। ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক, মহাজাগতিক যে চিন্তা, চেতনা, ভাব, অনুভূতি, সৌন্দর্য ও শিল্পের লিখিত প্রকাশ তাই সাহিত্য। সাহিত্য সভ্যতার বাহন, বিপ্লবের নীরব হাতিয়ার। সাহিত্য মানুষের সত্তাকে সংস্কৃতিবান করে, অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করে আর মুখের ভাষাকে করে পরিশীলিত। সভ্য ও মার্জিত মানব গঠনই সাহিত্যের আরাধ্য। সাহিত্যসেবার মাধ্যমে সমাজ ও সভ্যতার মানবিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সম্ভাবিত হয়।

ভাষা ও সাহিত্যের যোগসূত্র: ভাষা হলো সাহিত্যের ভিত্তি। সাহিত্য সেই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত আলোকিত প্রাসাদ। আর ভাষা যদি হয় সুদৃঢ় প্রাচীর, সাহিত্য তার বুকে অঙ্কিত কারুকাজ। চিন্তা ও সভ্যতার উন্নতির রসে উজ্জীবিত মত দর্শন ভাবাবেগ ও আবেদনের উন্নত শিল্প-শাণিত বিকাশই হলো সাহিত্য।

ভাষাচর্চা ও সাহিত্যসেবার জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত উপাদান এবং উপাদানকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য ভাষার সৌকর্য শিল্প ও অলঙ্কার। আর চূড়ান্ত সাফল্যের হাতছানি পাওয়ার জন্য প্রয়োজন অবিরাম সাধনা ও দৃঢ় প্রত্যয়। স্বপ্ন জয়ের প্রত্যয় নিয়ে যখন তুমি ব্রত হবে নিমগ্নতায়, সাহিত্য কেনো আকাশের তারকা জয়ও দুরূহ হবে না মোটেও।

ইসলামেও রয়েছে ভাষাচর্চা ও সাহিত্যসেবার ঢের গুরুত্ব। আর তা হবেই না কেনো! মহাগ্রন্থ আলকোরআনের নিপুণ বর্ণনাশৈলি ও মোহমুগ্ধ সাহিত্য বিমোহিত করেছিলো পুরো আরববাসীকে। নির্বাক করেছিলো পৃথিবীখ্যাত কবি-সাহিত্যবোদ্ধাদেরকে। কোরআন তাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানও জানিয়েছে বারবার; কিন্তু তারা সবাই বাধ্য হয়েছিলো খোলা চ্যালেঞ্জের সামনে নতি স্বীকার করতে। ইসলামের মহান নবি মুহাম্মাদে আরাবিও ছিলেন আরবের সবচে বিশুদ্ধভাষী, শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। তার সর্বমর্মী বচনাবলী ইতিহাসের পাতায় চিরভাস্মর।

ভাষাচর্চা ও সাহিত্যসেবায় নিমগ্ন হওয়া এখন সময়ের অপরিহার্য দাবি। ঔদাস্য হয়ে গেছে বেশ। রকমারি অপঘাতে ভাষা আমাদের পরিক্লিষ্ট। আলস্যের চাদর ছুড়ে দৃপ্ত পদবিক্ষেপে সরব হবে তুমি এ অঙ্গনে, ভাষার নেতৃত্ব অর্জনের দীপ্ত মানসে- সুহৃদ, তোমার প্রতি এ আমার উদাত্ত আহ্বান।

-আলী হাসান উসামা

আজও হৃদয়ে অনুরণিত হয় তোমারই আবেগমাখা সংগীতের সুমধুর ধ্বনি, হে প্রিয় জুনায়েদ জামশেদ রহ.

ALI HASAN OSAMA·WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2016

আজ আমি গল্প বলবো। একজন পপস্টারের অসাধারণ আত্মত্যগের গল্প। খোদার রাহে তুলনাহীন কোরবানির নযরানা পেশ করার গল্প। এক ক্ষণজন্মা মহান দা‘য়ী ও বিশ^খ্যাত সফল ইসলাম সংগীতশিল্পীর অকাল নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়ার বেদনীয় অবিস্মরণীয় গল্প।

৭ই ডিসেম্বর ২০১৬। পাকিস্থানের স্থানীয় সময় ৪টা বেজে ৪০ মিনিট। চিত্রলা থেকে ইসলামাবাদ অভিমুখী পিআইএ বিমানের ফ্ল্যাইট ৬৬১ তখন অ্যাবোটাবাদের আকাশে। চিত্রলায় মাসতুরাতসহ দশ দিনের তাবলিগি সফর শেষ করে এ বিমানেই ইসলামাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন ইসলামি সংগীতাঙ্গনের উজ্জ্বল নক্ষত্র জুনায়েদ জামাশেদ। সাথে আছেন স্ত্রী নেহা জুনায়েদ ও পরিবারের আরো ক’জন সদস্য। ভাগ্যের পরিহাসে হঠাৎ যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে বিধ্বস্ত হয় পিআইএ বিমান। ঐতিহাসিক অ্যাবোটাবাদের একটি পাহাড়ে জ¦লেপুড়ে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন সাতচল্লিশজন যাত্রীর সবাই। তৈমুর জুনায়েদ এবং আয়েশা জুনায়েদ হারায় তাদের প্রিয় বাবাকে। আর আমরা হারাই লাখো- কোটি ভক্তের মনের কাবার প্রিয় শিল্পী জুনায়েদ জামশেদকে, মাত্র ৫২ বছর বয়সে নশ^র পৃথিবী ছেড়ে চলে যান তিনি না ফেরার জগতে, পরমপ্রিয় আপন প্রভুর সান্নিধ্যে। ইথারে ইথারে রেখে যান আবেগমাখা সংগীতের সুমধুর ধ্বনির হৃদয়গ্রাহী গুঞ্জরণ, ভালোবাসার অনুরণন।

১৯৬৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর বাবা জামশেদ আকবর খান ও মা নাফিসা আকবরের ঘর আলোকিত করে এ পৃথিবীতে আগমন করেন জুনায়েদ জামশেদ। চার ভাই-বোনের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবার বড়। ভাইদের নাম হুমায়ুন জামশেদ ও ওমর জামশেদ। একমাত্র বোনের নাম মুনিজা জামশেদ। বিমানবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জামশেদ আকবর খান ছিলেন অত্যন্ত সৎ এবং নিষ্ঠাবান। জুনায়েদ জামশেদ বলেন, “আমার বাবার পুরো সম্পদে কখনো একটি হারাম টাকার মিশ্রণ ঘটেনি। চার ভাই-বোনের সংসার তাই কিছুটা সংযমের সাথেই চলতো। তবুও বাবা তার জীবনে অবৈধ পস্থায় সম্পদ উপার্জনের চিন্তা কখনো মাথায় আনেননি।” বাবার আদর্শ ও সুখ্যাতি দেখে জুনায়েদ জামশেদও স্বপ্ন দেখেছিলেন, পড়ালেখা শেষ করে তিনিও হবেন আদর্শবান এয়ারফোর্স অফিসার, হবেন পাকিস্তান বিমানবাহিনীর যুদ্ধ বিমানের পাইলট। চোখের দৃষ্টিজনিত সমস্যার কারণে তার এ স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি। বিমানবাহিনীতে যোগ দিতে ব্যর্থ হয়ে তিনি একজন পেশাদার প্রকৌশলী হতে চেয়েছিলেন। ১৯৯০ সালে লাহোর প্রকৌশল ও

প্রযুক্তি বিশ ^বিদ্যালয় (টঊঞ খঅঐঙজঊ) থেকে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ¯œাতক ডিগ্রি অর্জন করার পরে কিছুদিন একটি বেসামরিক চঅঋ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানে প্রকৌশলী হিসেবে কাজও করেছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই জুনায়েদ জামশেদ সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। শখের বশেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাইতেন। ১৯৮৩ সালের আগে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে সংগীতানুষ্ঠান করতে। এক্ষেত্রে রাহেল হায়াত ও নুসরত হোসেন তাকে ব্যাপক সহযোগিতা করেন। ১৯৮৩ সালের পরে রাহেল হায়াতের থেকে নির্দেশনা পেয়ে জুনায়েদ কাজ শুরু করেন দলীয়ভাবে , যদিও কিছুটা সংক্ষিপ্তসারে। পাশাপাশি পড়ালেখার প্রতিও পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন। ১৯৮৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে রাহেল হায়াত ও শাহজাদ হাসানের সঙ্গে দেশাত্মবোধক গান ‘দিল দিল পাকিস্তান’ গাওয়ার মাধ্যমে দেশের প্রথম পপ ব্যান্ড ‘ভাইটাল সাইন’ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই ব্রডকাস্টার ও প্রযোজক শোয়েব মনসুর ব্যান্ডের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। তার ‘পিটিভি সংগীত স্টুডিও’র সাথে ‘ভাইটাল সাইনে’র একটি রেকর্ড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শোয়ের মনসুরের সহযোগিতায় মুক্তি পায় জুনায়েদ ব্যান্ডের প্রথম হিট অ্যালবাম ‘ভাইটাল সাইনস -১’। অ্যালবামের ‘দিল দিল পাকিস্তান’ এবং ‘তুম মিল গায়ে’ গান দুটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই একটি অ্যালবামই জুনায়েদ জামশেদকে আকাশচুম্বি খ্যাতি এনে দেয়। আর এর মাধ্যমে তার জীবনের মোড়ও ঘুরে যায়। পরিণত হন তিনি শৌখিন সংগীতসেবী থেকে একজন পেশাদার শিল্পীতে। ‘ভাইটাল সাইনস -১’ বাণিজ্যিক সাফল্যে পাকিস্তানের রক-সংগীত শিল্প বিকাশে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। প্রথম ঠরঃধষ ঝরমহং গায়ক ভোকালিস্ট হিসাবে জুনায়েদ তখন দেশব্যাপী প্রাধান্য ও জনপ্রিয়তা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেন। কয়েকটি জনপ্রিয় ও হিট অ্যালবাম বের করার পরে জুনায়েদ জামশেদ নিজেকে ভাইটাল সাইন থেকে আলাদা করে নেন। নিজের একক

ক্যারিয়ার গড়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। এতেও তিনি অসম্ভব জনপ্রিয়তা অজন করেন, ‘পাক সার যমিনে’ নিজেকে প্রথম পপস্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমন্ত্রিত হতে থাকেন। জুনায়েদ বলেন, ‘বাংলাদেশ ও ভারত ছাড়া বিশ্বের প্রতিটি দেশে আমি সংগীত পরিবেশন করেছি। প্রতিটা গানের বিনিময়ে কাড়ি কাড়ি অর্থ উপার্জন করেছি। পরিবারের সংযমের দিনও তখন শেষ হয়েছে। গাড়ি-বাড়ি সবই হয়েছে। অভাব ছিলো না কিছুরই। আমার গান তখন মানুষের মুখে মুখে। যেখানেই যাই, অন্যের কণ্ঠে নিজের পরিবেশিত গান শুনি। হৃদয়রাজ্যে বয়ে যায় তখন সুখ ও প্রশান্তির সমীরণ।’

জুনায়েদ জামশেদের গানের বিখ্যাত অ্যালবামগুলোর মধ্যে রয়েছে- ‘মেরা দিল’ (১৯৯৩), ‘জুনায়েদ অব ভাইটাল সাইনস’ (১৯৯৪), ‘উস রাহ পর (১৯৯৯) এবং ‘দিল কি বাত’ (২০০২)। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের সংগীত ‘‘কসম উস ওয়াকত কি’’ এবং পাকিস্তান বিমানবাহিনী তাদের ‘‘পালাটনা ঝাপাটনা’’-এর জন্য এই খ্যাতিমান পপস্টারকেই নির্বাচন করে।

জুনায়েদ জামশেদের জনপ্রিয়তার যখন তুঙ্গে, একের পর এক হিট অ্যালবাম বেরুচ্ছে তখন হঠাৎ করেই তিনি সংগীত ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দিলেন। ২০০২ সালে এক সংবাদ সম্মেলন করে ঘোষণা দেন, তিনি গানবাজনা ছেড়ে দিবেন। সাথে সাথে সংগীতাঙ্গনে ওঠে এক প্রলয়ংকারী ঝড়। অগনিত ভক্ত ও ফ্যান নিজেদের প্রিয়তম শিল্পীকে হারিয়ে শোকাহত হয়ে পড়ে। ২০০৩ সালে পাকিস্তানের ৫৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাফরুল্লাহ জামালী জুনায়েদ জামশেদের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি তাকে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে টেলিভিশনে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের জন্য আহ্বান করেন। জুনায়েদ বলেন, ‘‘স্যার, আমি তো গানবাজনা ছেড়ে দিয়েছি।’’ তিনি বলেন, ‘‘এটা কেমন কথা! তুমি আমার অনুরোধ রাখবে না?’’ কিছুক্ষণ ভেবে জুনায়েদ বলেন, ‘‘আচ্ছা, আমি আপনার অনুরোধ রাখতে পারি। তবে আপনাকেও আমার একটা শর্ত মানতে হবে।’’ তিনি বলেন, ‘‘কী শর্ত?’’ প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে জুনায়েদ বলেন,

‘‘এই গাওয়াই হবে আমার শেষ গাওয়া। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পরে গোটা জাতির সামনে আমি ঘোষণা করবো, আজ থেকে গানবাজনার সাথে আমি সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম।’’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সে শর্ত মেনে নিলেন। ১৪ আগস্ট ২০০৩, জুনায়েদ জামশেদ আনুষ্ঠানিকভাবে চিরবিদায় নিলেন নিষিদ্ধ এ জগত থেকে। যে ‘দিল দিল পাকিস্তানে’র মাধ্যমে তার শিল্পীজীবনের সূচনা, সেই একই গানের মাধ্যমে তিনি পরিসমাপ্তি ঘটালেন নিজের সংগীতজীবনের। ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ শিখরে থেকেও খ্যাতি ও আলোকিত ভবিষ্যতের পরিবর্তে বেছে নিলেন তিনি ঈমানকে, লীন হলেন প্রিয়নবির প্রদর্শিত পথে। খ্যাতিমান এই পপস্টারের জীবনে কীভাবে এলো এই নাটকীয় পরিবর্তন? প্রত্যয়দীপ্ত এ সিদ্ধান্তের কারণে কী অসাধারণ আত্মত্যাগ ও কোরাবানির নযরানা তাকে পেশ করতে হয়েছে? হ্যাঁ, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সে বিষয়ের প্রতিই সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো।

২
পাকিস্তানের খ্যাতিমান পপস্টার জুনায়েদ জামশেদ বিষণ œ মনে বসে আছেন। বাড়িতে মা ভীষণ অসুস্থ। অসুস্থতার প্রচ-তায় অনেক কষ্ট পাচ্ছেন, বিছানায় কাতরাচ্ছেন। অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক। কিন্তু তার যে আর সাধ্য নেই। মায়ের পথ্যেরও কোনো ব্যবস্থা নেই। ছেলে হয়েও নীরবে অশ্রু ঝরানো ছাড়া তিনি আর কিছুই করতে পারছেন না। এমন সময়ে ফোনটা বেজে ওঠলো।
‘‘হ্যালো, পপস্টার জুনায়েদ জামশেদ বলছেন?’’
‘‘জী, জুনায়েদ স্পিকিং।’’

‘‘পেপসি কোম্পানীর পক্ষ থেকে বলছি। আপনি আমাদের একটি সং গাইবেন। বিনিময়ে আমরা আপনাকে চার কোটি টাকা অনার করবো।’’
অসুস্থ মায়ের কাতর চিত্র হৃদয়-ক্যানভাসে ভেসে ওঠলো। কিছুটা দোদুল্যমানতায় পড়ে গেলেন জুনায়েদ জামশেদ। কিন্তু আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত যার জীবন, সে কি আর পার্থিব মোহে পড়ে বিচ্যুত হতে পারে

সরল পথ থেকে! জুনায়েদ কড়া ভাষায় না করে দিলেন। ওরা অনেক পীড়াপীড়ি করলো; কিন্তু তিনি আপন সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন।

জুনায়েদের তখন বড় কষ্টে যাচ্ছে দিন। হাতে নগদ টাকা যা ছিলো প্রায় সব শেষ। গাড়ি বিক্রি করেছেন তো সেই কবেই। সে অর্থে চলেছে কিছুদিন। এরপর বিক্রি করতে হলো শখের বাড়িটাও। এরমধ্যে বিভিন্ন শো-কনসার্টে সংগীত পরিবেশনের জন্য অফারের ধারাবাহিকতা তো চলছেই। একেক শো’র জন্য বরাদ্দ লাখ-লাখ টাকা। কিন্তু তিনি অনড়। ফের কিছুতেই আর পা বাড়াবেন না সেই নিষিদ্ধ অঙ্গনে। যতো কষ্টই বরণ করতে হোক, ত্যাগের যে নযরানাই তাকে পেশ করতে হোক, করে যাবেন সব সহাস্য বদনে। আরে, বেলাল-সোহাইব রা.দের আত্মত্যাগের সামনে এ যে একেবারেই নস্যি। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যে আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলেন জুনায়েদ। অর্থাভাবে কলজের টুকরো ছেলে-মেয়েদুটোকে- তৈমুর জুনায়েদ ও আয়েশা জুনায়েদকে ছাড়িয়ে আনতে হলো স্কুল থেকে। তখনও সংসার চালানোর জন্য কোনো আয়ের খাতের ব্যবস্থা হয়নি। সর্বশেষে যেদিন পকেটে ছিলো মাত্র একশ টাকার একটি নোট, স্ত্রী নেহা জুনায়েদের দিকে তা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ‘‘এই আমার নগদ অর্থ শেষ। কাল থেকে সংসার কীভাবে চলবে জানি না।’’ স্ত্রীও ছিলেন সাহাবি আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তিনিও দীক্ষিত হয়েছিলেন দীনী তালীমে। স্বামীর এই দুর্দিনে তিনি তাকে শক্তি যুগিয়েছেন, দীনের পথে অবিচল থেকেই সোনালি দিনের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। নেহা জুনায়েদ বললেন, ‘‘এ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। যে আল্লাহ এতোদিন আমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন, সে আল্লাহই এ দুর্দিনে আমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।’’ স্ত্রীর ঈমানদীপ্ত উত্তর শুনে জুনায়েদের হৃদয়রাজ্যে প্রশান্তির ¯িœ গ্ধ সমীরণ বয়ে যায়। এরপরে নেহা জুনায়েদ স্ব-উদ্যোগে পাঞ্জাবি-পা’জামা বানিয়ে বিক্রির জন্য বাজারে পাঠাতে শুরু করেন। আল্লাহ তাদের এই ত্যাগদীপ্ত উদ্যোগে এতোটাই বরকত দান করেন, ২০০৮ সালে বাংলাদেশে সফরকালে জুনায়েদ বলেন, ‘‘সারা পাকিস্তানে এখন আমার ৪৫টা শোরুম আছে। কোনটা কোথায় তাও আমি জানি না। নিজে গিয়ে সেগুলোর তদারকিরও প্রয়োজন পড়ে না। মাস শেষে

ব্যাংক একাউন্টে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টাকা চলে আসে। দুর্দিনের পরে মহান আল্লাহ ফের এনেছেন সোনালি সুদিন। তাছাড়া আমি এখন পুরোই অবসর। প্রায় সারাবছর আল্লাহর রাস্তায় তাবলিগে সময় লাগাচ্ছি। দাওয়াতের কাজে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর লাভ করছি আল্লাহর মহব্বত ও লক্ষ-কোটি মানুষের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা’’

নিজের পরিবর্তন সম্পর্কে জুনায়েদ জামশেদ বলেন, ‘‘১৯৯৭ সালের অক্টোবরে আমার এক বন্ধ’র সাথে তাবলিগ জামাতে মাত্র তিনদিন সময় অতিবাহিত করি। এটা আমার জীবনের সবচে অবিস্মরণীয় ঘটনা। এরপর আল্লাহর অনুগ্রহে আমার ভেতরে বোধ ও উপলব্ধি জাগ্রত হয় যে, সারাটা জীবন আমি তো বিরাট ভুলের মধ্যে কাটাচ্ছি। অবিরল স্রষ্টার অবাধ্যতায় ডুবে আছি। আমাকে জীবনের মোড় পরিবর্তন করতেই হবে। গানবাজনা ছাড়াও জীবনের বড় কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে।’’

কিন্তু সংগীত যার পেশা, সংগীত যার নেশা, যার রক্তের কণায় কণায় মিশে আছে সংগীত তার জন্য সংগীত ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত ছিলো অত্যন্ত কঠিন এবং অসম্ভবপ্রায়। জুনায়েদ সেই দিনকে স্মরণ করে বলেন, ‘‘আমি তখন ভীষণ বিষণ ছিলাম। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হৃদয়সাগর পুরো উতলে ওঠেছিলো। উথাল-পাথাল ঝড় বইছিলো হৃদয়রাজ্যে। কারণ সংগীত ছিলো আমার রক্তকনিকায়, ছিলো চামড়ার ভেতরে, ছিলো প্রতিটি লোমকুপের নিচে, যাতে আমি ছিলাম পুরোদমে অভ্যস্ত। কিন্তু আমি শুধু আল্লাহকে খুশি করতে চেয়েছি। আমি সেই ব্যক্তিটি হতে চাইনি, যাকে আল্লাহর কিতাবে মন্দ বলা হয়েছে।’’

শয়তানের অবিরাম প্ররোচনায় জুনায়েদের জন্য তখনই সংগীতাঙ্গনকে একেবারে বিদায় জানানো সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তার পরমপ্রিয় এক বন্ধুর লাগাতার তিন বছরের সাধনায় অবশেষে জুনায়েদ শত ব্যস্ততার মধ্যে সময় ফারিগ করে আরো একটি দিনের জন্য তাবলিগে সময় দেয়ার কথা মনস্থির করেন। বন্ধুর সাথে একদিনের সফরে বের হন জুনায়েদ। একদিন শেষ হলে

বন্ধুর অনুরোধে আরো একদিন, এরপর আরো একদিন- এভাবে করতে করতে পুরো চল্লিশদিন আল্লাহর রাস্তায় কাটিয়ে বাড়ি ফিরেন জুনায়েদ। এ দীর্ঘ সময়ে তার মানসজগতে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি দৃঢ়সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যে করেই হোক, সংগীতাঙ্গনকে বিদায় তিনি জানাবেনই। আগের পোশাক পরিবর্তন করে দেহে ধারণ করেন সুন্নতি লেবাস। দাড়ি একবার রাখেন, একবার কাটেন এভাবে চলছে। গানের পরিমাণও একেবারেই তখন কমিয়ে দিয়েছেন। এসময়ে মাওলানা তারেক জামিল সাহেব তাকে অভয় দেন। স্ত্রী নেহা জুনায়েদ সংগীতাঙ্গনের ব্যাপারে তাকে নিরৎসাহিত করেন, দীনের পথে অবিচল থাকার সাহস ও প্রেরণা যোগান। আর থাকে সেই বন্ধুটির নিরচ্ছিন্ন দাওয়াত ও মেহনত। এভাবে একপর্যায়ে জুনায়েদ জামশেদ ঈমানী বলে বলিয়ান হয়ে পুরো জাতির সামনে ঘোষণা করেন, ‘‘আজ থেকে ইসলামে নিষিদ্ধ এ অঙ্গণের সাথে আমি জুনায়েদ জামশেদ সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম।’’

এই পাহাড়সম সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তার কখনোই সে ব্যাপারে আফসোস হয়নি, পার্থিব জগতকে অম্লান বদনে লাথি মেরেও হৃদয়ে তার কোনো আক্ষেপ জাগেনি। জুনায়েদ বলেন, ‘‘আমার পূর্বের জীবনযাপনের কোনো দৃষ্টিভঙ্গিই এখন আর বাকি নেই। আমার নতুন জীবন খুব সরল, পবিত্র এবং সুন্দর। আমি অনুভব করি, আপনি যদি হিম্মত করে নিজ জীবনে আল্লাহর হুকুম এবং রাসুলের তরিকার ওপরে আমল করেন, তাহলে দুনিয়াতেই আপনার জীবন জান্নাতে পরিণত হবে।’’

এই নাটকীয় পরিবর্তন ও অসাধারণ আত্মত্যাগের পর আল্লাহ তার সুললিত কণ্ঠকেও দীনের খেদমতে কবুল করেন। শাইখুল ইসলাম মুকতি তকি উসমানী দা. বা. একদিন ফোন করে জুনায়েদ জামশেদকে দারুল উলুম করাচিতে ডেকে নেন। এরপর তিনি তার রচিত সাড়া জাগানো হামদ ‘‘এলাহি তেরি চৌকাঠ পর, ভিখারি বন কে আয়া হুঁ’’ জুনায়েদের হাতে তুলে দেন। নির্দেশ দেন, এটাকে সুন্দর করে গেয়ে রেকর্ড বাজারে ছড়িয়ে দিতে। হযরতের নির্দেশানুযায়ী জুনায়েদ হামদ রেকর্ড করে বাজারে ছাড়ার সাথে

সাথেই সারাদেশে হৈ চৈ পড়ে যায়, ইসলামি অঙ্গনে তা ব্যাপক সাড়া জাগায়। এরপর হামদ-নাতের অ্যালবাম তৈরি করে বাজারে ছাড়লে ২০০৭ সালে তা সারা পৃথিবীতে উর্দু অ্যালবামের সর্বোচ্চ বিক্রির রেকর্ড ভঙ্গ করে। যে কণ্ঠে একসময় উচ্চারিত হতো ‘এইতেবার’, ‘উস রাহ পর’, ‘দিল কি বাত’, ‘সওলি সালোনি’, ‘ইয়ে শাম’, ‘তুম দূর থা’, ‘কেহ দো জো ভী’ ও ‘না তু আয়োগি’র মতো উচ্চাঙ্গের দেশ কাঁপানো সংগীত, সে কণ্ঠই খোদার প্রেমে উত্তাল হয়ে গেয়ে ওঠে ‘বদরুদ্দোজা শামসুদ্দোহা’, ‘মেহবুবে ইয়াজদান’, ‘মেরে দিল বদল দে’, ‘মুহাম্মাদ কা রওযা’ ও তকি সাহেব রচিত ‘মুঝে যিন্দেগি মে ইয়া রব, সারে বান্দেগি আতা কর’-এর মতো উচ্চাঙ্গের ইসলামি নাশিদ।

জুনায়েদ জামশেদ বলেন, ‘‘আমি আশা করি, আমার মৃত্যুর পরও আমার হামদ-নাত-গজল মানুষের মুখে জারি থাকবে। একসময় সবার মুখে ছিলো আমার গান, এখন থাকবে আমার গজল। কিছুদিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকার সুবিখ্যাত মাদরাসা দারুল উলুম যাকারিয়ায় সফর করলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, প্রতিটি ছাত্রের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে আমার গজল। আমি খুব অভিভূত হয়ে পড়লাম। দীনের খাতিরে আল্লাহ আমাকে এতো সম্মান দান করেছেন।’’

জুনায়েদ জামশেদের ইসলামি নাশিদের অ্যালবামগুলোর মধ্যে আছে- ‘জালওয়ায়ে জানান’ (২০০৫), ‘মেহবুবে ইয়াজদান’ (২০০৬), ‘বদরুদ্দোজা’ (২০০৭), ‘রহমাতুল্লিল আলামিন’ (২০০৯), ‘বদিউয যামান’ (২০০৯), ‘হাদিউল আনাম’ (২০১০), ‘রাব্বি যিদনি ইলমা’ (২০০১), ‘নুরুল হুদা’ (২০১৩) ও ‘উম্মতি’ (২০১৬)। তার গাওয়া নাশিদের সংখ্যা শতাধিক।

লাখো-কোটি ভক্তের মনের কাবার প্রিয় শিল্পী জুনায়েদ জামশেদের জানাযা হয় করাচিতে। ১৫ই ডিসেম্বর, রোজ বৃহস্পতিবার সকালে জানাযার নামাযে ইমামতি করেন মাওলানা তারেক জামিল। নামায শেষে অসিয়ত মোতাবেক জুনায়েদ জামশেদকে দারুল উলুম করাচির কবরস্থানে দাফন করা হয়। তার জীবনের অন্যতম প্রশংসনীয় দিক ছিলো, দীনের পথে আসার পর

থেকে আমরণ তিনি প্রতিটি উদ্যোগ ও পদক্ষেন গ্রহণ করছেনে মুফতি তকি উসমানি দা. বা.র পরামর্শে। একক সিদ্ধান্তে কখনো কোনো কাজ করেননি।
মৃত্যুর পরও তাই পরম মমতায় জড়িয়ে থাকতে চেয়েছেন শায়খের পদধূলিধন্য দারুল উলুম করাচিকে। তাই আগেই অসিয়ত করে রেখেছিলেন আপনজনদেরকে। আল্লাহ তাকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। আমিন। তার একটি নাশিদের মাধ্যমেই আমার এ লেখার ইতি টানছি।

‘‘মেরা দিল বদল দে...
মেরা গাফলত মেঁ ডুবা দিল বদল দে...
হাওয়া ও হিরসওয়ালা দিল বদল দে...
খোদা ইয়া ফাযলো করমা দিল বদল দে...
গুনাহগারি মে কব তক উমর কাটো....
বদল দে মেরা রাস্তা দিল বদল দে...।’’

-আলী হাসান উসামা
মংলীপার, সিলেট

ক্ষমা ও উদারতা এনে দিতে পারে বিজয় ও সফলতা

ALI HASAN OSAMA·THURSDAY, FEBRUARY 2, 2017

প্রতিনিয়ত ডুবে আছি আমরা গুনাহের অথৈ সাগরে। নিজের ওপরে করেছি শত অবিচার। হৃদয়াকাশ হয়ে গেছে ঘন কালো। তবুও মহামহিম আল্লাহ ধ্বসিয়ে দেননি আমাদেরকে ভূমিতলে। কিংবা করেননি আকাশ থেকে পাথরবর্ষণ। উল্টো সাহস যুগিয়েছেন। নিরাশ হতে বারণ করেছেন। নির্দেশ দিয়েছেন গুনাহ পরিত্যাগের, হেদায়াতের দীপ্ত পথ অবলম্বনের। বলেছেন, “হে আমার বান্দারা, যারা অবিচার করেছো নিজের ওপরে, নিরাশ হয়ো না তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মার্জনা করবেন পাপরাশি। তিনি তো অতি ক্ষমাশীল, বড় দয়ালু।” [সূরা যুমার: ৫৩] আরো দেখুন-

সূরা নিসা: ৪৩, ৯৯, ১৩৯; সূরা হজ: ৬০; সূরা মুজাদালাহ: ২।
মহানবী সা. বলেন, কষ্টের কথা শুনে আল্লাহ থেকে অধিক ধৈর্যধারণকারী কেউ নেই। তারা (কাফিরেরা) আল্লাহর জন্য সন্তান স্থির করে। এতোদসত্ত্বেও তিনি তাদেরকে প্রশান্তিতে রাখেন, রিযিক প্রদান করেন। [বোখারি:৭৩৭৮; মুসলিম: ২৮০৪]
ক্ষমাশীল মহামহিম আল্লাহ তার প্রিয় নবীকেও নির্দেশ দিয়েছেন ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বনের। ইরশাদ হয়েছে, ক্ষমা অবলম্বন করুন আর সদয়তার নির্দেশ দিন, আর ভ্রুক্ষেপ করবেন না অজ্ঞদের দিকে। [সূরা আ’রাফ: ১৯৯; সূরা মায়িদা: ১৩]
নির্দেশ দিয়েছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকেও, তারা যেনো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে অন্যের ভুল-ত্রুটি ও অবিচার। [সূরা জাসিয়া: ১৪; সূরা নুর: ২২]
ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বনের ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়েছেন আরো অনেক আয়াতে। ক্ষমাকে অভিহিত করেছেন জান্নাতবাসীদের গুণ বলে। আরো বলেছেন, পুরস্কৃত করবেন তিনি ক্ষমাশীলদেরকে বিশেষ পুরস্কারে। [সূরা আলে ইমরান: ১৩০-১৩৬; সূরা তাগাবুন: ১৪-১৫; সূরা শুরা: ৩৭-৪৩]

পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষমাগুণ
১. নুহ আ. প্রেরিত হলেন আপন সম্প্রদায়ের কাছে নবুওয়াতের বার্তা নিয়ে। তাদেরকে দাওয়াত দিলেন সত্যধর্মের ও একত্ববাদের। তুলে ধরলেন তাদের সামনে মূর্তিপূজার অসাড়তা। সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ তখন বলে ওঠলো, আমরা তো তোমাকে প্রকাশ্য গোমরাহিতে দেখতে পাচ্ছি। নুহ আ. উত্তেজিত হলেন না। মায়াভরা কণ্ঠে বললেন, “আমার কোনো গোমরাহি নেই। আমি তো রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল।” [সূরা আরাফ: ৬০-৬১]

২. হুদ আ. সরলমনে বড় আশা নিয়ে দাওয়াত দিলেন আপন সম্প্রদায়কে।

হতভাগারা তখন বেঁকে বসলো। আপন মুখের ফুৎকারে সত্যের দীপ্ত প্রদীপ নিভিয়ে দিতে উদ্যত হলো। তারা বললো, আমরা তো নিশ্চিতভাবে দেখছি, তুমি নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত রয়েছো। হুদ আ. বললেন, “আমার কোনো নির্বুদ্ধিতা দেখা দেয়নি। আমি তো জগতসমূহের পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল।” [সূরা আ’রাফ: ৬৬-৬৭]

মুহাম্মাদে আরাবি সা.-র ক্ষমাগুণ
১. তাওরাতে বর্ণিত মহানবীর গুণাবলির বর্ণনার ধারাবাহিকতায় আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ’ছ রা. নলেন, “তিনি কঠিন ও রূঢ় স্বভাবের অধিকারী নন। আর নন তিনি হাট-বাজারে হট্টগোলকারী। তিনি মন্দকে প্রতিহত করেন না মন্দ দ্বারা। তার স্বভাববৈশিষ্ট্য ক্ষমা করা, মার্জনা করা।” [বোখারি: ২১২৫]

২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যেনো আমার চোখে এখনও ভাসছে প্রিয়নবীর মুখাবয়ব। তিনি বর্ণনা করছেন কোনো এক নবীর কথা। (কুরতুবি রহ. বলেন, তিনি মূলত নিজের ঘটনাই বর্ণনা করছেন নিজেকে গোপন রেখে। [ফাতহুল বারি: ১২/৩২৪] আপন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে মেরে রক্তাক্ত করে ছেড়েছে। আর সেই নবীর চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন আর বলছেন, “প্রভু হে, ক্ষমা করে দাও আমার সম্প্রদায়ের অবুঝ লোকগুলিকে!” – [বোখারি: ৬৯২৯; মুসলিম: ১০৫৭]

৩. আনাস বিন মালিক রা. বলেন, একদিন রাসূলের সাথে আমি হাঁটছিলাম। রাসূলের গায়ে ছিলো একটি নাজরানি চাদর। বসনাঞ্চল ছিলো বেশ পুরু। ইত্যবসরে এক গেঁয়ো লোক রাসূলকে দেখে তার চাদর ধরে জোরসে টান দিলো।
আমি রাসূলের ঘাড়ের ওপরে দৃষ্টি ফেললাম। টানের আঘাতে তাতে দাগ পড়ে গেছে! এরপর সেই গেঁয়োলোক রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বললো, তোমার কাছে রক্ষিত আল্লাহর সম্পদের কিয়দাংশ আমাকে প্রদানের নির্দেশ দাও।

রাসূল সা. তখন তার দিকে ফিরে মৃদু হাসলেন। এরপর তাকে তা প্রদানের নির্দেশ দিলেন। [বোখারি: ৬০৮৮]

৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বর্ণনা করেন, নজদ অভিমুখে এক জিহাদে আমি রাসূলের সাথে ছিলাম। জিহাদ শেষে ফেরার পথে ভরদুপুরে সারি সারি বাবলা গাছ বিশিষ্ট এক উপত্যকায় আমরা অবতরণ করলাম। বিক্ষিপ্ত হয়ে সবাই তখন গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলাম। রাসূলও তখন এক বাবলা গাছের সাথে তরবারি ঝুলিয়ে বিশ্রাম করছিলেন। সাহাবিগণের চোখে তখন তন্দ্রা এসেছিল। আচমকা এক বেদুইন এসে রাসূলের ঝুলানো তরবারি নিয়ে তা খাপমুক্ত করলো। পরক্ষণে সে রাসূলের ওপরই তা ধারণ করলো। রাসূলের ঘুম তখন ভেঙ্গে গেলো। তাকে জাগ্রত হতে দেখে বেদুইন বলে ওঠলো, কে রক্ষা করবে তোমাকে আমার হাত থেকে? রাসূল তখন তিনবার বললেন, আল্লাহ! বেদুইনের দেহ তখন প্রকম্পিত হলো। হাত থেকে পড়ে গেলো তরবারি। অনন্তর রাসূল তাকে কোনোই শাস্তি দিলেন না কিংবা বললেন না কোনো কটু কথা। এরপর রাসূল সবাইকে ডাকলেন। সাহাবিগণের উপস্থিতিতে বিস্তারিত ঘটনা শুনালেন। সেই বেদুইন তখন তার পাশে নীরব বসা। [বোখারি: ২৯১০, ৩৯৯০; মুসলিম: ৮৪৩]

৫. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, এক গেঁয়ো এসে মসজিদে ঢুকলো। রাসূল সা. তখন বসা। সে এসে নামাযে দাঁড়ালো। নামায শেষে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে লাগলো, “হে আল্লাহ, আপনি রহম করুন আমাকে ও মুহাম্মাদকে! আমাদের সাথে রহম করবেন না আর কাউকে!” রাসূল সা. তার দিকে তাকালেন। বললেন, “তুমি দেখছি এক ব্যাপক বিষয়কে সংকীর্ণ করে ফেলেছো!” কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত না হতেই সেই গেঁয়ো মসজিদে পেশাব করতে বসে গেলো। সাহাবিরা তখন দ্রুতবেগে তার কাছে ছুটে গেলো। রাসূল তাদেরকে বাধা প্রদানে বারণ করলেন। পেশাব শেষ হলে সাহাবিদেরকে এক বালতি পানি ঢেলে দিতে নির্দেশ দিলেন। এরপর বললেন,

তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে সহজকারীরূপে; কঠিনকারীরূপে নয়। [তিরমিযী: ১৪৮; আবু দাউদ: ৩৮০]

৬. কুরাইশ কাফিরগোষ্ঠী কী নির্মম অত্যাচার করেছিলো নিরপরাধ মুসলমানদের ওপরে! বইয়ে ছিলো রক্তের কতো বন্যা! মহানবীকেও করেছিলো নিপীড়িত, নিগৃহীত।
অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পরে রাসূল সা. সেই মক্কায় প্রবেশ করলেন অবনত মস্তকে, সাশ্রু নয়নে। উচ্চারিত হচ্ছিলো তার পবিত্র যবানে, “নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সুস্পষ্ঠ বিজয় দান করেছি।” [সূরা ফাতহ: ১]
এরপর ঘোষণা করলেন সাধারণ ক্ষমা- “যে অস্ত্র সমর্পণ করবে সে নিরাপদ। যে বন্ধ রাখবে নিজ ঘরের দরজা সে নিরাপদ। যে প্রবেশ করবে হারামে সে নিরাপদ। যে প্রবেশ করবে আবু সুফিয়ানের ঘরে সেও নিরাপদ। অবশেষে সবার উপস্থিতিতে করুণার আধার রাসূল সা. ঘোষণা দিলেন, আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই! তোমরা সবাই মুক্ত। [আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/২৯১-৩০৮]

৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. নিজ হাতে আঘাত করেননি কাউকে; না স্ত্রী কিংবা দাস-দাসীকে। তবে আল্লাহর রাহে জিহাদের বিষয়টি ভিন্ন। আর কখনো এমন হয়নি, তার সাথে কোনো অন্যায় আচরণ হয়েছে আর তিনি অন্যায়কারী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। তবে কেউ আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়াবলিতে লিপ্ত হলে আল্লাহর জন্য তিনি তার শোধ নিতেন। [মুসলিম: ২৩২৮]

সাহাবিদের ক্ষমাগুণ
আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, উহুদ যুদ্ধ চলাকালে ইবলিস হঠাৎ সৈন্যদলের

মাঝে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ওঠলো- ঐ যে পেছনে! সামনের দল তখন পেছনের দলের ওপরে চড়াও হলো। একপর্যায়ে তারা হুযায়ফা রা. -এর বাবা ইয়ামান রা.-কে লড়াইয়ের প্রভ-তায় আঘাত করে বসলো। হুযায়ফা রা. চিৎকার করে ওঠলেন- আমার বাবা! আমার বাবা!! কিন্তু ততক্ষণে ইয়ামান রা. শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন। অবস্থাদৃষ্টে হুযায়ফা রা. বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন! তিনি কোনো শোধ নিলেন না হত্যাকারীদের থেকে। [বোখারি:৬৮৮৩]

সালাফের ক্ষমাগুণ
শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকি উসমানি দা.বা. আপন পিতা মুফতিয়ে আযম পাকিস্তান আল্লামা শফি রহ. সূত্রে বর্ণনা করেন, প্রখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা ইসমাইল শহিদ রহ. অতীতে যার দৃষ্টান্ত মেলা ভার- একবার দিল্লির জামে মসজিদে বয়ান করছিলেন। মজলিস ছিলো ভক্ত-অনুরক্তদের উপস্থিতিতে টইটুম্বুর। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে ওঠলো, শুনলাম, আপনি নাকি হারামযাদা! মাওলানা ইসমাইল শহিদ রহ. বিনয়ভরা কণ্ঠে বললেন, ভাই, তুমি ভুল শুনেছো! আমার মায়ের বিয়ের স্বাক্ষী তো এখনও দিল্লিতে জীবিত রয়েছে। [মেরে ওয়ালেদ মেরে শায়খ: ১১০]

ক্ষমাপরায়ণতা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ
১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. মেহরাবে উপবিষ্ট অবস্থায় বললেন, তোমরা দয়া করো। পরিণামে দয়াপ্রাপ্ত হবে। অন্যকে ক্ষমা করো। ফলস্বরূপ নিজেরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। [মুসনাদে আহমদ: ৬৫৪১]
২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, সদকা সম্পদে সামান্য পরিমাণও হ্রাস করে না। ক্ষমা শুধু ব্যক্তির মর্যাদাই বৃদ্ধি করে। আল্লাহর জন্য কেউ বিনয় অবলম্বন করলে পরিণামে আল্লাহ তার মর্যাদা সুউচ্চ করেন। [মুসলিম: ২৫২৮; তিরমিযী: ২০২৯]
৩. মুআয বিন আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম অবস্থায় যে ক্রোধ সংবরণ করে কেয়ামত দিবসে সকল সৃষ্টির

উপস্থিতিতে আল্লাহ তাকে আহ্বান করে জান্নাতের হুর নির্বাচনের বিশেষ অধিকার প্রদান করবেন। [তিরমিযী: ২৩৯৩; আবু দাউদ: ৪৭৭৭]
৪. উকবা বিন আমির রাযি. রাসূলের কাছে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে শ্রেষ্ঠতম আমলের কথা বলে দিন। রাসূল সা. বললেন, হে উকবা, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো। যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে প্রদান করো। যে তোমার প্রতি অবিচার করে তুমি তাকে ক্ষমা করো। [মুসনাদে আহমাদ: ১৭৩৩৪,১৭৪৫২; আবু দাউদ: ৪৮৯৬; মুসলিম: ২৫৮৮]

ক্ষমাপরায়ণতা সম্পর্কিত আছার
১. আবু বকর রা. বলেন, আমার কাছে এ মর্মে বর্ণনা পৌঁছেছে যে, মহামহিম আল্লাহ কেয়ামত দিবসে একজন আহ্বানকারীকে নির্দেশ দিবেন। অনন্তর সে আহ্বান করবে, আল্লাহর কাছে যার কিছু পাওনা রয়েছে সে যেনো উপস্থিত হয়। ক্ষমাশীল বান্দারা তখন মহামহিমের দরবারে উপস্থিত হবে। আল্লাহ তখন তাদেরকে ক্ষমাগুণের পুরস্কারস্বরূপ যথেষ্ট প্রতিদান দিবেন। [ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন: ৩/১৯৫]
২. হাসান বসরি রহ. বলেন, মুমিনের সর্বোত্তম চরিত্রগুণ হলো ক্ষমাপরায়ণতা। [আলআদাবুশ কারণয়্যাহ: ১/৭১]
৩. এক ব্যক্তি উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিজ অত্যাচারিত হওয়ার অভিযোগ করলো। উমর রহ. বললেন, অত্যাচারিত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে তোমার উপস্থিত হওয়া শোধ নিয়ে উপস্থিত হওয়া থেকে বহুগুণে কল্যাণকর। [ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন: ৩/১৮৩]
৪. এক বুযুর্গ বলেন, সহনশীল সে নয়, যে অত্যাচারিত হলে সহনশীলতা প্রদর্শন করে। পরবর্তীতে সুযোগ পেলে শোধ নিয়ে নেয়। প্রকৃত সহনশীল সে, যে অত্যাচারিত হলে ধৈর্য ধরে। প্রতিশোধের ক্ষমতা পেলে ক্ষমা করে। [ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন: ৩/১৯৬; ফাতহুল বারি: ১৪/৩১৯; ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন: ৩/১৮৩; দালিলুল ফালিহিন: ৩/৯১]

ক্ষমাপরায়ণতার উপকারিতা
১. ক্ষমাপরায়ণতা উত্তম চরিত্রের দীপ্ত বহিঃপ্রকাশ।
২. ক্ষমাপরায়ণতা ঈমানের পূর্ণতার পরিচায়ক।
৩. ক্ষমাপরায়ণতা মহানুভবতা ও উদারতার ইঙ্গিতবাহক।
৪. ক্ষমাপরায়ণতা আল্লাহর নৈকট্য ও মানুষের ভালোবাসা লাভের উপায়।
৫. ক্ষমাপরায়ণতা সমাজকে সুন্দর করে। উপহার দেয় সম্প্রীতির বন্ধনে অটুট আলোকিত এক জাতি।
৬.ক্ষমাপরয়ণতা এক আলোকবর্তিকা, যা অমুসলিমদেরকেও ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করে।

পুনশ্চ
ক্ষমাপরায়ণতার গুণ অর্জনের জন্য প্রয়োজন দৃঢ় সংকল্প। মিটিয়ে দিতে হবে নিজের আমিত্ত্বে। আল্লাহ বলেন, প্রকৃতপক্ষে যে সবর অবলম্বন করে ও ক্ষমা প্রদর্শন করে, নিঃসন্দেহে তা বড় হিম্মতের কাজ। [সূরা শুরা: ৪৩]

স্মতর্ব্য যে, ক্ষমাপরায়ণতার পুরস্কার শুধু পারলৌকিকই নয়। অর্জন করুন এ নববী গুণ আর উপভোগ করুন জীবন। আল্লাহ বলেন, তুমি মন্দকে প্রতিহত করো এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট। ফলস্বরূপ তোমার এবং যার মধ্যে ছিলো শত্রুতা সহসাই দেখবে সে হয়ে যাবে সুহৃদ। আর এ গুণ কেবল তাদেরকেই দান করা হয়, যারা সহিষ্ণু এবং যারা মহা ভাগ্যবান। [হা- মিম-সাজদা: ৩৪-৩৫]

শিশুদের সঙ্গে প্রিয়নবির অমায়িক আচার: জয়তু পুষ্পসদৃশ মানবকলি

ALI HASAN OSAMA·TUESDAY, FEBRUARY 7, 2017

শিশুরা পৃথিবী নামক উদ্যানের সুরভিত পুষ্প; পুষ্পসদৃশ সুন্দর সম্ভাবনাময় মানবকলি। সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠলে যারা নিজেদের সৌরভে

বিমোহিত করে তুলে পৃথিবী ও তরি প্রকৃতি। মহান আল্লাহ নিজ কুদরতে প্রতিটি শিশুর মাঝে বহু সম্ভাবনার বীজ বপন করে রেখেছেন। উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় শ্রম-সাধনা ব্যয়িত হলে এবং অনুকূল পরিবেশ পেলে সেই বপিত বীজের সুন্দর অঙ্কুরোদগম হয়। শিশু তার প্রতিভার আলোকচ্ছটায় প্রফুল্ল করে বাবা-মা’র মন, দীপ্ত করে পৃথিবী ও বইয়ে দেয় নীরব আলোড়ন। যথাযথ পরিচর্যার অভাবে অকালেই আবার অনেক পুষ্পকলি শুকিয়ে ঝরে যায়। তাদের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ডানা মেলার আগেই মরে যায়। প্রতিভা প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই নষ্ট হয়ে পুষ্পবৃক্ষ থেকে খসে পড়ে যায়। শিশুদের নির্মল হৃদয় স্বচ্ছ আয়নার মতো; বড়দের কার্যকলাপ ও আশপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতির ছায়া তার ওপর পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়। বড়দেরকে দেখে দেখে গড়ে ওঠে শিশুদের মানসজীবন। ফলে তা কখনো ঋদ্ধ ও উদার হয়, বড় হওয়ার চেতনা ও প্রেরণা তাতে আশ্রয় গেড়ে নেয় আর কখনোবা তা হয় হীন ও তুচ্ছ, পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের ওপর চরম ঘৃণা ও রোষ নিয়ে ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠে, তমসায় গোটা পৃথিবী ছেয়ে ফেলতে তা প্রবল আক্রোশে ধেয়ে আসে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রিয়নবি মুহাম্মাদে আরাবি সা. আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। মহান আল্লাহর ঘোষণা- “নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” সুরা আহযাব: ২১। শিশুদের সঙ্গে কেমন ছিলো সেই নবির আচরণ? কোন প্রক্রিয়ায় তিনি পুষ্পসদৃশ মানবকলিদের পরিচর্যা করেছেন, তাদের মানসজীবন ঋদ্ধ করেছেন, তাদের ভেতর আত্মবিশ্বাস ও প্রেরণা জাগিয়েছেন? কীভাবে তিনি আজকের শিশুকে আগামী দিনের ভবিষ্যতরূপে গড়ে তুলেছেন? বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে কিছুটা বিস্তারিত পরিসরে আমরা নবিজীবনের এ দিকটির ওপর আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো।

প্রিয়নবি সা. শিশুদেরকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসতেন। শিশুদের ভালোমন্দের প্রতি সর্বদা লক্ষ রাখতেন। শিশু- সে যেই হোক, যেমনই হোক; হোক না কোনো পথশিশু কিবা ব্যভিচারিনীর গর্ভজাত সন্তান,

প্রত্যেকের জন্য প্রিয়নবির আকাশসম হৃদয়ে ছিলো সংরক্ষিত আসন। কোনো শিশুর প্রতি তার আকাশসম হৃদয়ে ছিলো না সামান্য কঠোরতা কিবা ঘৃণা। বুরাইদা রা. বলেন, গামেদ বংশীয় এক নারী একবার ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। পরবর্তীতে সেই নারী অনুতপ্ত হয়ে গুনাহের শাস্তি বরণ করে নিতে প্রিয়নবির কাছে ছুটে আসে। এসে আরজ করে- ‘হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে পবিত্র করুন।’ রাসুলুল্লাহ সা. বললেন- ‘যাও। ফিরে যাও। গিয়ে আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করো, তওবা করো।’ এবার সে আরজ করে- ‘যেভাবে আপনি মায়িয ইবনে মালিককে পিরিয়ে দিয়েছিলেন, বোধ করি আমাকেও সেভাবে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন।’ রাসুলুল্লাহ সা. এবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী হয়েছে?’ সে বলে- আমি ব্যভিচার করেছি। আর সেই পাপের বোঝা এখন পেঠে বয়ে চলছি।’ রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, ‘তুমি?’ সে বলে, ‘জি হাঁ।’ রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, ‘গর্ভস্থ সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তোমার ওপর কোনোপ্রকার শাস্তি আরোপ করা সম্ভব নয়।’ এক আনসারি সাহাবি তখন সেই নারীর দেখভালের দায়িত্ব নেয়। অবশেষে সে যখন সন্তান প্রসব করে, আনিসারি সাহাবি এসে রাসুলুল্লাহ সা.কে আবগত করে বলেন, ‘গামেদী নারী সন্তান প্রসব করেছে।’ রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘তবুও দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানকে অনাথ করে আমরা তার মাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে পারি না।’ এবার আরেক আনসারি সাহাবি দাঁড়িয়ে বলে, ‘বাচ্চার লালনপালন ও দুধপানের দায়িত্ব আমি নিলাম।’ তখন রাসুলুল্লাহ সা. সেই নারীর ব্যাপারে ‘রজমে’র ফয়সালা দেন। [সহিহ মুসলিম- ১৬৯৫]

সাহাবায়ে কেরামের যখনই যার কোনো সন্তান এই পৃথিবীতে আগমন করতো, ছেলে হোক বা মেয়ে- তারা সেই নবজাতককে কোলে নিয়ে তৎক্ষণাত প্রিয় রাসুলের কাছে উপস্থিত হতেন। রাসুলুল্লাহ সা. নবজাতককে কোলে নিয়ে আদর করতেন, তাহনকি করতেন, কল্যাণ ও বরকতের দোয়া করতেন। আসমা রা. বলেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর যখন আমার গর্ভে, প্রসবের সময়ও প্রায় ঘনিয়ে এসেছে, আমি তখন মদিনার উদ্দেশে বের হই। কুবায় এসে আমি অবস্থান গ্রহণ করি। সেখানেই আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের জন্ম হয়।

আব্দুল্লাহকে নিয়ে আমি তখন রাসুলুল্লাহ সা.এর কাছে আসি। ওকে রাসুলের কোলে তুলে দেই। প্রিয় রাসুল সা. তখন খেজুর আনান। খেজুর ভালো করে চিবিয়ে তার রস আব্দুল্লাহর মুখে দেন। আমার সন্তানের পেটে সর্বপ্রথম প্রিয় রাসুলের থুথু প্রবেশ করে। এরপর রাসুল সা. তার জন্য কল্যাণ ও বরকতের দোয়া করেন। ইসলামে সেই ছিলো প্রথম নবজাতক। [সহিহ বুখারি- ৩৬১৯]

আনাস রা. বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আবু তালহা জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে রাসুলের কাছে নিয়ে যাই। রাসুল সা. তখন আবা কাপড় পরে উটের পরিচর্যা করছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, ‘তোমার কাছে খেজুর আছে কি?’ আমি বললাম, ‘জি হাঁ।’ আমি তখন রাসুলের হাতে খেজুর দিলাম। রাসুল সা. সেগুলোকে প্রথমে মুখে নিয়ে চিবালেন। এরপর শিশুর মুখ খুলে তা ভেতরে দিলেন। শিশু আব্দুল্লাহ তখন মনের আনন্দে তা চাটতে থাকে। রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, ‘দেখো দেখো আনসারিদের খেজুরপ্রিয়তা!’ এরপর তিনি তার নাম রাখেন আব্দুল্লাহ। [সহিহ মুসলিম- ২১১৪]

ওাসুলুল্লাহ সা. শিশুদের সুন্দর সুন্দর নাম রাখতেন, ভালো নাম রাখার প্রতি বেশ গুরুত্বারোপ করতেন। কারো মন্দ নাম থাকলে তা পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রেখে দিতেন। সাহল ইবনে সা‘দ রা. বলেন, আবু উসাইদ রা.এর সন্তান জন্মলাভ কররে নবজাতককে রাসুলুল্লাহ সা.এর কাছে নিয়ে আসা হয়। রাসুলুল্লাহ সা. তাকে কোলে তুলে নেন। আবু উসাইদ রা. তখন রাসুলুল্লাহ সা.এর পাশেই বসা। হঠাৎ রাসুলুল্লাহ সা. সামনের অন্য একটা জিনিসের প্রতি গভীর মনোযো নিবদ্ধ করেন। তখন আবু উসাইদ রা.এর নির্দেশে নবজাতককে রাসুলুল্লাহ সা.এর কোল থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। কিছুক্ষণ পর রাসুলুল্লাহ সা. স্বাভাবিক হলে জিজ্ঞেস করেন, ‘বাচ্চা কোথায়?’ আবু উসাইদ রা. বলেন, ‘তাকে তো ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, হে আল্লাহর রাসুল।’ রাসুলুল্লাহ সা. জিজ্ঞেস করলেন, ‘তার নাম কী?’ আবু উসাইদ রা. তখন একটা নাম বলেন। রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘না। তার নাম হলো মুনযির।’ তখন থেকে সেই শিশুর নাম হয়ে যায় মুনযির।

[সহিহ বুখারি - ৬১৯১] নববি রহ . বলেন, এই সন্তানের নাম মুনযির রাখার কারণ হলো, তার এক চাচার নাম ছিরো মুনযির ইবনে ‘আমর। বিরে মা ‘উনার যুদ্ধে কাফিরদের হাতে তিনি নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। তিনি ছিলেন সেই মোবারক কাফেলার আমির। রাসুলুল্লাহ সা . বরকত হিসেবে ভাতিজার জন্যও এ নাম রেখে দেন : বড় হয়ে সেও যেনো তার চাচার মতো হয়। [শরহুন নববি ‘আলা সহিহ মুসলিম - ১৪/১২৮]

আবু মুসা রা . বলেন, আমার সন্তান হলে আমি তাকে প্রিয় রাসুলের কাছে নিয়ে যাই। রাসুল সা . তার নাম রাখেন ইবরাহিম। এরপর তাহনিক করেন এবং কল্যাণ ও বরকতের জন্য দোয়া করেন। সব শেষে তাকে আমার কোলে তুলে দেন। [সহিহ বুখারি - ৫৪৬৭]

রাসুলুল্লাহ সা . শিশুদেরকে অবলীলায় কোলে তুলে নিতেন। তারা দুষ্টুমি করলে কিছু বলতেন না। কোলে উঠে প্রস্রাব করে দিলেও কিছু মনে করতেন না। আয়েশা রা . বলেন, রাসুলুল্লাহ সা .এর কাছে প্রায়ই ছোট্ট সোনামনিদেরকে নিয়ে আসা হতো। রাসুলুল্লাহ সা . তাদের জন্য বরকতের দোয়া করতেন, তাহনিক করতেন। একবার এক শিশু রাসুলুল্লাহ সা .এর কোলে প্র ্রাব করে দেয়। রাসুলুল্লাহ সা . তখন পানি আনিয়ে কাপড়ের সেই অংশে গড়িয়ে দেন। পুরো কাপড় আর ধৌত করেননি। [সহিহ বুখারি - ৫৪৬৮]

রাসুলুল্লাহ সা . শিশুদের সামনে গম্ভীরতা প্রদর্শন করতেন না। তাদেরকে আদর তরে কাছে টেনে নিতেন , ঠাট্টা -রসিকতা করতেন। উম্মে খালিদ রা . বর্ণনা করেন , রাসুলুল্লাহ সা .এর কাছে একবার অনেকগুলো কাপড় হাদিয়া আসলো। এরমধ্যে একটি কাপড় ছিলো অত্যন্ত সুন্দর। চারদিকে নকশা করা। রাসুলুল্লাহ সা . উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘বলো তো, এই নকশী কাপড়টা আমি কাকে পরাবো?’ সবাই নীরবতা অবলম্বন করলো। রাসুলুল্লাহ সা . বললেন, ‘উম্মে খালিদকে আমার কাছে নিয়ে আসো।’ আমাকে আনা হলো। রাসুলুল্লাহ সা . নিজ হাতে আমাকে কাপড়টি

পরিয়ে দিলেন। এরপর কাপড়ের নকশা করা প্রান্তের দিকে তাকিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘উম্মে খালিদ, “ছানা”। উম্মে খালিদ, “ছানা”।’ (হাবাশার ভাষায় “ছানা” অর্থ- সুন্দর, চমৎকার, দারুণ, মনোরম। মদিনায় হিজরতের পূর্বে উম্মে খালিদ রা. পরিবারের সাথে হাবাশায় হিজরত করেছিলেন। তাই সেই ভাষার একটি শব্দ দিয়েই রাসুলুল্লাহ সা. তার সাথে রসিকতা করলেন।) এরপর রাসুলুল্লাহ সা. তার দীর্ঘজীবন লাভের জন্য দোয়া করলেন। বুখারি রহ. বলেন, তার মতো এতো দীর্ঘ জীবন আর কোনো নারী পায়নি। [সহিহ বুখারি- ৫৮৪৫; ফাতহুল বারি- ৬/১৮৪]

আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. উম্মে সালামা রা.এর মেয়ে যায়নাবকে দুষ্টুমি করে যুওয়াইনাব যুওয়াইনাব বলে ডাকতেন। [আলআহাদিসুল মুখতারা, মাকদিসি- ১৭১১]

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সা. গোসল করছিলেন। এমন সময় যয়িনাব রা. তাঁর কাছে আসলে তিনি তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেন। এর বরকতে একেবারে বুড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত তার চেহারায় যৌবনের ছাপ ছিলো জ¦লজ¦লে উজ্জ্বল। [হাশিয়াতুহু ‘আলা সুনানি আবি দাউদ-১/১২২]

একবার রাসুলুল্লাহ সা.এর সামনে এসে দাঁড়ায় এক বালক সাহাবি- মাহমুদ ইবনে রাবি‘। তার বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। রাসুলুল্লাহ সা. তখন বালতি থেকে পানি নিয়ে মাহমুদ ইবনে রাবি‘র মুখে ছিটা দেন। মাহমুদ ইবনে রাবি‘ রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা.এর সাথে আমার স্মৃতি হিসেবে এই একটা ঘটনার কথাই স্মরণ আছে। এরপর তিনি এই ঘটনা বর্ণনা করেন। [সহিহ বুখারি- ৭৭]

আনাস রা. বলেন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে প্রিয়নবি সা. অদ্বিতীয়, সবার চেয়ে উন্নত। আমার একটা ভাই ছিলো। তার ডাকনাম ছিলো আবু উমায়ের। তখন সদ্য দুধ ছেড়েছে সে। রাসুলুল্লাহ সা. যখনই আসতেন, তাকে লক্ষ্য করে ছন্দ মিলিয়ে বলতেন, ‘ওহে হে আবু উমায়ের, কী করলো তোমার নুগায়ের?’

(নুগায়ের - ছোট্ট পাখি , যা নিয়ে সে খেলা করতো। অকস্মাৎ পাখিটি মরে যায়।) [সহিহ বুখারি - ৬২০৩]

আনাস রা. বলেন, দুষ্টুমি করে রাসুলুল্লাহ সা. আমাকে ‘এই যে দু ’কানওয়ালা’ বলে ডাকতেন। [সুনানে আবু দাউদ - ৫০০২; সুনানে তিরমিযি - ১৯৯২]

রাসুলুল্লাহ সা. কখনো শিশুদের মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। একবার আব্বাস রা.এর তিন সন্তান আব্দুল্লাহ উবায়দুল্লাহ এবং কুসায়্যিরকে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে ঘোষণা দেন, ‘তোমাদের যে সবার আগে আমাকে এসে ছুঁতে পারবে তার জন্য থাকবে আকর্ষণীয় পুরস্কার।’ তারা সবাই দৌড়ে এসে রাসুলুল্লাহ সা.এর বুক-পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লুটোপুটি খায়। রাসুলুল্লাহ সা. তাদেরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খান। [মুসনাদে আহমদ - ১৮৩৯]

রাসুলুল্লাহ সা. শিশুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম দিতেন। শিশুদের মন তখন খুশিতে ভরে যেতো। তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠতো। তাদের ভেতরে জন্মাতো উদ্যম ও প্রেরণা। এর মাধ্যমে তারা এও শিখে নিতো- বড়দের সাথে কেমন হবে তাদের আচরণ। রাসুলুল্লাহ সা.এর প্রজ্ঞাপূর্ণ তারবিয়াতের অংশ ছিলো এই অমায়িক আচার। আনাস রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. একবার বাচ্চাদের কাছে এলেন। তারা তখন খেলছিলো। রাসুলুল্লাহ সা. তাদেরকে সালাম দিলেন। [সহিহ বুখারি - ৬২৪৭]

রাসুলুল্লাহ সা. শিশুদের মাথায় ¯œহের হাত বুলিয়ে দিতেন। গাল ছুঁয়ে তাদেরকে আদর করতেন। আনাস রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. আনসার সাহাবিদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বরে হতেন। যখন তাদের ঘরবাড়িতে পৌঁছতেন, ছোট ছোট শিশুরা জড়ো হয়ে রাসুলকে ঘিরে ফেলতো। রাসুলুল্লাহ সা. তখন তাদেরকে সালাম দিতেন, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে কল্যাণের দোয়া করতেন। [সুনানে কুবরা, নাসায়ি - ৮৩৪৯]

আব্দল্লাহ ইবনে হিশাম রা.কে নিয়ে তার মা যায়নাব বিনতে হুমায়দ রা. রাসুলুল্লাহ সা.এর কাছে এসে আরজ করে, ‘হে আল্লাহর রাসুল, আপনি ওকে বায়‘আত করুন।’ রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, ‘সে তো এখনও ছোট।’ এরপর তিনি আব্দল্লাহ ইবনে হিশাম রা.এর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন এবং তার জন্য কল্যাণের দোয়া করেন। [সহিহ বুখারি- ২৫০২]

জাবের আবনে সামুরা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা.এর সাথে আমি জোহরের নামাজ আদায় করলাম। নামাজ শেষে তিনি পরিজনের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হলে আমিও তার সাথে বের হলাম। এসময় অনেক শিশু তার কাছে এসে জড়ো হলো। তিনি তাদের প্রত্যেকের দু’গাল ছুঁয়ে আদর করলেন। আমাকেও দু’গাল ছুঁয়ে আদর করলেন। তখন আমি রাসুলুল্লাহ সা.এর পবিত্র দু’হাতের শীতলতা ও এক অপার্থিব সুঘ্রাণ অনুভব করি। বোধ হচ্ছিলো, কোনো আতরের শিশি থেকে সুঘ্রাণ বেরিয়ে পুরো প্রকৃতিকে বিমোহিত করে তুলেছে। [সহিহ মুসলিম- ২৩২৯]

রাসুলুল্লাহ সা. আদর করে, ভালোবেসে শিশুদেরকে চুমু খেতেন। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. আপন নাতি হাসান রা.কে চুমু খেলেন। সেখানে ‘আকরা ইবনে হাবিস নামক এক সাহাবি উপস্থিত ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সা. হাসান রা.কে চুমু খাচ্ছেন দেখে তিনি বলে ফেললেন, ‘আমার দশ-দশটি সন্তান। অথচ আমি ওদের কাউকেই চুমু খাই না।’ নবিজি সা. তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘যে দয়া করে না, সে দয়াপ্রাপ্ত হবে না।’ [সহিহ বুখারি- ৫৬৫১; সহিহ মুসলিম- ৬৫]

আয়েশা রা. বলেন, একদল গ্রাম্যলোক রাসুলুল্লাহ সা.এর কাছে আসলো। একপর্যায়ে তারা জিজ্ঞেস করলো, ‘আপনারা কি আপনাদের সন্তানদেরকে চুমু খান?’ মদিনার সাহাবিরা বললেন, ‘হাঁ।’ তারা বললো, ‘আমরা কিন্তু
– আল্লাহর কসম করে বলছি- আমাদের সন্তানদেরকে চুমু খাই না’। তখন রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, ‘আল্লাহ তোমাদের থেকে রহমত ছিনিয়ে নিলে আমার আর কী করার আছে!’ [সহিহ বুখারি- ৫৯৯৮]

আবু হুরায়রা রা. বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সা.এর কাছে উপস্থিত হলো। তার সাথে একটি শিশুও ছিলো। নবিজি সা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি এই শিশুটির ওপর রহম করো?’ সে বললো, ‘জি হাঁ।’ তখন রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, ‘তবে শুনে রাখো, এই শিশুটির ওপর তুমি যতোটুকু রহম করবে, আ?ল্লাহ তা‘আলা তারচে অনেক বেশি রহম তোমার ওপর করবেন। তিনি দয়ালুদের মধ্যে সবচে বড় দয়ালু।’ [আলআদাবুল মুফরাদ-৩৭৭]

রাসুলুল্লাহ সা. শিশুদেরকে অনেক উপহার দিতেন। উপহার তো যেকোনো মানুষের হৃদয়েই আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসার সঞ্চার করে। শিশুদের ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়ে সবচে বেশি। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সা.এর কাছে বছরের প্রথম ফল আনা হতো। তিনি তখন এই বলে দোয়া করতেন, ‘হে আল্লাহ, আপনি বরকত দান করুন আমাদের মদিনায়, আমাদের ফলফলাদিতে, আমাদের প্রতিটি “মুদ” এবং “ছা”তে।’ এরপর তিনি সেসব ফল উপস্থিত শিশুদের মধ্যে সবচে ছোট য,ে তাকে উপহার দিতেন। [সহিহ মুসলিম- ১৩৭৩]

প্রিয়নবির অমায়িক আচার ও বাৎসল্যের প্রভাবে তিনি স্থান করে নিয়েছিলেন শিশুদের হৃদয়-সিংহাসনে। হয়ে উঠেছিলেন তাদের পরমপ্রিয়, সবচে আপন। শিশুরা এসেই প্রিয়নবির কোলে চড়ে বসতো, কখনোবা পিঠে উঠে তাঁকে ঘোড়া বানিয়ে মনের আনন্দে খেলা করতো। রাসুলুল্লাহ সা.ও শিশুদেরকে নিয়ে মেতে উঠতেন, তাদেরকে মনপ্রাণ খুলে ভালোবাসতেন, কাছে টেনে নিতেন, চুমু খেতেন। পাশাপাশি শিশুদের তালিম-তারবিয়াতের প্রতিও ছিলো তার সদা সতর্ক দৃষ্টি। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, একদিা আমি রাসুলুল্লাহ সা.এর পেছনে বসা ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সা. তখন আমাকে বললেন, ‘শোনো বালক, আমি তোমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তালিম দিচ্ছি। তুমি আল্লাহর হেফাজত করো, আল্লাহ তোমার হেফাজত করবেন। তুমি আল্লাহর হেফাজত করো, সর্বদা তাকে সামনে পাবে। সুখের সময়ে তুমি আল্লাহকে স্মরণ করবে, তোমার দুঃখের সময়ে তিনিও

তোমাকে স্মরণ করবেন। যখন কিছু চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবে। আর জেনে রেখো, গোটা উম্মত যদি তোমার কোনো উপকার করার জন্য একত্রিত হয়, আল্লাহ তোমার তাকদিরে যা লিখে রেখেছেন- এর বাইরে তারা তোমার কোনো উপকারই করতে পারবে না। যদি তারা সবাই মিলে তোমার কোনো অনিষ্ট সাধনে প্রয়াসী হয়, আল্লাহ তোমার ভাগ্যলিপিতে যে অনিষ্টের কথা লিখে রেখেছেন- তার বাইরে তারা তোমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। ভাগ্যলিপি রচনার কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। কালিও শুকিয়ে গেছে। মনে রেখো, আপদে ধৈর্যধারণের মধ্যে লুকায়িত আছে অসংখ্য কল্যাণ। সবরের সাথে রয়েছে প্রভুর নুসরত। দুর্যোগের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখের সাথে সুখ জড়িত ওতপ্রোতভাবে। [মুসনাদে আহমদ- ২৮০০]

রাসুলুল্লাহ সা. শিশুদেরকে ইমান, কোরআন এবং তাওহিদের শিক্ষা দিতেন। আগামী দিনের যোগ্য কান্ডারীরূপে তাদেরকে গড়ে তুলতে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। ছোট্ট সাহাবি জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, আমরা উঠতি বয়সের কয়েকজন কিশোর রাসুলুল্লাহ সা.এর কাছে থাকতাম। আমরা কোরআন শেখার আগে ইমান শিখেছি। এরপর কোরআন শিখেছি। যার ফলে আমাদের ইমান হয়েছে সুদৃঢ়। [সুনানে বিনে মাজাহ-৬১]

রাসুলুল্লাহ সা. শিশুদেরকে উত্তম চাল-চলন, সুন্দর আচার-ব্যবহারের শিক্ষা দিতেন। আনাস রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. আমাকে বলেছেন, বালক, যখন পরিজনের কাছে যাবে এবং ঘরে ঢুকবে তখন অবশ্যই সালাম দিবে। তা তোমার জন্য এবং ঘরের মানুষদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। [সুনানে তিরমিযি- ২৬৯৮]

এমনতি প্রিয়নবি সা. শিশুদের সাতে অনায়াসে খাবার খেতেন। তারা খেতে বসে দুষ্টুমি করলে, তাদের থেকে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে নমনীয়তার সাথে সেগুলো শুধরে দিতেন, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতেন,

পানাহারের আদবও শিখিয়ে দিতেন। উমর ইবনে আবু সালামা রা. বলেন, আমি ছিলাম এক ছোট্ট বালক। রাসুলুল্লাহ সা.এর ঘরেই আমি লালিত-পালিত হয়েছি। আমার অভ্যেস ছিলো, খেতে বসলে পাত্রের চারদিকে আমার হাত ছুটোছুটি করতো। রাসুলুল্লাহ সা. আমাকে বলেন, শোনো বাবা, খেতে বসে প্রথমে বিসমিল্লাহ বলবে। ডান হাতে খাবে। নিজের সামনে থেকে খাবে। উমর ইবনে আবু সালামা রা. বলেন, এরপর থেকে সারাজীবন আমি সেভাবেই খেয়েছি। [সহিহ বুখারি- ৫৩৭৬]

শিশুরা যে অন্যায়ই করুক, যেমন অপরাধই করুক প্রিয়নবি সা. তাদেরকে বকাঝকা মারধর করতেন না, কোমলভাবে বোঝাতেন, স্নেহের সাথে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে দিতেন। শাসন-তারবিয়াতের ক্ষেত্রেও বয়সের তারতম্য তিনি গভীরভাবে খেয়াল রাখতেন। আবু রাফে রা. বলেন, আমি ছিলামাকে দুষ্টু বালক। আনসার সাহাবিদের খেজুর বাগানে শুধু ঢিল ছুঁড়তাম। একবার তারা আমাকে ধরে রাসুলুল্লাহ সা.এর কাছে নিয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ সা. আমাকে বলেন, এই ছেলে, খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়ো কেনো? আমি বললাম, ক্ষুধার তাড়নায়, হে আল্লাহর রাসুল! তিনি বললেন, এখন থেকে আর ঢিল ছুড়বে না। হাঁ, যে খেজুরগুলো নিচে পড়ে থাকে, সেগুলো খেতে পারো। এরপর রাসুলুল্লাহ সা. তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেন। এবং এই দোয়া করেন, আল্লাহ তোমাকে পরিতৃপ্ত করুন। [সুনানে তিরমিযি- ১২৮৮]

আনাস রা. ছোট ছিলেন। দশ-দশটি বছর তিনি রাসুলুল্লাহ সা.এ খেদমত করেছেন; কিস্তু এই সুদীর্ঘ সময়ে একটিবারের জন্যও রাসুলুল্লাহ সা. তাকে মারেননি, বকা দেননি, কটু কথা বলেননি। বলেননি কখনো, ‘এটা কেনো করলে’ কিবা ‘ওই কাজটি কেনো করলে না’।

রাসুলুল্লাহ সা. শিশুদের সাথে কথা বলার সময়ে তাদেরকে সুন্দর সুন্দর শব্দে সম্বোধন করতেন। আমাদের মতো কখনো অসুন্দর ও শ্রুতিকটু কোনো শব্দে শিশুদেরকে ডাকতেন না, সম্বোধন করতেন না।

ওপরে বর্ণিত বিভিন্ন হাদিসে পাঠক বিষয়টি খেয়াল করেছেন। শিশুদের কারো সুন্দর ডাকনাম-উপনাম থাকলে সেসব বলেও কখনো তাদেরকে সম্বোধন করতেন।

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। তাই রাসুলুল্লাহ সা. শৈশব থেকেই শিশুদেরকে ভবিষ্যতের কা-ারীরূপে দায়িত্বসচেতন করে গড়ে তুলতেন। আনাস রা. বলেন, একবার আমি বাচ্চাদের সাথে খেলছিলাম। এমন সময় রাসুলুল্লাহ সা. এসে আমাদের সবাইকে সালাম দিলেন। এরপর আমাকে একটা কাজে পাঠালেন। যার কারণে ঘরে ফিরতে কিছুটা দেরি হয়ে যায়। যখন ফিরি মা জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার! কোনো কাজে আটকে গিয়েছিলে? আমি বললাম, রাসুলুল্লাহ সা. আমাকে একটা কাজে পাঠিয়েছিলেন। মা বললেন, কী কাজে? আমি বললাম, একটা গোপন বিষয়। (তাই তিনি আর মা’কে পর্যন্তও তা অবগত করেননি। [সহিহ বুখারি-৬২৮৯; সহিহ মুসলিম- ২৪৮২]

এবার আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করবো। প্রিয়নবি সা. শিশুদের ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করতেন। কখনো তাদেরকে অবজ্ঞা করতেন না। শিশুদের মানসজীবন গঠনে এর অবদান অপরিসীম। এর মাধ্যমেতাদের আত্মবিশ^াস সুদৃঢ় হয়, ভেতরে সৃষ্টি হয় আত্মমর্যাদাবোধ। এর সুফলে তাদের মানসজবিন হয়ে ওঠে ঋদ্ধ, দৃষ্টিভঙ্গি হয় উদার। বড়দের জন্য তাদের ছোট্ট কোমল হৃদয়ে জাগে শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা। অপরদিকে শিশুদের ব্যক্তিসত্তার তাচ্ছিল্য-অবমূল্যায়ন তাদের ভেতরে সৃষ্টি করে তুচ্ছ মনোভাব ও হীনতা, দ্বেষ ও ঘৃণা, হিংসা ও অস্থিরতা। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধটুকুও তখন তারা হারিয়ে ফেলে। একপর্যায়ে নিজেরা হারিয়ে যায় আঁধারজগতে, প্রয়াসী হয় গোটা সমাজ ও দেশকে তমসায় ছেয়ে ফেলতে। প্রিয়নবি সা.এর মহান ও সুউচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিস্ততায় এ অনন্য গুণ ও বৈশিষ্ট্যটি ছিলো পরিপূর্ণরূপে। সাহল ইবনে সাদ রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা এর কাছে একবার পানীয় আনা হলো। তিনি নিজে তা থেকে পান করলেন। তখন তার ডাব

পাশে ছিলো একটা বালক আর বাম পাশে ছিলো কয়েকজন প্রবীণ সাহাবি। রাসুলুল্লাহ সা. বালককে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি অনুমতি দিলে আগে মুরুব্বিদেরকে দিয়ে শুরু করি। বালক উত্তর দিলো, না, আল্লাহর কসম, আমার ভাগের ক্ষেত্রে আমি কাউকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দেবো না। রাসুলুল্লাহ সা. তখন পাত্রটি তার হাতেই দিলেন। [সহিহ বুখারি- ২৪৫১]

রাসুলুল্লাহ সা শিশুদের সাথে সর্বদা সত্য কথা বলা ও কখনো তাদের সাথে মিথ্যে না বলার ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমের রা বলেন, রাসুলুল্লাহ সা আমাদের ঘরে উপবিষ্ট। এমন সময় মা আমাকে ডাক দিয়ে বলেন, এই, এদিকে এসো। তোমাকে একটা জিনিস দেবো। রাসুলুল্লাহ সা. তখন মাকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি ওকে কী দিতে চাচ্ছো? মা বললেন, ওকে খেজুর দেবো। রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, যদি তুমি ওকে কিছু না দিতে তবে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যে কথার গুনাহ লেখা হতো। [সুনানে আবু দাউদ- ৪৯৯১]

শিশুদের সাথে মিথ্যে কথা বললে তারা স্বাভাবিকভাবেই বাবা-মার ওপর থেকে নির্ভরতা হারিয়ে ফেলে। এভাবে একপর্যায়ে বাবা-মাসহ অন্যান্যদের কথায় সে আর তেমন কর্ণপাত করে না। তাছাড়া শিশুরা যেহেতু বড়দেরকে অনুকরণ করেই বেড়ে ওঠে, তাই তারাও ধীরে ধীরে মিথ্যে বলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এজন্য বড়দের আবশ্যিক কর্তব্য, শিশুদের সাথে সর্বদা সত্য কথা বলা, মিথ্যের পঁচা বীজ তাদের উর্বর হৃদয়ক্ষেত্রে বপন না করা। ঘুম পাড়ানো, গল্প বলা, হাসি-ঠাট্টাসহ সবক্ষেত্রে শিশুদের সাথে উচিত সর্বদা সত্য কথা বলা।

শিশুদের সাথে প্রিয়নবির অমায়িক আচার-ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত চিত্র আমরা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। নবিজীবনের মহান আদর্শের আলোকে আমরাও গড়ে তুলতে প্রয়াসী হই আমাদের জীবন। এই পুষ্পসদৃশ মানবকলিদের যেভাবে যত্ন নিয়েছেন, পরিচর্যা করেছেন মহান রাসুল সা.,

আমরাও যদি সেভাবে তাদের যত্ন নিতে পারি, পরিচর্যা করতে পারি তবেই গড়ে উঠবে আলোকিত সমাজ, দীপ্ত হবে জীবন, ছড়িয়ে যাবে সর্বত্র প্রশান্তির স্নিগ্ধ সমীরণ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে প্রিয়নবির জীবনাচারকে আমাদের জীবনপথের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকারূপে গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আলী হাসান উসামা (*Hasan Faiyaz*)

মংলীপার , সিলেট

শিরক (অনূদিত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়)

ALI HASAN OSAMA·THURSDAY, FEBRUARY 9, 2017

ঈমান বিনষ্টকারী প্রথম বিষয়

শায়খ রহ. বলেন, ঈমান বিনষ্টকারী প্রথম বিষয় হলো, আল্লাহ তা ‘আলার ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক করা। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.

“নিঃসন্দেহে আল্লাহ তার সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যানা গুনাহ যাকে ইচ্ছে করেন ক্ষমা করবেন।” (সুরা নিসা - ৪৮)।

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ..

“নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শিরক করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন। তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।” (সুরা মায়িদা- ৭২)।

এর অন্তর্ভুক্ত আরেকটি বিষয় হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু জবাই করা। যেমন- জিনের নামে, মাজারের নামে পশু জবাই করা।

শায়খ রহ. ঈমান বিনষ্টকারী দশটি জিনিসের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা‘আলার সাথে শিরকের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কেননা আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্যতার মধ্যে শিরকের অবস্থান সবার ওপরে। তা রুবুবিয়্যাতের প্রতি খোলা বিদ্রোহ, উলুহিয়্যাতের চরম লঙ্ঘন। শিরকের সংজ্ঞা- “আল্লাহ তা‘আলার সাথে বিশেষিত কোনো বিষয়ে অন্য কাউকে তার সমকক্ষ স্থির করা।”

আর কেনোই বা তা আল্লাহর সবচে বড় নাফরমানি হিসেবে গণ্য হবে না, অথচ বান্দা ইবাদতের ক্ষেত্রে শরিক সাব্যস্ত করেছে আল্লাহর জন্য, যিনি তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, অগণিত নেয়ামত দ্বারা তাকে পরিপুষ্ট করেছেন।

শিরক তিন প্রকার-

১. শিরকে আকবার

২. শিরকে আসগার

৩. গোপন শিরক

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ.এর অভিমত হলো, শিরক দু’প্রকার-

১. শিরকে আকবার

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ.

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ . إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا.

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

“যারা পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা চায়, আমি তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ ফল এ দুনিয়াতেই ভোগ করতে দেবো এবং এখানে তাদের প্রাপ্য মোটেও কম দেয়া হবে না। এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নেই এবং যা-কিছু তারা করেছিলো আখিরাতে তা নিষ্ফল হয়ে যাবে আর তাদের কৃত আমল সব বাতিল বলে পরিগণিত হবে।” (সুরা হুদ - ১৫-১৬)

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, “শিরকুন নিয়্যাত ওয়াল ইরাদাহ এক কূলহীন সমুদ্র। খুব কম মানুষই এর থেকে বাঁচতে পারে। যে ব্যক্তি তার আমলের দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ নৈকট্য অর্জন ছাড়া অন্য কোনো নিয়ত করে, গাইরুল্লাহর কাছে বিনিময় প্রত্যাশা করে সে তার নিয়্যাত এবং ইরাদায় শিরক করেছে।”

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. শিরকুন নিয়্যাতকে শিরকে আকবার হিসেবে গণ্য করেছেন। এর প্রয়োগক্ষেত্র সেই ব্যক্তি, যার সকল আমল গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে। আর যার আমলে কখনোসখনো গাইরুল্লাহর নিয়্যাতের অনুপ্রবেশ ঘটে তার কাজটা হলো শিরকে আসগার। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা সামনে আসছে।

৩. শিরকুত তা‘আত

শিরকুত তা‘আত হলো, আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে ধর্মগুরু ও ধর্মযাজকদের আনুগত্য করা। আল্লাহ □□□□-

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

“[illegible]” ([illegible])।

‘[illegible]. [illegible], عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ "اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ"، قَالَ: " أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ ".

‘[illegible]. [illegible], “[illegible].[illegible], اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ.

“[illegible]”([illegible]-[illegible])। [illegible], “[illegible], [illegible]” ([illegible]- [illegible])। [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]. [illegible]- [illegible]।

[illegible]. [illegible], “[illegible], [illegible],

(যেহতু এরা আল্লাহ তা‘আলার হারামকৃত বিষয়কে হালাল মনে করা এবং তাঁর হালালকৃত বিষয়কে হারাম মনে করার ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করেছে।) তারা দু’ধরনের-

প্রথমত: যারা জানে যে, এসব ধর্মগুরু আল্লাহর দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে। আর এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই তারা তাদের অনুসরণ করে। ফলে ধর্মীয় নেতাদের অনুসরণে তারাও আল্লাহ তা‘আলার হারামকৃত বিষয়কে হালাল মনে করে, তেমনি তাঁর হালালকৃত বিষয়কে হারাম মনে করে। অথচ তারা জানে যে, তারা রাসুলুলাহ সা.এর দ্বীনের বিরুদ্ধাচারণ করছে। এটা হলো কুফর। আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল এটাকে শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন, যদিও তারা এসব নেতাদের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে না, তাদেরকে সিজদা করে না। সুতরাং যে ব্যক্তি দ্বীনের বিরুদ্ধাচারণের ক্ষেত্রে বিষয়টি জেনেবুঝে কারো অনুসরণ করবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা বলেছেন এর পরিবর্তে অন্য কারো কথার প্রতি বিশ^াস স্থাপন করবে সেও এদের মতো মুশরিক হিসেবে পরিগণিত হবে।

দ্বিতীয়ত: হারামকে হারাম মনে করা ও হালালকে হালাল মনে করার ক্ষেত্রে যাদের ঈমান ও বিশ^াস ঠিক আছে। তবে আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে এরা ধর্মীয় নেতাদের অনুসরণ করে। তাদের দৃষ্টান্ত এমন মুসলমানের মতো, যে মুসলমান গুনাহকে গুনাহ মনে করে তাতে লিপ্ত হয়। তাই এদের বিধান অন্যান্য গুনাহগারদের মতোই। (মাজমু‘উল ফাতাওয়া- ৭/৭০)।

৪. শিরকুল মাহাব্বাহ

এর দলিল হলো-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

“[illegible]”([illegible]- [illegible])[illegible]

[illegible]-

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

“[illegible]”([illegible]- [illegible])[illegible]

[illegible]. [illegible], “[illegible]

[illegible]. [illegible]

[illegible]. [illegible]

ধারণ করবে, এর ব্যাপারে যার কঠোরতা যতো বেশি হবে সে আল্লাহ তা‘আলার ততো বেশি প্রিয় হবে।

৩. আল্লাহর জন্য মহব্বত করা, শুধু তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালোবাসা। এটা আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়কে ভালোবাসার অপরিহার্য দাবি। যতোক্ষণ মানবীয় ভালোবাসা আল্লাহর জন্য ও তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না হবে ততোক্ষণ আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা পূর্ণতা লাভ করবে না।

৪. আল্লাহর সাথে অন্য কিছুর মহব্বত। এ হলো শিরকি মহব্বত। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে মহব্বত করবে - আল্লাহর জন্য নয়, তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেও নয়, তাঁর রাহেও নয় তবে সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে ওই বস্তুকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে। এটাই মুশরিকদের মহব্বত।

শিরকে আকবারের এই চারও প্রকার মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। কেননা উপরিউক্ত বিষয়গুলো হলো ইবাদত। আর ইবাদত গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে করাটাই শিরক। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকে, যে সম্পর্কে তার কাছে কোনো রকম দলিল-প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার প্রতিপালকের কাছে। নিশ্চয়ই কাফিরেরা সফলকাম হবে না।”(সুরা মুমিনুন - ১১৭)। এ আয়াতে আল্লাহ তাদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন, যেহতুে তারা তাঁর সাথে অন্য কাউকেও ডাকে।

শিরকে আকবারের অন্তর্ভূক্ত আরো কয়েকটি বিষয়

[illegible]

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

[illegible]

إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ

[illegible]

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ

[illegible]

তাই যে-কেউ কোনো চর্বি-গোশতধারী (গাইরুল্লাহ)র নামে মানত করলো, সে তো গলা থেকে ইসলামের বন্ধন খুলে ফেললো। কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করার কোনো বৈধতা নেই। গাইরুল্লাহর নামে মানত করা রাসুলুলাহ সা.এর আনীত দ্বীনের সম্পূর্ণ বিরোধী কাজ। বিভিন্ন দেশের কবরপূজারীরা তাদের (পীর) বাবাদের নামে যে নযর-নিয়ায মানে, যাদের ব্যাপারে তারা এ বিশ^াস রাখে যে, তারা আমাদের উপকার করতে পারে, ক্ষতিও করতে পারে- তাদের এই কাজ শিরকে আকবার, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। যারা একে শিরকে আসগার বলে আখ্যায়িত করেছেন, তারা এক্ষেত্রে বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন। আর তারা এমন পথ ধরেছেন, যে ব্যাপারে তাদের যথাযথ জ্ঞান নেই। আল্লাহর কাছে সাহায্যপ্রার্থনা। তাঁরই ওপর ভরসা। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া ভ্রান্তি থেকে বাঁচার ও ভালো কিছু করার শক্তি ও সক্ষমতা কারো নেই।

আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা। এগুলোও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে করাটা শিরক।

২. শিরকে আসগার

বান্দা যদি এই প্রকারের শিরক নিয়ে মহামহিম আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়, তাহলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সে তাঁর ইচ্ছাধীন থাকবে- যদি চান, ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আর যদি চান আযাব দিবেন। অবশ্য সাময়িকভাবে আযাবপ্রাপ্ত হলেও চূড়ান্ত পরিণতিতে জান্নাতেই তার ঠাঁই মিলবে। কেননা শিরকে আসগার ব্যক্তিকে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের উপযুক্ত করে না। তবে এর ব্যাপাওে যেহেতু হুঁশিয়ারি রয়েছে, তাই তা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

কয়েকটি শিরকে আসগারের বিবরণ

গাইরুল্লাহর নামে কসম করা যদি এর দ্বারা কসমকৃত বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন উদ্দেশ্য না হয়। অন্যথায় তা শিরকে আকবার বলে গণ্য হবে। নবীজী সা. বলেছেন, যে গাইরুল্লাহর নামে কসম করে সে কুফুরি করলো, (বর্ণনাকারী বলেন,) কিবা বলেছেন, শিরক করলো। ইবনে উমর রা.এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম হাকিম। ইমাম হাকিম হাদিসটির ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, বুখারি-মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদিসটি সহিহ। ইমাম যাহাবীও হাকিমের বক্তব্যের ওপর কোনো আপত্তি করেননি।

সাধারণ লৌকিকতা ও মাখলুকের জন্য কোনো আমল করা। নবীজী সা. বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ওপর সবচে যে জিনিসটাকে ভয় করি তা হলো, শিরকে আসগার। শিরকে আসগার কী এ স¤পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন,ন্তা হচ্ছে রিয়া। হাদিসটি মাহমুদ ইবনে লাবিদ রা. থেকে ইমাম আহমাদ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। এর সনদ হাসান।

শিরকে আসগার যখন ভয়ের বিষয় প্রমাণিত হয়েছে স্বয়ং সাহাবিদের ক্ষেত্রে, যারা নবীজীর সাহচর্যে ছিলেন এবং ওহি অবতীর্ণ হওয়ার যামানা লাভ করেছেন তখন অন্যরা, যাদের জ্ঞান স্বল্প এবং ঈমানও দুর্বল তাদের ব্যাপারে এ ভয় তো আরো প্রবল।

কোনো মুসলমান শিরক থেকে বাঁচতে পারবে না দুটো বিষয় ছাড়া- আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদত ও রাসুলুল্লাহ সা.এর একান্ত অনুসরণ।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. সূর্য চাঁদ আগুন ও অন্যান্য জিনিসের পূজারীদের শিরকের বর্ণনা দেয়ার পরে বলেন, ইবাদতের শিরক এসবের থেকে অনেক সহজ ও লঘু। কেননা এ শিরক প্রকাশ পায় এমন ব্যক্তির থেকে যে বিশ্বাস করে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ ছাড়া কেউ উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না, কেউ কিছু দিতে পারে না, আল্লাহর দানকেও ঠেকাতে পারে না। তিনি ছাড়া না আছে কোনো ইলাহ আর না

[illegible]

[illegible]

"الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة". قالوا: كيف ننجو منه يا رسول الله؟!

قال: "قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم"

[illegible]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أَعْلَمُ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدا

আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার কাছে এ মর্মে ওহি অবতীর্ণ হয় যে , তোমাদের ইলাহ অদ্বিতীয় ইলাহ। তাই যে তার রবের সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করে সে যেনো নেক আমল করে এবং আপন প্রভুর ইবাদতে কাউকে শরিক না করে। (সুরা কাহাফ - ১১০)

অর্থাৎ আল্লাহ যেমন এক ইলাহ , তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই তেমনি ইবাদতও এক আল্লাহর জন্যই হওয়া উচিত। ইলাহ হিসেবে যেমন তিনি এক ও অদ্বিতীয় , ইবাদতের ক্ষেত্রেও হওয়া উচিত তিনিই একমাত্র উপাস্য। সুতরাং নেক আমল হিসেবে শুধু তাই গণ্য হবে , যা হবে রিয়ামুক্ত এবং সুন্নাহর আলোকে স ¤পাদিত।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা .এর দোয়া ছিলো-

اللهم اجعل عملي كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً

হে আল্লাহ , আমার সব আমলকে নেক বানিয়ে দিন। এবং তাকে শুধুই আপনার সন্তুষ্টির জন্য স ¤পাদিত গণ্য করুন। আর অন্য কারো জন্য এতে কোনো অংশ রাখবেন না। (ইমাম আহমদ বিন হাম্বল প্রণীত আযযুহদ)

এই যে ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক , এটা আমলের সাওয়াব বিনষ্ট করে দেয়। আমলটি যদি ওয়াজিব পর্যায়ের হয় , তাহলে সেজন্য সে শাস্তিপ্রাপ্তও হবে। কেননা তাকে আমলটি করেনি এমন ব্যক্তিদের মধ্যেই গণ্য করা হবে। তখন আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করার অপরাধে সে শাস্তিযোগ্য হবে। কেননা মহান আল্লাহ তাঁর জন্য একনিষ্ঠ ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন -

وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

তাদেরকে কেবল এই আদেশই করা হয়েছিলো যে , তারা আল্লাহর ইবাদত করবে আনুগত্য একনিষ্ঠভাবে তারই জন্য খালিস রেখে। (সুরা বায়্যিনাহ - ৫)

এখন সে যেহেতু আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করেনি, তাই সে আদেশও মান্য করেনি। বরং আদেশ করা হয়নি এমন কিছু সে স¤পন্ন করেছে। এজন্য তা বিশুদ্ধ হবে না, কবুলও হবে না।

আল্লাহ -

أنا أغنى الشركاء فمن عمل عملاً أشرك معي فيه غيري، فهو للذي أشرك، وأنا منه بريء

আমি অংশীদারিত্ব থেকে স¤পূর্ণ মুক্ত। যে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করে কোনো আমল করে, তার আমল সেই শরিকের জন্যই গণ্য হবে। আর আমি এর থেকে পবিত্র। (সহিহ মুসলিম ; সুনানে ইবনে মাজাহ)

এই শিরক আবার দুভাগে বিভক্ত। যা ক্ষমা করা হবে এবং যা ক্ষমাহীন থেকে যাবে। আল্লামা ইবনুল কায়্যিমের বক্তব্য এখানেই শেষ।

গাইরুল্লাহর জন্য কৃত আমলের কয়েকটি অবস্থা -

প্রথম অবস্থা : তা শুধুই লোক দেখানোর জন্য করা হয়েছে। আমলকারীর লক্ষ্য শুধুই দুনিয়া বা মাখলুকের দৃষ্টি আকর্ষণ। যেমন মুনাফিকদের অবস্থা, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ -

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلاقَلِيلاً

যখন তারা নামাজে দাঁড়ায় তখন খুব অলস ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায়। আদতে তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। (সুরা নিসা - ১৪২)

কোনো মুসলমানের এ ব্যাপারে সন্দেহ করার কথা নয় যে, এমন আমল বিনষ্ট হবে এবং আমলকারী মহামহিম আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা : আমল আল্লাহর জন্যই ছিলো। সাথে শিরকেরও কিছুটা অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এর আবার দুই অবস্থা -

ক. গোড়া থেকেই তার সাথে লৌকিকতা ছিলো।

খ. পরবর্তীতে লৌকিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

প্রথম প্রকার আমলও বিনষ্ট হয়ে যাবে, গ্রহণযোগ্য হবে না। এর স্বপক্ষে দলিল হচ্ছে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে কুদসি, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহ তাআলা □□□□-

أنا أغنى الشركاء فمن عمل عملاً أشرك معي فيه غيري، فهو للذي أشرك، وأنا منه بريء

আমি অংশীদারিত্ব থেকে স ¤পূর্ণ মুক্ত। যে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করে কোনো আমল করে, তার আমল সেই শরিকের জন্যই গণ্য হবে। আর আমি এর থেকে পবিত্র। (সহিহ মুসলিম ; সুনানে ইবনে মাজাহ)

আর যদি তাতে পরবর্তীতে রিয়া ঢুকে পড়ে এবং পুরো আমলে তা অব্যাহত থাকে, তবে কোনো কোনো আলিম এই ইবাদতও বিনষ্ট হয়ে যাবে বলে মনে করেন। আর কারো কারো বক্তব্য হলো, এমতাবস্থায় সে ইখলাছের সাওয়াবও পাবে, সাথে রিয়ার গুনাহও তার আমলনামায় যুক্ত হবে। আর সে যদি মুজাহাদা করে এই রিয়াকে প্রতিরোধ করতে পারে তবে আল্লাহ তাআলার এই ঘোষণার মধ্যে সেও শামিল হবে -

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে এবং নিজেকে মন্দ চাহিদা থেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা। (সুরা নাযিআত- ৪০/৪১)

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি- যে ব্যক্তি গনীমত লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, তার এই আমলের পরিণামের ব্যাপারে আলিমগণের মতভিন্নতা আছে।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন গ্রন্থে পূর্বে বর্ণিত আলোচনার পরে বলেন, ‘‘এর দৃষ্টান্ত তো ঐ ব্যক্তি যে প্রতিদানের বিনিময়ে সালাত আদায় করে। যদি সে কোনো বিনিময় গ্রহণ না করলেও সালাত আদায় করে, কিন্তু সালাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রতিদান দুটোই উদ্দেশ্য থাকে, তেমনি ওই ব্যক্তি যে হজ করে তার যিম্মার ফরজ আদায়ের জন্য, পাশাপাশি তাকে হাজি বলা হবে এও উদ্দেশ্য থাকে, অথবা এ ধরনের নিয়তে যাকাত আদায় করে তবে এমন ব্যক্তিদের আমল কবুল হবে না।’’

ইবনে রজব রহ. বলেন, “এর দ্বারা তার জিহাদের সাওয়াব কমে যাবে; কিন্তু পুরো আমলটাই একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে না।’’

ইবনে রজব রহ. আরো বলেন, ‘‘আমরা পূর্বে একাধিক হাদিস বর্ণনা করে এসেছি, যা থেকে প্রতীয়মান হয়, যে ব্যক্তি দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে জিহাদ করবে সে কোনও প্রতিদানপ্রাপ্ত হবে না। বস্তুত সেসব হাদিস এমন ব্যক্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য, জিহাদ দ্বারা যার উদ্দেশ্য শুধুই দুনিয়া অর্জন।’’ (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম- ১৫)

সুতরাং এর আলোকে যে সুনাম অর্জন ও সাওয়াব লাভের জন্য জিহাদ করে এবং যে গনীমত লাভ ও প্রতিদান প্রাপ্তির জন্য জিহাদ করে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অনুমিত হয়।

প্রথমটির ব্যাপারে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নাসায়ী হাসান সূত্রে আবু উমামা রা.থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন-

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لَا شَيْءَ لَهُ "، فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : لَاشَيْءَ لَهُ " ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ "

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ALI HASAN OSAMA·THURSDAY, FEBRUARY 16, 2017

[illegible]

[illegible]

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (□□□)

□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□, □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ [□□□□□ □□□□□□□□□- □□□□]

□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□-

□. □□□□□ □□□□□□□□□- □□□□

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (□□□)

□. □□□□□ □□□□□□□□□- □□□□

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (□□□)

□. □□□□□ □□□□□□□□□- □□□□

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (□□□)

□. □□□□□ □□□□□□□□□- □□□

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (□□□)

□. □□□□□ □□□□□□□□□- □□□

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (□□□)

□. □□□□□ □□□□ □□□□□□-

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (□□)

□. □□□□□ □□□□ □□□□□□- □□

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (□□)

□. □□□□□ □□□□ □□□□□□- □□□

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (□□□)

□. □□□□□ □□□□□- □□

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (□□)

□□. □□□□□ □□□□□- □□□

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (□□□)

□□. □□□□□ □□□□□□□- □□□

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (□□□)

□□. □□□□□ □□□□□- □□□

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (□□□)

□□. □□□□□ □□□□□- □□

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا (□□)

□□. □□□□□ □□□□□□□- □□

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (□□)

□□. □□□□□ □□□□□□- □□

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (□□)

□□. □□□□□ □□□□□□- □□

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (□□)

□□. □□□□□ □□□□□□□- □□

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (□□)

□□. □□□□□ □□□□□□- □

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (□)

□□. □□□□□ □□□□□- □

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (□)

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] (الْحَكِيم) [illegible]-

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

[illegible] [[illegible]- [illegible]; [illegible]- [illegible]]

[illegible]-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَدْرِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ

[illegible] [[illegible]- [illegible]]

ইমাম গাযালি রহ. বলেন, হিকমত হচ্ছে সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মূল। [ইহইয়াউ উলুমিদ দীন- ৩/৫৪]

অধুনা আমাদের সমাজে হিকমাতের হাকিকত অ¯পষ্ট হয়ে গেছে। প্রকৃত হিকমাত ধোঁয়াশার চাদরে আবৃত হয়ে গেছে আর কিতমান (শরিয়তের বিধানকে গোপনা রাখা) ও তাহরিফ (শরিয়তের অপব্যাখ্যা) তার স্থান দখল করে নিয়েছে। কেউ হিকমাত মানে বোঝে নম্রতা, কেউ বোঝে কৌশল, আর কেউবা বোঝে প্রজ্ঞা। প্রত্যেকেই আবার নিজের ধারণা নিয়ে সন্তুষ্ট, ধারণাপ্রসূত হিকমাতকেই তারা অবলম্বন করে সবক্ষেত্রে, কখনো এর প্রকৃত স্বরূপ জানার প্রয়োজনীয়তাটুকু পর্যন্ত বোধ করে না। ভ্রান্ত গোষ্ঠীর সদস্যরাও নিজেদের কাজকে হিকমাতের দোহাই দিয়ে বৈধ করে নিচ্ছে। সৃষ্টির ভয়ে স্রষ্টার বিধানকে গোপন রাখছে বা তার অপব্যাখ্যা করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছে। তাগুতের মঞ্চে বরেণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। দাওয়াতের স্বার্থেও কেউ শরিয়তের ভুল বা অস¤পূর্ণ ব্যাখ্যা করছে; মহান দায়ী নবিগণের দাওয়াতের সাথে যা সু¯পষ্ট সাংঘর্ষিক ও বিরোধপূর্ণ। অথচ পরিণামে তারাই জাতির কাছে আদর্শ ও দূরদৃষ্টিস¤পন্ন দায়ী হিসেবে বরিত হচ্ছে। নামের সাথে সুন্দর সুন্দর অভিধা যুক্ত হচ্ছে।

এসব কারণে হিকমাতের হাকিকত জানা ও এই মহান গুণকে নিজের ভেতরে আনার জন্য যথাযোগ্য প্রয়াস গ্রহন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি হিকমাতের নামে যেসব ভ্রান্তি সমাজে প্রচলিত তার স্বরূপও সবার সামনে উন্মোচিত হওয়া অতি জরুরি। তাই বিষয়টির গুরুত্বের দিকে লক্ষ করে আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে হিকমাত নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। এতে আমরা হিকমাতের হাকিকত তুলে ধরা, যেসব আয়াত ও হাদিসে হিকমাতের কথা এসেছে সেগুলোর সঠিক ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা উল্লেখ করা এবং হিকমাত অর্জন করার পন্থা স¤পর্কে দলিলসমৃদ্ধ আলোচনা করার প্রয়াস পাবো। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমিন।

হিকমাত শব্দের অর্থ

প্রতিটা পরিভাষার দুধরনের অর্থ থাকে। একটা শাব্দিক অর্থ , আরেকটা পারিভাষিক অর্থ। এখানে প্রথমে আমরা আরবি ভাষার নির্ভরযোগ্য অভিধানগ্রন্থ থেকে হিকমাত শব্দের শাব্দিক অর্থ বর্ণনা করবো। এরপর তার পারিভাষিক অর্থ স ¤পর্কে আলোচনা করবো।

হিকমাত শব্দের শাব্দিক অর্থ

হিকমাত শব্দটি হাকামা (حكم) ধাতু থেকে এসেছে ; যার অর্থ বিরত রাখা (মাকায়িসুল লুগাত , ইবনে ফারিস - ২/৯১), ইসলাহ এবং সংশোধনের জন্য কাউকে কোনো কিছু থেকে বিরত রাখা (মুফরাদাতুল কোরআন- রাগিব আসফাহানী- ১২৬)। আলহুকমু (শাসনকার্য পরিচালনা করা , বিচার করা) শব্দটিও এই হাকামা (حكم) ধাতু থেকে গঠিত ; যেহেতু শাসনকার্য ও বিচার মানুষকে জুলুম থেকে বিরত রাখে। হিকমাতকে হিকমাত বলা হয় এজন্য যে , যেহেতু তা মানুষকে অজ্ঞতা ও মূর্খতা থেকে বিরত রাখে। হিকমাত অর্জনকারীকে হাকীম বলা হয়। তদ্রুপ যিনি সবকাজ যথার্থতার সাথে সুষ্ঠুভাবে স ¤পাদন করেন তাকেও হাকীম বলা হয়। [লিসানুল আরব- ২/৯৫১-৯৬৪, মুখতারুস সিহাহ - ১৪৮]

আল্লামা রাগিব আসফাহানী রহ তার মুফরাদাতুল কোরআন গ্রন্থে বলেন , হিকমাত হচ্ছে ইলম এবং আকলের সাহায্যে সত্য পর্যন্ত পৌঁছা। এই গুণ

যার সাথে যুক্ত হয়, তার ভিত্তিতে এর অর্থ নির্ধারিত হয়। আল্লাহ তাআলার সাথে তা যুক্ত হলে অর্থ হয়, সকল বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান ও সেগুলোর নিপুণ সৃষ্টি। মানুষের সাথে যুক্ত হলে এর অর্থ হয়, পৃথিবীতে বিদ্যমান বিষয়গুলোর জ্ঞানার্জন করা এবং মহৎ ও কল্যাণকর কাজে ব্রত হওয়া। এ অর্থেই লুকমান আ এর ক্ষেত্রে হিকমাত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কোরআনের সাথে শব্দটি যুক্ত হলে তখন অর্থ হয় হিকমাতপূর্ণ গ্রন্থ। সুতরাং প্রয়োগক্ষেত্রের বিভিন্নতার কারণে হিকমাত শব্দের অর্থও পরিবর্তিত হয়। আল্লাহ তাআলার সাথে যুক্ত হলে তার এক অথ হর্য়। অন্য কারো সাথে এর প্রয়োগ ঘটলে তখন অর্থ হয় ভিন্ন কিছু। [মুফরাদাতুল কোরআন- ১২৬, ১২৭]। {আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন-মাকায়িসুল লুগাত, ইবনে ফারিস- ২/৯১; সিহাহ, জাওহারি- ৫/১৯০২; লিসানুল আরব, ইবনে মানযুর- ৯৫১-৯৫৪।} সবগুলো অভিধান সামনে রাখলে হিকমাতের যে শাব্দিক অর্থগুলো বের হয়, তা নিুরূপ-

১ অজ্ঞতা, বিশৃঙ্খলা ও জুলুম থেকে বিরত রাখা

২ ন্যায়পরায়ণতা

৩ সত্যতা সঠিকতা ও যথার্থতা

উপদ্ েভালো ও উত্তম কাজের নির্দেশ এবং গর্হিত কাজ থেকে বারণ

৫ অন্যদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ।

ইমাম গাযালি রহ বলেন, হিকমাত হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা সর্বোৎকৃষ্ট বিষয় জানা। আল্লাহ তাআলা হলেন প্রকৃত হাকীম। কেননা আল্লাহ তাআলাই সর্বোত্তম জ্ঞান দ্বারা সর্বোত্তম বিষয় জানেন। (আলমাকসিদুল আসনা- ১২০)

হিকমাত শব্দের প্রায়োগিক ও পারিভাষিক অর্থ

হিকমাত শব্দের পারিভাষিক অর্থ নিয়ে বিভিন্নজনের বিভিন্ন মত বর্ণিত হয়েছে। সুরা বাকারাহ - ২৬৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে আলবাহরুল মুহিতে আল্লামা আন্দালুসি রহ সকল বিদগ্ধ মুফাসসিরের অভিমতকে একত্রিত করেছেন , যার মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ত্রিশ। সবগুলো অভিমত উল্লেখ করার পরে তিনি বলেন , এসব বিভিন্নমুখী অভিমতের সারকথা অনেকটা কাছাকাছিই। এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ও ভিন্নতা কিবা বিরোধ ও সংঘর্ষ নেই। শুধু শব্দ ও ভাষার পার্থক্য। কেননা হিকমাত শব্দটি ইহকাম শব্দের ক্রিয়ামূল। যার অর্থ কোনো কথা বা কাজ তার সব গুণের সাথে স ¤পাদন করা। তাফসিরে আলবাহরুল মুহিত গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা আন্দালুসি রহ সুরা বাকারাহ্র আয়াত - ২৫১ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ (এবং আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও হিকমাত {এখানে নবুওয়াত অর্থে ব্যবহৃত } দান করলেন) এর ব্যাখ্যায় বলেন -

الحكمة وضع الأمور في محلها على الصواب، و كمال ذلك إنما يحصل بالنبوة.

হিকমাত হলো কোনো বিষয়কে সঠিকভাবে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। আর এর পূর্ণতা অর্জিত হয় নবুওয়াতের দ্বারা।

এরপর তিনি রাগিব আসফাহানির মুফরাদাতুল কোরআন গ্রন্থের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন , এই মূল বিষয়টিকেই বিভিন্ন ধরনের বক্তব্যে তুলে ধরা হয়েছে। তাই হিকমাত অর্থ কোথাও বলা হয়েছে কোরআন , কোথাও হাদিস , কোথাও সহিহ ইলম, কোথাও সহিহ আমল, কোথাও সত্য কথা , কোথাও সুস্থ বিবেক , কোথাও দীনের ফিকহ-সমঝ আর কোথাও আল্লাহর ভয়। শেষোক্ত অর্থটিতে তো হাদিসও বর্ণিত হয়েছে।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " رَأْسُ الْحِكْمَةِ: مَخَافَةُ اللَّهِ "

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা থেকে বর্ণিত , রাসুলুল্লাহ সা বলেছেন , হিকমাতের মূল হলো আল্লাহকে ভয় করা। [শুআবুল ঈমান , বায়হাকি - ৭১৪]

তেমনি সুরা বাকারাহ - ১২৯, সুরা বাকারাহ - ১৫১, সুরা আলে ইমরান - ১৬৪ এবং সুরা জুমআ - ২ আয়াতগুলোতে সাহাবা তাবেয়িনের তাফসির অনুযায়ী হিকমাত শব্দ দ্বারা দ্বারা সুন্নাহ উদ্দেশ্য। কোনো কোনো
মুফাসসিরের বক্তব্য হলো , সুরা বাকারাহ - আয়াত-২৬৯

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (২৬৯)

তিনি যাকে ইচ্ছা করেন , হিকমাত দান করেন। আর যাকে হিকমাত দান করা হয়, সে তো প্রভুত কল্যাণ লাভ করলো। উপদেশ তো শুধু জ্ঞানবানরাই
গ্রহণ করে।

-এ উপরিউক্ত সবগুলো অর্থই উদ্দেশ্য। [তাফসিরে আলবাহরুল মুহিত - ২/৩২০; তাফসিরে মাআরিফুল কোরআন- ১/২৪০-২৪১]

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ ফাতহুল বারি গ্রন্থে ইমাম নববি রহ এর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। ইমাম নববি বলেন , হিকমাতের ব্যাপারে অনেক ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। সব বক্তব্য থেকে আমাদের সামনে যে বিষয়টি প্রতিভাত হয় , তা হলো- হিকমাত অর্থ ইলম , যার সাথে আল্লাহর মারিফাতও থাকে। তাতে থাকে পূর্ণ বাসিরাত - পরিপূর্ণ উপলব্ধি ও ব্যুৎপত্তি এবং নফসের পরিশুদ্ধি। আর হক বিষয়কে চ ’ড়ান্ত ও যথার্থভাবে জানা - তার আলোকে আমল করার জন্য ও তার বিপরীত বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য। এসব গুণ যে অর্জন করতে সক্ষম হয় তাকেই
হাকীম বলা হয়। [১/৫৪৯]

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ বলেন, কোরআন শরিফের অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিকমাত শব্দটি এসেছে অন্য কোনো শব্দের সাথে বিযুক্ত অবস্থায়। যেমন সুরা নাহল- ১২৫; সুরা বাকারাহ- ২৬৯; সুরা লুকমান- ১২। এসব ক্ষেত্রে হিকমাতের অর্থ নির্ধারন নিয়ে আলিমগণের উপরিউক্ত মতভিন্নতা প্রযোজ্য হবে। আর যেখানে হিকমাত শব্দটি কিতাব শব্দের সাথে যুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে সুন্নাহ, অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সা এর কথা কাজ এবং মৌন সমর্থন। যেমন সুরা বাকারাহ- ১২৯, ২৩১; সুরা আলে ইমরান- ১৬৪; সুরা জুমআ- ২। [মাদারিজুস সালিকীন- ২/৭৪৮; আততাফসিরুল কায়্যিম- ২২৭]

ড ইয়াকুব আদিল নাসিরুদ্দীন তার মাফহুমুল হিকমাত গ্রন্থে বলেন, আমরা লক্ষ করবো, পবিত্র কোরআনে হিকমাত শব্দটি দুভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও অন্য কোনো শব্দের সাথে বিযুক্ত অবস্থায়। যেমন- সুরা বাকারাহ- ২৬৯ ও সুরা কামার- ৫। এসব ক্ষেত্রে হিকমাত শব্দকে নবুওয়াত ও ইলমুল কোরআন দ্বারা তাফসির করা হয়েছে। আর কোথাও তা ব্যবহৃত হয়েছে কিতাব শব্দের সাথে যুক্তাবস্থায়। যেমন সুরা বাকারাহ- ১২৯। এক্ষেত্রে এর দ্বারা সুন্নাহ উদ্দেশ্য। ইমাম শাফেয়িসহ অন্যান্য ইমামগণের অভিমত এটাই। অবশ্য কেউ কেউ ওহির আলোকে ফায়সালা করা শব্দেও তাফসির করেছেন। তবে এসব ক্ষেত্রে সুন্নাহ শব্দে তাফসির করাটাই ব্যাপকভাবে প্রচলিত। হিকমাতের ব্যাখ্যায় সবচে সুন্দর কথা বলেছেন ইমাম মালিক ও মুজাহিদ- {{হিকমাত হচ্ছে হক বিষয় জানা ও তার আলোকে আমল করা। কথা ও কাজ যথাযথভাবে স¤পাদন করা।}}আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ যোগ্যতা হাসিল করা আলকোরআনের যথাযথ বুঝ, শরিয়তের ফিকহ ও ইমানের হাকিকত অর্জনের দ্বারাই শুধু সম্ভব।

আল্লামা কাহতানি রহ বলেন, হিকমাতের সংজ্ঞায় প্রায় উনত্রিশটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। সবগুলো অভিমত প্রায় কাছাকাছিই। গভীরভাবে লক্ষ করলে বোঝা যায়, হিকমাতের সবচ ব্যাপক অর্থবোধক সংজ্ঞা এবং যা

অপরাপর সকল সংজ্ঞাকে অন্তর্ভুক্ত করে তা হলো- সঠিক ও যথাযথ কথা ও কাজ এবং প্রতিটি জিনিসকে তার যথাস্থানে প্রয়োগ। আর এর পারিভাষিক নামই হলো হিকমাত। [কিতাবুল হিকমাহ- ২৭]

এ বিষয়টাকে আরো সু¯পষ্টভাবে বলেছেন শায়খ নাসির ইবনে সুলায়মান উমর। তিনি বলেন, হিকমাত হচ্ছে উচিত সময়ে উচিত পন্থায় উচিত কাজ করার নামই হিকমাত। এ তিনটি বিষয় পাওয়া গেলেই তা হিকমাত বলে গণ্য হবে। এ তিনটি বিষয়ের কোনো একটি যদি না পাওয়া যায় তাহলে তা আর হিকমাত থাকবে না। [শায়খের বয়ানের লিংক- https://youtu.be/NKFxmGn-CLs]

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য- যেসব আয়াতে হিকমাত- নবুওয়াত কোরআন ও আল্লাহর শরিয়ত অর্থে নবি-রাসুলদের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে অতীতবাচক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন সুরা বাকারাহ-২৩১, ২৫১; সুরা আলে ইমরান- ৮১ ও অন্যান্য আয়াত। কেননা অতীতবাচক ক্রিয়া বিষয়টির বিদ্যমানতা ও সুনিশ্চিত অর্জনের দিকে ইঙ্গিত করে। তাই এর অর্থ দাঁড়ায়- নবুওয়াত কোরআন ও আল্লাহর শরিয়ত বিদ্যমান, চিরস্থায়ী। কখনো তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটবে না। আর তার পূর্ণতাও সুনিশ্চিতভাবে অর্জিত হয়ে গেছে। তাই তো মহামহিম আল্লাহ বলেন, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। (সুরা আলমায়িদা- ৩)

আর যেসব আয়াতে হিকমাত- ইলম বুঝ ও জানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে ভবিষ্যতবাচক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন সুরা বাকারাহ- ১৫১, ২৬৯; সুরা আলে ইমরান- ১৬৪; সুরা জুমআ- ২। এসব ক্ষেত্রে ভবিষ্যতবাচক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে চলমানতা ও স্থায়িত্ব বোঝানোর জন্য। সুতরাং এই প্রকারের হিকমাত ইলম বুঝ ও মারিফাতের দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব, ভিন্ন কোনো পন্থায় নয়।

[illegible]

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ([illegible])

[illegible]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ([illegible])

[illegible]

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ([illegible])

[illegible]

[illegible]

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ([illegible])

[illegible]

[illegible]

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ (১৫)

আমি তোমাদের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে আদিষ্ট হয়েছি। [সুরা শুরা - ১৫]

আর আদেশবাচক ক্রিয়ার সাথে ব্যবহৃত দ্বিতীয় আয়াতটি হলো -

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ (৩৪)

তোমরা স্মরণ রেখো আল্লাহর আয়াত ও হিকমাত, যা তোমাদের গৃহাভ্যন্তরে পাঠ করা হয়। [সুরা আহযাব - ৩৪]

এ আয়াতে যারা হিকমাত অর্জন করেছে, এর শিক্ষা পেয়েছে নবুওয়াতের আলোকিত দীপাধার থেকে- আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তারা যেনো অন্যদেরকেও তার শিক্ষা দেয়, যাতে করে তারা উপকারী ইলম ও নেক আমলের দিকে মানবজাতির পথপ্রদর্শক হতে পারে। তখন চ’ড়ান্ত সাফল্য লাভ হবে ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে। [মাফহুমুল হিকমাত - ১০-১১]

মুফাসসিরগণ বলেন, পবিত্র কোরআনে হিকমাত শব্দটি মৌলিকভাবে ছয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১ উপদেশ (الموعظة)। আল্লাহ তাআলা বলেন -

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (৫)

এক পরিপূর্ণ হিকমাত (উপদেশ)। তবে সতর্ককারীগণ তাদের কোনো কাজে আসে না। [সুরা কামার - ৫]

[illegible] (السنة) [illegible]-

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ([illegible])

[illegible] ([illegible]) [illegible]- [illegible]]

[illegible] (الفهم) [illegible]-

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ([illegible])

[illegible] ([illegible]) [illegible]

[illegible] (النبوة) [illegible]-

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ([illegible])

[illegible] ([illegible]) [illegible] [[illegible]- [illegible]]

[illegible] (القرآن) [illegible]-

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ([illegible])

[illegible] ([illegible]) [illegible] [[illegible]- [illegible]]

[illegible]-[illegible] (علوم القرآن) [illegible]-

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (২৬৯)

তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, হিকমাত (কোরআনের ইলম-জ্ঞান) দান করেন। আর যাকে হিকমাত দান করা হয়, সে তো প্রভুত কল্যাণ লাভ করলো। উপদেশ তো শুধু জ্ঞানবানরাই গ্রহণ করে। [সুরা আলবাকারা - ২৬৯]

এই আয়াতের তাফসিরে ইবনুল জাওযি রহ পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণের সাতটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। সেই বক্তব্যগুলো সামনে রাখলে হিকমাতের অর্থ আরো সু¯পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে ইনশাআল্লাহ।

১ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা বলেন, হিকমাত দ্বারা উদ্দেশ্য কোরআন।

২ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা বলেন, হিকমাত অর্থ আলকোরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান। অর্থাৎ তার নাসিখ-মানসুখ, মুহকাম-মুতাশাবিহ ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান।

৩ ইবনে আব্বাস রা থেকে আরেকটি মত বর্ণিত হয়ছে। হিকমাত অর্থ নবুওয়াত। সুদ্দী রহ সহ আরো অনেকের মতও তাই।

৪ মুজাহিদ রহ থেকে লাইছ রহ বর্ণনা করেন, হিকমাত অর্থ ফিকহ এবং ইলম

৫ মুজাহিদ রহ থেকে আরেকটি অভিমত আছে। যা বর্ণনা করেন ইবনু আবি নাজিহ। তিনি বলেন, হিকমাত অর্থ কথা ও কাজ সঠিক যথাযথ হওয়া।

৬ আনাস রা থেকে রবী রহ বর্ণনা করেন, হিকমাত হলো আল্লাহর ভয়।

৭ ইবনে যায়দ রহ বলেন , হিকমাত হচ্ছে দীনের সঠিক বুঝ। [নাযরাতুন নাঈম- ১৬৭৯-১৬৮০]

এছাড়া আরো কিছু অর্থেও হিকমাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে পবিত্র কোরআনের যেসব আয়াতে হিকমাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সবগুলো অর্থ উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

হাকীম শব্দের ব্যবহার

পবিত্র কোরআনে হাকীম শব্দটি পাঁচ ধরনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১ হিকমাতের সাথে সিদ্ধান্তকৃত বিষয়। যেমন -

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (৪)

সে রাতে প্রতিটি প্রজ্ঞাজনোচিত বিষয়ের নির্দেশ স্থির করা হয়।
[সুরা দুখান - ৪]

২ লাওহে মাহফুজ। যেমন -

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (৪)

প্রকৃতপক্ষে তা আমার নিকট লাওহে মাহফুজে উচ্চ মর্যাদাস ¤পন্ন
হিকমাতপূর্ণ কিতাব। [সুরা যুখরুফ - ৪]

৩ এমন কিতাব, যা প্রভুত কল্যাণবাহী। □□□□-

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (١)

আলিফ লাম রা। তা হিকমাতপূর্ণ কিতাবের আয়াত। [সুরা ইউনুস - ১]

৪ শরিয়তের বিধানাবলি বর্ণনাকারী মহাগ্রন্থ আলকোরআন। □□□□-

يس (١) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (٢)

ইয়াসিন। এবং শপথ হিকমাতপূর্ণ আলকোরআনের। [সুরা ইয়াসিন - ১-২]

৫ আল্লাহ তাআলার বিশেষ সিফাত হিসেবে ব্যবহৃত। কোথাও সুউচ মর্যাদা
ও মাহা ্যের সাথে ব্যবহৃত। □□□□-

إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (٥١)

তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাস ¤পন্ন , হিকমাতের মালিক।

[সুরা শুরা - ৫১]

কোথাও ইলম এবং জ্ঞানের সাথে। □□□□-

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٨٣)

নিশ্চয়ই তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী , পূর্ন হিকমাতের মালিক।
[সুরা ইউসুফ - ৮৩]

কোথাও পূর্ণ অবগতির সাথে। যেমন-

الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (١)

এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহকে (দলিল-প্রমাণ দ্বারা) সুদৃঢ় করা হয়েছে। তারপর এমন এক সত্তার পক্ষ থেকে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি হিকমাতের মালিক, সবকিছু স ¤পর্কে অবহিত। [সুরা হুদ - ১]

কোথাও পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও পরাক্রমের সাথে। □□□□-

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٥٨)

আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, হিকমাতের মালিক। [সুরা নিসা - ১৫৮]

আল্লাহ তাআলার সাথে হাকীম শব্দ ব্যবহৃত হলে তখন এর অর্থ হয় চ’ড়ান্ত নিপুণতা ও যথার্থতার সাথে সকল বস্তু সৃষ্টি করা।
[বাসায়িরু যাবিত তাময়িয - ২/৪৯২; নাযরাতুন নাঈম - ১৬৮০-১৬৮১]

{{চলবে ইনশাআল্লাহ }}

ছিঁড়ে ফেলো আজ আয়েশী রাতের মখমল অবসাদ

ALI HASAN OSAMA·THURSDAY, FEBRUARY 23, 2017

পূর্ণাঙ্গ ধর্ম ইসলাম। বিধাতার নির্বাচিত ধর্ম ইসলাম। তাঁর কাছে একমাত্র গ্রহণীয় ধর্ম ইসলাম। ইরশাদ হয়েছে - ‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। এবং দীন হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য পছন্দ করে

দিলাম। ’ [সুরা মায়িদা- ৩] আরো ইরশাদ হয়েছে- ‘নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় দীন শুধুই ইসলাম। [সুরা আলে ইমরান- ১৯]

ইসলামের নবি মুহাম্মাদে আরাবি সা.। সত্য পথের দিশারী। নিবিড় তমসা বিদূরকারী। যার চরিত্রে ছিলো না কদর্য, ছিলো না কোনো পঙ্কিলতা। তাঁর আনীত শাশ্বত ধর্ম ইসলাম। খোদায়ি নুরে পূর্ণ উদ্ভাসিত এই ইসলাম। তার অনুসারীগণ দিগন্তজোড়া আকাশের নিচে সবচে মহান, সবচে উদার। আলোকিত তাদের হৃদয়মিনার। দীপ্ত তাদের চরিত্র। সত্য পথের পথিক যেমন হওয়া কাম্য তারা ঠিক তেমনই।

মানবতার আদর্শ এই সত্য নবির আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন হযরত ইসা আ.; যাঁর আগমনের পরে রহিত হয়ে গেছে সকল ধর্ম, সকল আসমানি গ্রন্থ। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে- ‘স্মরণ করো ঐ সময়ের কথা, যখন মারয়াম তনয় ইসা. বলেছিলো, হা বানি ইসরাইল! নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের কাছে প্রেরিত আল্লাহর রাসুল, আমার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং আমার পরে আগত এক মহান রাসুলের সুসংবাদ দানকারী, যার নাম আহমদ। তিনি যখন তার কাওমের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণদাই নিয়ে আসবেন, তখন তারা বলবে, এ দেখি সুস্পষ্ট জাদু।’ [সুরা সফ- ৬]

ইউহোন্নার ইনজিলে আছে, ইসা আ. শিষ্যদের উদ্দেশে প্রদত্ত এক দীর্ঘ ভাষণে বলেছেন- ‘তোমরা যদি আমাকে মহব্বত করো, তবে আমার সমস্ত হুকুম পালন করবে। আমি পিতার নিকট চাইবো আর তিনি তোমাদের নিকট চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন। সেই সাহায্যকারীই সত্যের রূহ। দুনিয়া তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ দুনিয়া তাঁকে দেখতে পায় না এবং তাঁকে জানেও না। তোমরা কিন্তু তাঁকে জানো, কারণ তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। আর তিনি তোমাদের অন্তরে বাস করেন। ’[ইউহোন্না- ১৪/১৫-১৭]

‘যে কথা শুনছো তা আমার কথা নয়; কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতারই কথা। তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই এ সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলেছি। সেই সাহায্যকারী অর্থাৎ পাক-রূহ, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনি সমস্ত বিষয়য় তোমাদের শিক্ষা দেবেন। আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি, সেই সমস্ত তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন। ’[ইউহোন্না- ১৪/২৪-২৬]

‘আমি তোমাদের সঙ্গে আর বেশীক্ষণ কথা বলবো নয়া, কারণ দুনিয়ার কর্তা আসছেন। আর আমার ওপর তাঁর কোন অধিকার নেই।’ [ইউহোন্না১৪/৩০-৩১]

‘যে সাহায্যকারীকে আমি পিতার নিকট থেকে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দেবো, তিনি যখন আসবেন, তখন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। ইনি হলেন সত্যের রূহ, যিনি পিতার কাছ থেকে আসবেন। আর তোমরাও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে, কারণ প্রথম থেকে তোমরা আমার সংগে সঙ্গে আছো।’ [ইউহোন্না- ১৫/২৬-২৭]

‘তবুও আমি তোমাদের সত্য কথা বলছি যে, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভালো। কারণ আমি নয়া গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাঁকে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দেবো। তিনি এসে দুনিয়াকে পাপের সম্বন্ধে চেতনা দেবেন।’ [ইউহোন্না-১৬/৭-৯]

‘কিন্তু সেই সত্যের রূহ যখ আসবেন, তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন; তিনি নিজ থেকে কথা বলবেন না। কিন্তু যা কিছু শোনেন তাই বলবেন। আর যা কিছু ঘটবে তাও তিনি তোমাদের জানাবেন। [ইউহোন্না- ১৬/১৩-১৪]

জাহেলি যুগে আরবে যখন ভূমিষ্ঠ হলেন নবি মুহাম্মাদ সা., ধীরে ধীরে বেড়ে উঠলেন খোদায়ি প্রতিপালনে সমাজে পুঞ্জীভূত সব আঁধার তাড়ালেন আলোর দীপ্ত মশাল হাতে, ছড়িয়ে দিলেন সর্বত্র পুণ্যের আলো।

মানবতাহীন মানুষদেরকেই তারবিয়াত করে গড়ে তুললেন সত্যের গর্বিত বাহকরূপে। তাঁর মাধ্যমে বিশ্ব মানবতা পেলো সভ্যতার দীক্ষা। তাঁর চরিত্রের বিভা দর্শনে অভিভূত হয়ে পবিত্র ইসলামবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিলো হাজারো মুক্তিকামী মানবতা। ইতিহাস সাক্ষী, মুহাম্মাদে আরাবি সা. ও তাঁর সাহাবিগণের মহানুভবতা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো আকাশের উচ্চতা। তাদের চরিত্র ছিলো অনুপম, আকাশের তারকার মতো যা জ্বলজ্বল করে জ্বলতো, বিশ্ব মানবতার জন্য চিরআদর্শ।

মাতৃক্রোড় থেকেই সেই মহানবির আদর্শে বেড়ে অথে প্রতিটি মুসলিম। নিজেদের চরিত্রকে রাঙায় নববি রঙে। মুসলিম শিশু বড় হয়ে প্রিয় রাসুলের এই শিক্ষা নিয়ে- ‘সম্পদের প্রাচুর্য দিয়ে তোমরা জনগণের ওপর জয়ী হতে পারবে না। হৃদয়ের উদারতা ও চরিত্র-মাধুর্যই পারে তাদের ওপর তোমাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতে।’ [বায়হাকি] আনাস রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সা.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! মুমিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইমান কার? রাসুলুল্লাহ সা. উত্তর দিলেন, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্র যার সে।’ [আবু দাউদ]

দেড় হাজার বছর পূর্বে পারাণের চূড়া থেকে মুসলিম জাতির বিজয়ের উৎসারিত যে ধারা প্লাবিত করেছিলো ইরান তুরান আফগান স্পেন মিশর ভারতসহ কতো দেশ, কতো মানচিত্র- তার ভিত্তিমূলেই ছিলো মুসলমানদের চরিত্র-মাধুর্য। দেশ জয়ের পূর্বেই তা জয় করে নিয়েছিলো দেশবাসীর হৃদয়মিনার। তরবারির জোরে ইসলাম সারা পৃথিবীতে ছড়ায়নি, সেই শক্তিতে কালিমা তার হেলালি নিশান ওড়ায়নি। হাঁ, শক্তি ও তরবারি ইসলামি সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃতকরণে তো বিরাট ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু তরবারির শক্তি প্রয়োগ করে কাউকে মুসলমান বানানো হয়নি। তাছাড়া শুধুই তরবারির ভয়ে যে ইসলাম গ্রহণ করে তার ইসলাম কখনোই বিধাতার দরবারে গৃহীত হয় না।

ইউরোপ-আমেরিকায় শিশুদের কচি হৃদয়ে তাদের শৈশবেই এ ধারণা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়- ‘মুসলিম জাতি বর্বর জাতি। বড় হিংস্র ও রক্তপিপাসু তারা।’ফলে সেসব কোমলমতি শিশুরা যখন বড় হয়, তখন তাদের হৃদয়ফলকে উৎকীর্ণ থাকে একটি বাক্য- ‘মুসলিম জাতি বর্বর জাতি।’

কিন্তু পাঠক ইতিহাস ও বাস্তবতা কি তা-ই বলে? মহানবি সা. ও তাঁর সাহাবিগণের জীবনচরিত তো দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। তাদের জীবনচরিত নিয়ে বিশ্বের প্রায় সব ভাষায়ই রচিত হয়েছে বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ। সত্যের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তাতে একবার নজর বুলিয়ে নিতে পারেন। সত্যের সূর্য আর আড়াল থাকবে না আপনার দৃষ্টিপথে।

এখানে ইসলামের কয়েকজন সাধারণ অনুসারীর অনুপম চরিত্র-মাধুর্যের দু-চারটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি, যা পাঠ করলে পাঠকের সামনে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হবে কবির নিম্নলিখিত বক্তব্যের যথার্থতা-

‘‘ওরাই মোদের পূর্বসুরীওদের নিয়েই গর্ব করি,কোন সুরেতে গর্ব করোলও তো দেখি তাদের জুড়ি।’’

১. কায়স ইবনে আসিম। সাধারণ একজন মুসলিম। বিত্তের প্রাচুর্য নেই তার। অজপাড়াগাঁইয়ের ছোট্ট এক কুটিরের মালিক। একদিন সন্ধ্যেবেলায় শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। শ্রাবণের ব্যাকুল সন্ধ্যার উথা-পাথাল হাওয়ায় জুড়িয়ে নিচ্ছেন দেহ-মন। এমন সময় তার এক দাসি কাবাবভর্তি শলাকা নিয়ে সমুখে হাজির। আচমকা দাসির হাত ফসকে লৌহশলাকা পড়ে গেলো। পড়লো তা শিশুর মাথায়। ফলে তৎক্ষণাতই নিষ্পাপ শিশুটি মৃত্যুর সুধা পান করলো। দাসি ভয়ে নিশ্চল, নিথর। তার শুভ্র মুখাবয়বে ফুটে উঠেছে দুশ্চিন্তার রেখা। নেমে সেছে তাতে রাজ্যের সব কালো মেঘ। কায়স বললেন, ‘তোমার ঘাবড়ানোর কিছু নেই। বিধাতা আমার ভাগ্যে এ রেখেছিলেন। যাও, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আজ থেকে তুমি আযাদ।’

২. মারুফ কারখি। খোদার প্রেমসরোবরে সদা অবগহনকারী এক যুবক। আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে হৃদয় তার সর্বদা ব্যাকুল। একদিন উজু করতে দজলা নদীতে নামলেন তিনি। নদীর তীরে ঘাসের ওপর রেখে গেলেন তোয়ালে ও পবিত্র কোরআনের একটি মুসহাফ। পুলকিত হৃদয়ে উজু করছেন তিনি। এমন সময় অচেনা এক যুবতী চোর এসে তার মুসহাফ ও তোয়ালে নিয়ে উল্টোদিকে দিলো ছুট। মারুফও তার পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলেন। দূরত্ব কিছুটা কমে এলেই চিৎকার করে তিনি বললেন, ‘এই মেয়ে, ভয় পেও না। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। শুধু এতোটুকু বলো, তোমার বাসায় যারা আছে তাদের কেউ কি মুসহাফ দেখে দেখে কোরআন তিলাওয়াত করতে পারে?’ যুবতী মেয়েটি এবার থেমে বললো, ‘না, কেউই পারে না।’ মারুফ বললেন, ‘তবে এই মুসহাফটি নিয়ে তোমার কোনো লাভ হবে না। এরচে ভালো, ওটা আমাকে দিয়ে আমার জুব্বাটি তুমি নিয়ে যাও। বাজারে বিক্রি করে দিলে কিছু টাকা তো হাতে পাবে। তাতে তোমার ভালোই উপকার হবে।’ এই বলে মারুফ তার জুব্বা খুলে যুবতী চোরের হাতে দিলেন।

৩. আব্দুল্লাহ। এক বিখ্যাত দর্জি। তার দোকানের পাশে ছিলো এক অগ্নিপূজক দর্জির দোকান। নিজের কাজ না থাকলে থাকলে আব্দুল্লাহ তার থেকে নিয়ে কাপড় সেলাই করে দিতেন। বিনিময়ে সেই অগ্নিপূজক দর্জি আব্দুল্লাহকে সর্বদাই জাল মুদ্রা দিতো। আব্দুল্লাহও কোনো আপত্তি না জানিয়ে তা নিয়ে তা নিয়ে নিতেন। একদিন কোনো এক কাজে আব্দুল্লাহ দূরে কোথাও গেলেন। দোকানে রেখে গেলেন তার এক কর্মচারীকে। এমন সময় সেই অগ্নিপূজক দর্জি এসে তার কাপড়গুলো চাইলো। কর্মচারী কাপড় দিলে সে পূর্বের মতো জাল মুদ্রা দিলো। কর্মচারী এতে চটে গেলো। তখন সে দ্রু নির্ভেজাল মুদ্রা পরিশোধ করে সেখান থেকে কেটে পড়লো। আব্দুল্লাহ রাতে ফিরে এসে দেখলেন, দোকানে অগ্নিপূজক দর্জির কাপড় নেই। কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলে সে আদ্যোপান্ত সব বললো। সব শুনে আব্দুল্লাহ ভারি মর্মাহত হলেন। তিনি বললেন, ‘যেদিন থেকে আমি তার কাপড় সিলিয়ে দিচ্ছি বিনিময়ে সে সর্বদাই আমাকে জালমুদ্রা দিয়ে আসছে। কিন্তু কই কখনো তো আমি কোনো

আপত্তি করিনি।!তার দেয়া মুদ্রাগুলো সব সময় আমি কুঁয়ায় ছেড়ে ফেলে দিতাম। আজ তুমি এ কী করলে! তার দ্বারা কোনো মুসলমান প্রতারিত হওয়ার পথ সুগম করে দিলে!

৪. ইবরাহিম ইবনে আদহাম। খোরাসানের রাজাধিরাজ। জনমানবহীন এক জনপদ ধরে হাঁটছেন তিনি। এমন সময় কোত্থেকে এক সৈনিক এলো। এসে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার? এই এলাকার লোকজন সব কোথায়? ইবরাহিম ইবনে আদহাম কবরস্থানের দিকে ইশারা করলেন। তার এই কাজটিকে ঠাট্টা ও দুষ্টুমি ভেবে ভীষণ রেগে গেলো সৈনিক। ইবরাহিম ইবনে আদহামের সুন্দর শ্মশ্রুমণ্ডিত গালে সজরে বসিয়ে দিলো এক চড়। কোনো প্রতিবাদ না করে, নিশ্চুপ থেকে নিজ পথে পা বাড়ালেন খোরাসানের রাজাধিরাজ। দূর থেকে এ দৃশ্য দেখলো এক কাঠুরী। ইবরাহিম ইবনে আদহাম দূরে চলে গেলে সে ছুটে এলো সৈনিকের কাছে। এসে বললো, ‘এ আপনই কী করলেন?’ সৈনিক উত্তর দিলো, ‘কেনো? কী হয়েছে?’ কাঠুরী বললো, ‘এইমাত্র যাকে মারলেন, আপনি তারই আজ্ঞাবহ কর্মচারী। খোরাসানের রাজা তিনি!’ কথাটি শুনে সৈনিকের বুক ধুকপুক করে উঠলো। কপাল বেয়ে তরতর করে ঘাম বইতে শুরু করলো। হৃৎকম্পন প্রচণ্ড রকম বেড়ে গেলো। এ কী করলাম আমি! ছুটে গিয়ে ইবরাহিম বিন আদহামের পায়ে পড়লো। কাকুতিভরা স্বরে ক্ষমা চাইতে লাগলো। মহানুভব রাজা বললেন, ‘অস্থির হচ্ছো কেনো? আমাকে যখন তুমি চপেটাঘাত করেছো, তখন তোমার জন্য আমি রহমানের কাছে জান্নাত প্রার্থনা করেছি।’ রাজ্যের বিস্ময় বয়ে গেলো সৈনিকটির ভাবুক মনে। জিজ্ঞেস করে বসলো, ‘কিন্তু কী কারণে, জাহাঁপনা?!’ ইবরাহিম ইবনে আদহাম বললেন, ‘আমি নিশ্চিত জানি, আমাকে তুমি অন্যায়ভাবে প্রহার করার কারণে মহার স্রষ্টার কাছে আমার জন্য বিরাট প্রতিদান সাব্যস্ত হয়েছে। আমি এতো বড় স্বার্থপর নেই, যার জন্য বিরাট প্রতিদানের অধিকারী হলাম তাকে হতভাগারূপে জাহান্নামের কয়েদীদের সাথে ফেলে আসবো! আমি চেয়েছি, যার কারণে আমি এক নেয়ামতের অধিকারী হচ্ছি আমার কারণে সে সবচে বড় নেয়ামত জান্নাতের অধিকারী হোক। তাইও এমনটি করেছজি।’

এখানে চারটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলাম মাত্র। প্রকৃত মুসলিম যারা, এমন বরং এরচেও বিস্ময়স্কর সব ঘটনা তাদের জীবনে অহরহই ঘটছে। ব্যতিক্রমও যে কিচু নেই তা নয়। ধর্মীয় জ্ঞান যাদের নেই, তারা মাঝেমধ্যে কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ করে বসে। কিন্তু সেসব বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তো আর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিকে বর্বর, হিংস্র সাব্যস্ত করা যায় না। মুসলিম জাতির চরিত্র সর্বদাই মহান, বিশ্ব মানবতার আদর্শ। প্রসঙ্গত এখানে একটি ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করা সঙ্গত মনে হচ্ছে।

ইসলামের অনুসারী এক মুজাহিদ কাফেলার নাম তালেবান। যারা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী হিসেবে স্বীকৃত বিশ্ব-মোড়লদের কাছে। ইউরোপ-আমেরিকায় যাদেরকে আখ্যায়িত করা হয় ‘রক্তপিপাসু’ বলে। ওদের চোখে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীরই একটা ঘটনা উল্লেখ করছি। তথ্যসংগ্রহের জন্য তাদের ক্যাম্পে অন্যায়ভাবে ঢুকে পড়েন লন্ডনের ‘সানডে এক্সপ্রেসে’র মহিলা সাংবাদিক মিস ইয়োভনি রিডলি। ফলে তালেবান যোদ্ধাদের হাতে গ্রেফতার হন তিনি। এবার যে আর রক্ষা নেই! মৃত্যুভয়ে একেবারে কুঁকড়ে যান ইয়োভনি রিডলি। দীর্ঘ দশদিন থাকেন তাদের হেফাজতে। এ সময়ে কোনো তালেবান যোদ্ধাও একবারের জন্য তার দিকে চোখ তুলে তাকায়নি; কিন্তু তার সেবা-যত্নে কোনো ত্রুটি করেনি এই ‘রক্তপিপাসু’ দল। তাদের অপার্থিব আচরণ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হন ইয়োভনি রিডলি। দেশে ফিরে তালেবানদের ধর্ম নিয়ে গবেষণা শুরু করেন তিনি। যে ধর্ম মানুষকে এতো মহান করে তুলতে পারে, নিশ্চয় তা-ই সত্যধর্ম। সুদীর্ঘ গবেষণার ফলে তার সামনে উদঘাটিত হয় প্রকৃত সত্য। স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি।

বিকৃত ইতিহাসকে অবলম্বন না করে সঠিক ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলালে মুসলিম জাতির বর্বরতার চিত্র খুঁজে পাবে না কেউ কোথাও। অপরদিকে আবু গারিব ও গুয়ানতানামো প্রোজ্জ্বল সাক্ষী ইসলামের বিরুদ্ধে দৃপ্তকণ্ঠ সেকুলারিজমের বর্বরতার। মিডিয়া শক্তিকে অপব্যবহার

করে বিশ্ববাসীর সামনে মুসলিম জাতিকে ওরা চিত্রিত করছে বর্বররূপে। না বুঝে ওদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়েছে বহু মুসলিম। আজ সময় এসেছে নব জাগরণের; খালিদি হুংকারে বিশ্ব কাঁপিয়ে দেয়ার সময় আজই।
ইসলামি রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ যথার্থই বলেছেন-

ভেঙ্গে ফেলো আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ,
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালুর বাঁধ
ছিঁড়ে ফেলো আজ আয়েশী রাতের মখমল - অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দাবাদ

((আজ থেকে ছ’বছর আগের লেখা। আমি তখন বাইতুস সালামে চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়নরত।))

ইসলামি পত্রিকায় সাহাবিবিদ্বেষের ধৃষ্টতা

ALI HASAN OSAMA·FRIDAY, FEBRUARY 24, 2017

পাঁচ বছর আগের ঘটনা। বাইতুস সালামে আমার পঞ্চম বর্ষের শুরুর কথা। মাসিক আলোর পথের সে বছরের ঈদ সংখ্যায় কারবালার ঘটনা নিয়ে আনোয়ার হোসেন লালনের একটি সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক উপন্যাস- ‘কারবালার কান্না’ প্রকাশিত হয়। লেখক তার পুরো লেখায় আমিরে মুআবিয়া রা.র বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ ঝেড়েছেন। মুআবিয়া রা. ও তাঁর অনুসারীদেরকে খারেজি-কাফির প্রমাণিত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় উস্তাদ লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক মাওলানা খন্দকার মনসুর আহমদ দা. বা.র নির্দেশে তখন নিচের লেখাটি প্রস্তুত করি। একই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় লেখাটি প্রকাশিত হয়। শিরোনামও মুহতারাম উস্তাদের নির্দেশে এটাই দেয়া হয়। পরবর্তীতে তারা অবশ্য শিরোনাম পরিবর্তন করে, সম্পাদকমণ্ডলীর উদ্দেশে বলা শেষের আহবানটাকে ফেলে দিয়ে বাকি পুরো লেখার কাঠামো ঠিক রেখেই তা প্রকাশ করে। তদের দেয়া শিরোনাম ছিলো- ‘হযরত মুআবিয়া রা. ছিলেন একজন উঁচু মাপের সাহাবি’।

হযরত মুআবিয়া রা.। প্রিয় রাসুল মুহাম্মাদে আরাবি সা.এর মহান সাহাবিগণের মোবারক কাফেলার এক মহান ব্যক্তিত্ব। নবি-উদ্যানের এক সুরভিত পুষ্প। ইমান ও সত্যের আকাশে এক জ্যোতির্ময় তারকা। মক্কা বিজয়ের পুণ্যলগ্নে ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কোরআন অবতরণের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওহি লেখার সুমহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন আলোকিত এই সাহাবি। এ মহান সৌভাগ্য সাহাবিগণের মাহফিলে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো সম্মান ও মর্যাদার শিখরে, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কাননে। রাসুলে খোদাও প্রাণভরে দোয়া করেছিলেন জীবন পাওয়া এই কুড়ানো মানিকটির জন্য। - ‘খোদা হে, মুআবিয়াকে তুমি পথপ্রাপ্ত ও পথপ্রদর্শক বানাও এবং তার মাধ্যমে মানবতাকে হেদায়াত দান করো। [তিরমিযি]

হযরত আলী রা.এর মর্মান্তিক শাহাদাতের পর তাঁর শাসনকালই ছিলো ইসলামি ইতিহাসের উজ্জ্বলতম যুগ। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তখন বিরাজমান ছিলো সুখ শান্তি স্থিতি ও নিরাপত্তা। বহিঃশত্রুর মন ও মানসজুড়ে ছিলো ইসলামি খেলাফতের অপ্রতিহত প্রভাব। ফলে মুসলিম জাহানের সীমান্তের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস ছিলো না তাদের। কিন্তু সীমাহীন লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়য়- ইসলামের মুখোশহীন ও মুখোশধারী শত্রুরা নবিজির এই প্রিয় সাহাবির বিরুদ্ধে মিথ্যা

অপবাদ ও প্রচারণার এমন ধূম্রজাল সৃষ্টি করে রেখেছে যে, ইসলামি ইতিহাসের এ স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় আজ হারিয়ে গেছে মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টিপথ থেকে। এই মাজলুম সাহাবির চরিত্র হননে এমন কোনো অপকৌশল বোধহয় নেই, যা শত্রুরা ব্যবহার করেনি। ইসলামি ইতিহাসের আর কোনো ব্যক্তিত্বের প্রতি ওরা এতোটা নগ্ন, এতোটা নির্মম হয়নি।

সাধারণ ইতিহাস-পাঠকের দৃষ্টিতে প্রিয়নবির স্নেহধন্য সাহাবি মুআবিয়া রা.এর পরিচয় আজ এই দাঁড়িয়েছে যে, ‘ক্ষমতার মসনদ ছিলো তার স্বপ্ন। হত্যা ও রক্তপাত ছিলো তার নেশা। অত্যাচার ও ধোঁকাবাজি ছিলো তার পেশা। ক্ষমতার অন্ধ মোহই তাকে মাতিয়ে তুলেছিলো হযরত আলী রা.এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহে। এবং…। আকারে ইনসান, প্রকারে শয়তান- এই হলো আজ তার পেহচান।’

প্রচারণার এই ধূম্রজালে উম্মাহ আজ বিস্মৃত হতে চলেছে যে, হযরত মুআবিয়া রা. হলেন ইসলামি ইতিহাসের প্রথম নৌবহর প্রতিষ্ঠার অনন্য গৌরবের অধিকারী ব্যক্তি, যার সম্পর্কে রাসুলে খোদার সুসংবাদ হলো- আমার উম্মতের প্রথম যে সৈন্যদলটি নৌ-অভিযানে অংশ নিবে তাদের জন্য জান্নাত অপরিহার্য হয়ে যাবে। [বুখারি]

জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলো তার কেটেছে রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে এবং ইসলামি খেলাফতের সীমান্ত সুরক্ষায় নাঙ্গা তলোয়ার হাতে, আরবি ঘোড়ার পিঠে। তরবারির আঁচড় কেটে একদিকে তিনি ইসলামি খেলাফতের সবুজ মানচিত্রে যোগ করে নিয়েছিলেন সাইপ্রাস ও রোডেসিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ সব অঞ্চল, অন্যদিকে নিজের অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের গুণে দ্বিধা-বিভক্ত ইসলামি উম্মাহকে পুনঃঐক্যবদ্ধ করেছিলেন হিলালি ঝাণ্ডার ছায়াতলে।

তিনি ছিলেন ইলম ও আমলের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, ইনসাফ ও বিশ্বস্ততার মূর্ত প্রতীক, ধৈর্য ও সহনশীলতার অনুকরণীয় আদর্শ।

তিনি ছিলেন সেই আলোজিত কাফেলার একজন, যাদের ব্যাপারে আলকোরআনের ভাষ্য হলো- আল্লাহ সন্তুষ্ট তাদের প্রতি। তারাও সন্তুষ্ট আল্লাহর প্রতি। যাদের ব্যাপারে হাদিসের ভাষয় হলো- আমার সাহাবিরা তারকাতুল্য। তিমিরাচ্ছন্ন রাতে আকাশে তারার মেলা দেখে পথহারা পথিক যেমন খুঁজ পায় তার পথ, রাসুলের কোনো সাহাবির অনুসরণ করে আঁধারের অতল সমুদ্রে ডুবে যাওয়া জাতি তেমনই খুঁজে পায় জান্নাতের পথ। কারণ আলোকিত এই কাফেলার সকলেই ছিলেন প্রবৃত্তির মলিনতা থেকে চির পবিত্র। মনবতার কল্যাণে, খোদার রাহে সংগ্রামে তাদের জীবন ছিলো উৎসর্গিত। ইসলামের হেলালি নিশান ওড়াতে যে অবর্ণনীয় নিপীড়ন ও নির্যাতন অম্লানবদনে তারা সয়েছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা চির অতুলনীয়।

অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদের মনভোলান মিষ্টি কথায় প্রভাবিত হয়ে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, হযরত মুআবিয়া রা. সেই কাফেলার একজন, যাদের মতো করে ইমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। ইরশাদ হয়েছে- ‘ইমান আনো তোমরা, যেমন ইমান এনেছে লোকেরা (সাহাবিরা)।’[সুরা বাকারা]। পার্থিব জীবনের মোহে পড়ে মুআবিয়া রা. (নাউযুবিল্লাহ) ইমানহারা হয়ে গিয়েছিলেন- এ কথা কেউ বিশ্বাস করলে তা হবে মহাগ্রন্থ আলকোরআন অস্বীকার করার নামান্তর।

আল্লামা ইবন কাসির রহ. তার সুপ্রসিদ্ধ তাফসিরগ্রন্থে লিখেছেন-হযরত আলী রা. ছিলেন নির্ভুল পথে। তবে মুজতাহিদ হওয়ার কারণে মুআবিয়া রা.ও প্রতিদান লাভ করবেন। এটাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব।

সাহাবিগণ অকপটে এ কথা স্বীকার করতেন যে, খোলাফায়ে রাশেদিন ও মুআবিয়া রা.এর শাসনামলে পার্থক্য ছিলো। প্রিয়নবির হাদিসও এ কথা বলে। তবে তা ছিলো পূর্ণ ও পূর্ণতরের পার্থক্য, উজ্জ্বল ও উজ্জ্বলতরের পার্থক্য। কাদেসিয়ার মহান সেনাপতি হযরত সাদ ইবনে

আবি ওয়াক্কাস রা. বলেন- উসমানের পরে মুআবিয়ার চেয়ে অধিক সুবিচারকারী কাউকে আমি দেখিনি। পরবর্তী যুগের বরেণ্য ব্যক্তিগণও তাঁকে সে চোখেই দেখেছেন। জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আমাশের মজলিসে খলিফাতুল মুসলিমিন উমর ইবনে আব্দুল আযিয রহ.এর ইনসাফ ও সুবিচারের কথা উঠলে তিনি বললেন- উমর ইবনে আব্দুল আযিযের সুবিচারেই তোমরা মুগ্ধ! হযরত মুআবিয়াকে যদি দেখতে তবে তোমাদের কী অবস্থা হতো!! হযরত কাতাদাহ, মুজাহিদ ও আবু ইসহাক রহ.এর মতো বিশিষ্ট তাবেয়িগণ সে যুগের লোকদের সম্বোধন করে বলতেন- হযরত মুআবিয়ার শাসনামল দেখার সৌভাগ্য তোমাদের হলে তোমরা তাকে সুপথপ্রাপ্ত বলে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হতে।

অধুনা যে ইতিহাস আমাদের হাতে পৌঁছেছে, তাতে যেহেতু মারাত্মক রকমের বিকৃতি সাধন করেছে কাফির-বেইমানেরা, তাই ইতিহাস পাঠকের দায়িত্ব, পঠিত ইতিহাস গ্রহণের ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদিসকে মানদণ্ডরূপে ব্যবহার করা। যাতে ভ্রান্তির জালে আটকে গিয়ে ইমানের আলোকচ্ছটায় উদ্দীপ্ত, প্রিয় রাসুলের ঘনিষ্ট সাহাবিগণকে গালমন্দ করার আস্পর্ধা কখনো না হয়। মহানবি সা. বলেছেন- আমার সাহাবিদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আমার মৃত্যুর পরে তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিও না। (তিরমিযি, মিশকাত)

হযরত ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন- যখন তোমরা সেসব লোকদেরকে দেখবে, যারা আমার সাহাবিদেরকে মন্দ বলে, তখন তোমরা তাদেরকে বলে দিবে, তোদের এই অশুভ কাজের ওপর আল্লাহর লানত। [তিরমিযি, মিশকাত]

‘আলোর পথে’র গত ঈদ সংখ্যায় জনাব আনোয়ার হোসেন লালন হযরত মুআবিয়া রা.এর যে চিত্র এঁকেছেন, তার ব্যাপারে শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে যে চরম সীমালঙ্ঘন করেছেন- সত্যিই তা বড় দুঃখজনক। ইমানদীপ্ত মুসলিম সমাজ তার লেখা পড়ে ভারি মর্মাহত। ইসলামের সেবার আড়ালে,

পথপ্রদর্শকের মুখোশ পরে সমাজে ভ্রান্তি ছড়ালে তা যে বড় নিন্দনীয়-এতে নিশ্চয়ই কেউ সন্দেহ পোষণ করবে না। তার বক্তব্য উদ্ধৃত করে লেখার কলেবর বাড়াবো না। কারো ইচ্ছে হলে ঈদ সংখ্যা দেখে নিতে পারেন। প্রিয়নবির স্নেহধন্য এক মহান সাহাবি হযরত আমিরে মুআবিয়া রা.এর শানে তিনি যে গোস্তাখি করেছেন, দুঃসাহস দেখিয়েছেন জেনে- বুঝে তা করে থাকলে এতা তার ইমানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। আর অজ্ঞতাবশত করে থাকলে তার উচিত আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করা ও নিজের ভুল স্বীকার করে পুনরায় কোনো লেখা দেয়া। নিজের জ্ঞান সীমানার বাইরের কোনো বিষ্যে হস্তক্ষেপ না করাই উচিত। তা লেখা পড়ে একজন মানুষও যদি পথভ্রষ্ট হন, আল্লাহ তাআলার কাঠগড়ায় তিনি এর দায় সামলাতে পারবন কি!

পাঠকদের সামনে হযরত মুআবিয়া রা.এর মর্যাদা ও অবস্থান যাতে সুস্পষ্ট হয়, তাই বিষয়টির প্রতি আরেকটু আলোকপাত করা সঙ্গত কনে করছি।

প্রথমেই আমাদেরকে বুঝতে হবে হযরত আলী রা. এবং হযরত মুআবিয়া রা.- উভয়ের ইচ্ছাই ছিলো সৎ এবং উদ্দেশ্য ছিলো মহৎ। সদিচ্ছা নিয়েই তারা মতবিরোধ করেছেন। কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়। হযরত মুআবিয়া রা. ভাবছিলেম, আলী রা. উসমান রা.এর ঘাতকদের বিচারপ্রক্রিয়া কেনো বিলম্বিত করতে চাচ্ছেন? ককীভাবে ঘাতকরা তার সৈন্যবাহিনীতে আশ্রয়-স্থান পাচ্ছে? হযরত উসমান রা.কে যারা শহিদ করেছে, তারা তো প্রশ্রয় পেতে পারে না এক মুহূর্তের জন্যও। এমন সুরাচার অপরাধী-ঘাতক পাপিষ্ঠদের উপস্থিতিতে আমরা কী করে হযরত আলীর খেলাফতের অধীনে অন্তর্ভুক্ত হতে পারি! অপরদিকে হযরত আলী রা. ভাবছিলেন- এতো অধিক সংখ্যক মানুষকে তিনি কীভাবে এখনই ধরে শাস্তি দিবেন? হযরত মুআবিয়া রা. আগে খেলাফত মেনে নিবেন, তারপর ইসলামি সাম্রাজ্যের শাসনকার্য সুসংহত করে অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। সেটা তখন অনেক সহজও হবে।

মূলত দৃষ্টিভঙ্গি ও মতের ভিন্নতার কারণে মহান দুই সাহাবির মাঝে সংঘটিত হয় যুদ্ধ। ক্ষমতার মোহে পড়ে মুআবিয়া রা. যুদ্ধে লিপ্ত হননি। বিকৃত ইতিহাসকে কোরআন-হাদিসের কষ্টিপাথপরে যাচাই করার যোগ্যতা যাদের নেই, ইতিহাস নিয়ে কথা বলার কোনো অধিকারই তাদের নেই। অযথা নিজের ইমান বিকিয়ে জাহান্নামের পথে পা বাড়ানো কি চরম নির্বুদ্ধিতা নয়!

পরিশেষে সম্পাদকমণ্ডলীর উদ্দেশে কয়েকটি কথা লিখছি। আজেবাজে লেখকদের লেখা ছেপে ‘আলোর পথে’র শুভযাত্রা ব্যাহত করা উচিত হবে না বলে আমরা মনে করি। ইসলামি পত্রিকা নাম বহন করে ভেতরে ইসলামেরই অনিষ্ট সাধন করাটা কেমন! ‘কারবালার কান্না’ উপন্যাসটি ছেপে মুসলিম জনতার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটানোর হেতু কী? আশা করি, এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পাঠক-হৃদয়কে শান্ত করা হবে। নয়তো বাংলাদেশের মুসলমানরা ‘আলোর পথে’র ব্যাপারে নতুন করে কিছু ভাবতে বাধ্য হবে। ‘আলোর পথে’ হোক আলোর পথের প্রদর্শক- এই প্রত্যাশায়...।

ইসলামি রাষ্ট্রনীতি - ১ (‘দারুল ইসলাম’, ‘দারুল হারব’ এবং ‘হারবি’র পরিচয়)

ALI HASAN OSAMA·THURSDAY, MARCH 16, 2017

দারুল ইসলামের সংজ্ঞা ও পরিচয়

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, “দারুল ইসলাম— এমন ভূমি, যা মুসলমানদের শাসনাধীন। ইসলামের আহকাম ও বিধিবিধান যেখানে প্রতিষ্ঠিত।

মুসলমানরা নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে। (হাকিম শহিদ রহ. ‘আলকাফি’ গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে তা বর্ণনা করেছেন।) তার অধিবাসীরা সবাই মুসলমান, কিবা সবাই ইসলামের শাসনব্যবস্থা মান্যকারী অমুসলিম (যিম্মি) কিবা উভয় গোষ্ঠীরই উপস্থিতি— এর সবই সমান; সর্বাবস্থায়ই তা দারুল ইসলাম।

ইসলাম আসার আগে তো আর দারুল ইসলাম বলতে কিছু ছিলো না। সব ছিলো দারুল হারব। তো এই দারুল হারব কীভাবে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয় — আসুন, সে বিষয়টা জেনে নেই। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর ‘আসসিয়ারুল কাবির’ এবং সারাখসি রহ. প্রণীত তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের আলোকে প্রতিভাত হয়— দারুল হারব তিনভাবে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়।

১. দারুল হারবের কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের শহরেই অবস্থান করে, তবে তাদের ইসলাম গ্রহণের সময় থেকে তা দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। [শরহুস সিয়ারিল কাবির, সারাখসি— ১/২৪৯-২৫০]

তেমনি যদি মুশরিকরা তা বিজয় করে নেয় এরপর মুসলমানরা পুনরায় তা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়, এবং মুশরিকরাও সেখান থেকে বিতাড়িত হয়, আর মুসলমানরাও সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, তবে তা দারুল ইসলাম হিসেবেই পরিগণিত হবে। কেননা যখন মুশরিকরা তার কবজা নিয়ে নিয়েছিলো, তখন তা দারুল হারব হয়ে গিয়েছিলো। এরপর যখন মুসলমানরা তা বিজয় করে নিলো এবং সেখানে বসবাসের সংকল্প করলো, তখন পুনরায় তা দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছে। [প্রাগুক্ত; আলআহকামুস সুলতানিয়া, মাওয়ারদি— ১৩৭]

২. দারুল হারবের কোনো ভূমি বিজয় এবং তার ওপর ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়নের ঘোষণার মাধ্যমেও দেশ দারুল ইসলাম হয়। সারাখসি রহ. বলেন, “মুসলমানরা যদি শত্রুদের কোনো ভূমি বিজয় করে এবং তাদের

পূর্ণ দখলে আসে, হারবি অধিবাসীরা পলায়ন করে, তবে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা তা দারুল ইসলাম হয়ে যাবে।”

আল্লামা হাসকাফি রহ. বলেন, “এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই যে, ইসলামের কিছু আহকাম-বিধান প্রতিষ্ঠা করার দ্বারাই দারুল হারব দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।’’ [আদদুররুল মুনতাকা শরহুল মুলতাকা— ১/৬৩৮]

বোঝা গেলো, ইসলামি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত না হলে শুধু দেশ বিজয়ের দ্বারাই তা দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে না। তেমনি হারবিরা পূর্ণরূপে বিতাড়িত না হলে, তাদের ক্ষমতা-প্রতাপ পরিপূর্ণ বিদূরিত না হলে তা দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা ইসলামি ভূমি হওয়ার জন্য প্রথমে কুফরের মূলোৎপাটন জরুরি। [শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৩/১০০৪-১০০৬, ৪/১২৫৩, ১২৫৭; আলমাবসুত— ১০/২৩, ১১৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া— ২/২৩২; ফাতাওয়া বাযযাযিয়া (হিন্দিয়ার ষষ্ঠ খণ্ডের টীকায়)— ৩/৩১১-৩১২]

সারাখসি রহ. এর কথায় ফিরে যাই। এরপর তিনি বলছেন, “মুসলমানদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশ দারুল ইসলাম হয়ে যাবে। মুশরিকদের ওপর মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তারা ‘যিম্মি’ বলে গণ্য হবে।” (আর হারবি থাকবে না।)।
[শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৫/২১৬, ২১৯১, ২১৯৭; আলমাবসুত— ১০/২৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া— ২/২৩২; আদদুররুল মুখতার— ৪/১৭৫; আদদুররুল মুনতাকা— ১/৬৩৪; রাওযাতুত তালিবিন— ৫/৪৩৩; তুহফাতুল মুহতাজ— ৯/২৬৯]

বোঝা গেলো, কোনো দেশ দারুল ইসলাম হতে পারে; যদিও তার সকল নাগরিক অমুসলিম। কেননা তাতে ইসলামের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। নাগরিকরা অমুসলিম হলেও রাষ্ট্র ইসলামি শাসনক্ষমতার অধীন রয়েছে।

এজন্যই ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, “যদি মুসলমানদের কোনো সৈন্যদল দারুল হারবে প্রবেশ করে এবং খলিফার পক্ষ থেকে নির্ধারিত কোনো আমিরের তত্ত্বাবধানে তারা থাকে, তখন তারা দারুল হারবের কোনো শহরে ঢুকে তাদের সামনে ইসলাম উপস্থাপন করে, আর তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন মুসলিম সৈন্যদল তাদেরকে জিযয়া প্রদান করতে নির্দেশ দেয়, আর তারাও এ আহ্বান মেনে নেয়...এবং তারা বলে, তোমরা আমাদেরকে এই ‘আহদ’ দাও যে, আমরা স্থায়ীভাবে এই ভূমিতেই থাকবো। এরপর যতোক্ষণ মুসলমানরা তাদের সঙ্গে বাস করবে, তারা হারবিদের ওপর শক্তিশালী এবং হারবিরাও তাদের থেকে নিবৃত্ত থাকবে, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই যে, আমির তাদেরকে ‘যিম্মি’ বানিয়ে নিবে এবং তাদের ওপর একজন আমির নির্ধারণ করে দিবে, যিনি তাদের ওপর ইসলামের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবেন, তাদের ওপর ইসলামের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার দ্বারাই তারা ‘যিম্মি’ এবং দেশ দারুল ইসলাম হিসেবে সাব্যস্ত হবে।...যদি মুসলমানরা যিম্মিদের সহযোগিতা ছাড়া ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হয়, তবে আমির তাদের ‘যিম্মা’ চুক্তি গ্রহণ করবেন না। কেননা যখন যিম্মিদের সাহায্য-সন্তুষ্টি ছাড়া মুসলমানরা ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হবে, তখন আদতে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করছে যিম্মিরা; (মুসলমানরা নয়) অথচ ইসলামের বিধিবিধান প্রয়োগ করবে একমাত্র মুসলিমরা।” [আসসিয়ারুল কাবির মা’আ শরহিস সারাখসি— ৫/২১৯১-২১৯৩; মাজমাউল আনহুর— ১/৬৫৯; আহকামুদ দিয়ার— ১৮-২০;]

এর আলোকে বলা যায়, যেসব দেশে ইসলামি শাসনব্যবস্থা নেই, যদিও তাতে মুসলমানরা ওয়াজ-মাহফিল, ইদ-জামাআত ইত্যাদি আদায় করতে পারে, তা দারুল ইসলাম হিসেবে পরিগণিত হবে না। [মাজাল্লাতুল কানুন ওয়াল ইকতিছাদ, যিলহজ সংখ্যা, ১৩৫৪ হিজরি, পৃ. ২০৩, তা’লিক- ১]

৩. ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, যদি যিম্মিরা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে তাদেরকে পরাজিত করে দারুল

ইসলামের দখল নিয়ে নেয়, তবে তাদের শাসন চলতে পারে, যদি মুসলমানরা পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে সেখানে বাস করতে পারে। কেননা এক্ষেত্রে তা দারুল হারব হয়ে যায়নি। দেখছো না, মুসলমানরা সেখানে নিরাপদ! এটা আদতে দারুল ইসলামই, যদিও আজ তার এই অবস্থা। [কিতাবুল আসল, সিয়ার অধ্যায়, ইমাম মুহাম্মাদ— ২১৭]

আল্লামা সারাখসি রহ. বলছেন, যেখানে মুসলমানরা নিরাপত্তার সাথে বাস করতে পারে না, তা দারুল হারবের অন্তর্ভুক্ত। কেননা দারুল ইসলাম সেই ভূখণ্ড, যা মুসলমানদের হাতে রয়েছে। আর এর বাহ্যিক আলামাতই হলো মুসলমানদের যথাযোগ্য নিরাপত্তা। [শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৪/১২৫৩; আলমাবসুত— ১০/৯৩, ১১৪]

হাকিম শহিদ রহ. বলেন, “দারুল ইসলাম— যাতে মুসলমানদের শাসকের ক্ষমতা চলে।”

দারুল ইসলাম সম্পর্কে আরো জানতে দেখুন— বাদায়িউস সানায়ি— ৯/৪৩৭৪; আদদুররুল মুনতাকা— ১/৬৩৪; কাশশাফ— ২/২৫৬; আলকুল্লিয়্যাত, কাফাবি— ২/৩৪১; আলমুকাদ্দিমাতুল মুমাহহিদাত— ২/১৫৩; উসুলুদ দীন — ২৭০; নিহায়াতুল মুহতাজ— ৮/৮২; আসনাল মাতালিব— ৪/২০৪; আলমু’তামাদ ফি উসুলিদ দীন— ২৭৬; আহকামু আহলিয যিম্মাহ— ১/৫; আততাশরিউল জিনায়ি— ১/২৭৫-২৭৬]

দারুল হারবের পরিচয়

দারুল হারব— মানে যুদ্ধবিদ্ধস্ত বা যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্র নয়। অনেকে ভাবেন, দারুল হারব শুধু এমন রাষ্ট্রকেই বলা হয়, যা কোনো মুসলিম ভূখণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। বাস্তবতা এমন নয়। কোনো ভূখণ্ডে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হয় (বিস্তারিত জানতে পূর্বের পোস্ট দ্রষ্টব্য) আর কোথাও কুফরি এবং শিরকি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে তাকে দারুল হারব বলা হয়। দারুল হারবকে অন্য শব্দে— দারুল কুফর, দারুশ শিরক ইত্যাদিও বলা হয়। এসব পরিভাষার মাঝে কোনো বিরোধ নেই। ফকিহগণ দারুল হারবের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। এজন্যই সারাখসি রহ. বলেন, “দারকে আমাদের দিকে বা তাদের দিকে নিসবত করাটা মূলত ক্ষমতা এবং প্রাধান্যতার বিচারে।’’ [আলমাবসুত, সারাখসি— ১০/১১৪]

এ বিষয়টাকেই আল্লামা কাসানি রহ. আরো বিস্তারিত করে এভাবে বলেছেন, “কোনো রাষ্ট্রে কুফরের আহকাম-বিধিবিধান প্রকাশিত হলে তা দারুল কুফর হয়ে যায়।... রাষ্ট্র শুধু কুফরের বিধানাবলী প্রকাশিত হওয়ার দ্বারাই দারুল কুফর বলে গণ্য হয়।” [বাদায়িউস সানায়ি— ৯/৪৩৭৫; আরো দেখুন— আহকামুদ দিয়ার, আবিদ সুফয়ানি— ১৫]

বোঝা গেলো, কোনো রাষ্ট্র দারুল হারব (অন্য শব্দে— দারুল কুফর, দারুশ শিরক) হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য লড়াই-যুদ্ধ চলমান থাকা অপরিহার্য নয়। এজন্যই হাম্বলি ফকিহগণ বলেন, “হারবি শব্দটা হারবের দিকে সম্পর্কিত। হারব অর্থ— কিতাল (লড়াই), তেমনি এর অর্থ দূরত্ব এবং বিদ্বেষও। তো দারুল হারব অর্থ হলো এমন রাষ্ট্র, যার সাথে মুসলমানদের দূরত্ব কিবা মুসলমানদের প্রতি রয়েছে যার বিদ্বেষ। হারবিকে হারবি এই দ্বিতীয় অর্থ, তথা দূরত্ব এবং বিদ্বেষ— এর বিচারেই বলা হয়। কার্যত যুদ্ধে লিপ্ত থাকা জরুরি নয়। [আলমুতলি’ আলা আবওয়াবিল মুকনি’, বা’লি— ২২৬]

দারুল হারবের সংজ্ঞা

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, “দারুল হারব এমন ভূখণ্ড, যেখানে শিরকের বিধিবিধান প্রকাশিত এবং যার ওপর হারবিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত।” [আসসিয়ারুল কাবির মা’আ শারহিস সারাখসি— ১/২৫১; ৪/২০৭০, ২১৯৭; আলমাবসুত— ১০/১১৪; বাদায়িউস সানায়ি— ৯/৪৩৭৫; আদদুররুল মুনতাকা— ১/৬৩৪; মাজমাউল আনহুর— ১/৬৫৯]

এজন্যই তিনি বলেন, “দারুল হারবের কোনো রাষ্ট্রের সাথে যদি মুসলমানরা এ মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, সেখানে তারা ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত করবে না, তবে তা দারুল হারব (-ই থেকে যাবে)।” সারাখসি রহ. এর ইল্লত (কারণ) বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, “কেননা কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হয় সেখানে ইসলামের বিধিবিধান প্রয়োগ করার দ্বারা। উল্লিখিত ভূখণ্ডে তো মুসলমানদের বিধানাবলী প্রয়োগ করা হয়নি। তাই তা দারুল হারব থাকবে।” তিনি বলেন, “দারুল হারব তা-ই— যেখানে কাফিরদের বিধান চলে।” [শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৫/২১৬৫; আলমাবসুত— ১০/১১৪]

তিনি আরো বলেন, “যে স্থানে মুসলমানরা নিজেদের ব্যাপারে নিরাপদ নয়, তা দারুল হারব। কেননা দারুল ইসলাম তা-ই, যা মুসলমানদের শাসনাধীন। আর এর বাহ্যিক নিদর্শন হচ্ছে, সেখানে মুসলমানরা নিরাপদে বাস করে।” [শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৪/১২৫৩]

এজন্যই অনেক হানাফি ফকিহ এভাবে বলেছেন, “দারুল হারব তা, যেখানে কোনো কাফির রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ চলে কিবা যেখানকার মুসলমানরা কাফিরদের ভয়ে ভীত থাকে। [আদদুররুল মুনতাকা— ১/৬৩৪; কাশশাফুল ইসতিলাহাত— ২/২৫৬; আলকুল্লিয়্যাত— ২/৩৪১]

জমহুর ফকিহগণ দারুল হারবের সংজ্ঞা এভাবেই দিয়েছেন। ইমাম মালিক রহ. বলছেন— “মক্কা সেসময়ে দারুল হারব ছিলো; কেননা সেখানে তখন জাহিলিয়্যাতের বিধান কার্যকর ছিলো।” [আলমুদাওয়ানা, রিওয়ায়াতু সুহনুন— ২/২২]

মালেকি, শাফেয়ি, হাম্বলি— সবার বক্তব্য প্রায় একই ধরনের। [দেখুন — প্রাগুক্ত; আলমুকাদ্দিমাতুল মুমাহহিদাত— ২/১৫১; ফাতাওয়াশ শায়খ আলিশ— ১/৩৭৭; উসুলুদ দীন, বাগদাদি— ২৭০; আলইকনা’ মাআ কাশশাফিল কিনা’— ৩/৩৮; আলমুকনি’ মাআল ইনসাফ— ৪/১২১; আলমুবদি’— ৩/৩১৩; আলফুরু’— ৬/১৯৭; আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ— ১/২১৩]

মুতাআখখিরিনদের মধ্যে উস্তাদ আব্দুল কাদির আওদা সুন্দর লিখেছেন, “দারুল হারব প্রত্যেক এমন অনৈসলামিক রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা মুসলমানদের শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রবেশ করেনি, কিবা যেখানে ইসলামের বিধান প্রকাশিত নয়। এ রাষ্ট্রগুলো একই সরকারের পরিচালনাধীন থাক কিবা ভিন্ন ভিন্ন সরকারের— সবই সমান। তার স্থায়ী নাগরিকদের মাঝে মুসলমানরা থাকা বা না থাকা সবই সমান; যতোদিন তারা ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে অক্ষম থাকে।” [আততাশরিউল জিনায়িল ইসলামি— ১/২৭৭]

হারবির পরিচয়

অনেকের ধারণা, হারবি তাকেই বলে, যে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। শব্দ থেকেও অনেকটা এ সংশয় হয়। তবে ফকিহগণের পরিভাষায় হারবি তিন শ্রেণি—

১. যারা বাস্তবে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে যারা পৃথিবী থেকে বিতাড়িত করার প্রয়াসে সর্বদা তৎপর।

২. যারা বিভিন্নভাবে মুসলমানদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে রেখেছে। তাদেরকে হয়রানি করে। জান-মাল-সম্ভ্রম লুট করে। অর্থনৈতিকভাবে মুসলমানদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে রাখে। কিবা মুসলমানদেরকে তাদের দীন থেকে ফেরানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত। অথবা যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত, তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করে।

৩. যারা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধেও লিপ্ত নয়, যারা যুদ্ধে লিপ্ত তাদেরও সহযোগী নয়, কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে তাদের কোনোপ্রকার 'আহদ' নেই।

উপরিউক্ত তিনও শ্রেণিই ফকিহগণের পরিভাষায় হারবি। হারবি হওয়ার জন্য হারবে (যুদ্ধে) লিপ্ত থাকা আবশ্যক নয়।

বাদায়িউস সানায়িঃ ৯/৪৩৭৫; আলমিসবাহুল মুনিরঃ ১/১২৭; আদদুররুন নাকি ফি শরহি আলফাযিল খিরাকি, ইবনে আব্দিল হাদিঃ ৩/৭৪৪; আদদুরারুস সানিয়্যাহ ফিল আজওয়িবাতিন নাজদিয়্যাহঃ ৭/৩৯৭; আলইসতিআনা বি গাইরিল মুসলিমিনঃ ১৩২; উসুলুল আলাকাতিদ দুওয়ালিয়্যাহঃ ৩১৩।

চলবে ইনশাআল্লাহ...

ইসলামি রাষ্ট্রনীতি - ২ (দারুল ইসলাম কীভাবে দারুল হারবে রূপান্তরিত হয়?)

ALI HASAN OSAMA·FRIDAY, MARCH 17, 2017

দারুল ইসলাম কীভাবে দারুল হারবে রূপান্তরিত হয়?

পূর্বের লেখায় আমরা আলোচনা করেছি, দারুল হারব কীভাবে দারুল ইসলামে পরিণত হয়। সেখানে আমরা বলে এসেছি, কোনো ভূখণ্ডে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠা করার দ্বারাই তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়। আর এটাই উম্মাহর সর্বসম্মত মত। [দেখুন— বাদায়িউস সানায়ি— ৯/৪৩৭৪; আদদুররুল মুনতাকা— ১৬৩৪; আলফাতাওয়াল বাযযাযিয়া— ৩/৩১২; আলফাতয়াল হিন্দিয়া— ২/২৩২]

আজকের এ লেখায় আমরা আলোচনা করবো, দারুল ইসলাম পুনরায় কীভাবে দারুল হারবে রূপান্তরিত হয়। তার আগে আমরা জেনে নেই, দারুল ইসলামের ওপর আপতিত অবস্থা মৌলিকভাবে তিন ধরনের।

১. হারবিরা কোনো ইসলামি ভূখণ্ড দখল করে সেখানে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২. কোনো ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকরা মুরতাদ হয়ে নিজেদের শহরের ওপর দখলারোপ করেছে এবং সেখানে কুফরি শিরকি বিধান প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৩. ইসলামি রাষ্ট্রের ‘যিম্মি’রা তাদের ‘যিম্মা চুক্তি’ ভঙ্গ করে কোনো দেশ বা শহরের ওপর নিজেদের প্রভাব ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন— কিতাবুল আসল, ইমাম মুহাম্মাদ, কিতাবুস সিয়ার— ২১৭-২২০; শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৫/১৯১৪, ১৯৪১; আলজামিউস সগির— ২৪৯; আলমাবসুত— ১০/১১৩-১১৪; বাদাইউস সানায়ি’— ৯/৪৩৭৬; মুখতাসারুত তহাবি— ২৯৪; আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া— ২/২৩২; ফাতাওয়া কাজিখান— ৩/৫৮৪; ফাতাওয়া শামি— ৪/১৭৪; আলবাহরুর রায়িক— ৩/২৩০-২৩১; আলফুরুক, কারাবিসি— ১/৩৪০; আলআহকামুস সুলতানিয়া, মাওয়ারদি— ১৩৮; আলিফসাহ, ইবনে হুবায়রা— ২/২২৯-২৩০; রহমাতুল উম্মাহ, দিমাশকি— ৩৫২]

এবার আমরা উম্মাহর ফকিহগণের বক্তব্য দেখি। তারা এক্ষেত্রে কী অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আলোচিত মাসআলায় আমরা উম্মাহর ফকিহগণের দু’ধরনের বক্তব্য পাই। আরো স্পষ্ট করে বললে, আলোচিত মাসআলায় ইমামগণের দু’মাযহাব। প্রথম মাযহাব তিন ইমাম— অর্থাৎ, ইমাম মালিক রহ., ইমাম শাফেয়ি রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. এবং সাহেবাইন— অর্থাৎ, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর। আর দ্বিতীয় মাযহাব শুধু ইমাম আবু হানিফা রহ. এর। প্রথমে আমরা সবিস্তারে উভয় মাযহাব উল্লেখ করছি।

প্রথম মাযহাব

প্রথম মাযহাব— কোনো ভূখণ্ড তখন দারুল হারব বলে গণ্য হয়, যখন সেখানে কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। চাই তা দারুল হারবের প্রতিবেশী রাষ্ট্র হোক কিংবা দারুল হারবের সাথে তার প্রতিবেশিত্ব-সংলগ্নতা না থাক, তার মুসলমান কিবা যিম্মি নাগরিকরা পূর্বের নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত থাক কিবা না— সর্বাবস্থায় তা দারুল হারব হিসেবে গণ্য হবে।

বিগত লেখায় আমরা আল্লামা সারাখসি রহ. এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি— দারকে মুসলমানদের দিকে অথবা কাফিরদের দিকে নিসবত করাটা মূলত ক্ষমতা এবং প্রাধান্যতার বিচারে। তাই প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড, যেখানে শিরকের বিধান প্রকাশিত, সেখানে শক্তি ও ক্ষমতা মুশরিকদের হাতে। তাই তা দারুল হারব। আর প্রত্যেক এমন স্থান, যেখানে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত, সেখানে শক্তি ও ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে। তাই তা দারুল ইসলাম।

[সাহিবাইনের মাযহাব জানার জন্য দেখুন— শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৫/১৯১৪; কিতাবুল আসল, কিতাবুস সিয়ার— ২১৭; আলমাবসুত— ১০/১১৪; জামিউল ফুসুলাইন— ১/১৩; ফাতাওয়া কাজিখান— ৩/৫৮৪; আলফাতাওয়াল বাযযাযিয়া— ৩/৩১১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া— ২/২৩২; ফাতাওয়া শামি— ৪/১৭৪-১৭৫; আদদুররুল মুনতাকা— ১/৬৩৪; মুলতাকাল আবহুর— ১/৬৫৯-৬৬০; জামিউর রুমুযের হাওয়ালায় কাশশাফুল ইসতিলাহাত— ২/২৫৬; ফিকহুল মুলুক— ১/৪৬২-৪৬৩]

[অন্যান্য ইমামগণের মাযহাব জানতে দেখুন— আলমুদাওয়ানা— ২/২২; আলমুকাদ্দিমাতুল মুমাহহিদাত— ২/১৫১; ফাতাওয়াশ শায়খ আলিশ— ১/৩৭৭; আলমুগনি— ৬/৪০৩-৪০৪; আলইনসাফ— ৪/১২১; কাশশাফুল কিনা’— ৩/৩৮; আলইফসাহ— ২/২৩০; রহমাতুল উম্মাহ— ৩৫২; আহকামুদ দিয়ার, ড. আবিদ সুফয়ানি— ৪৩]

প্রথম মাযহাবের প্রমাণ

১. এই মাসআলাকে মূলত দারুল হারব দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হওয়ার মাসআলার ওপরে কিয়াস করা হয়েছে। (বিস্তারিত জানতে পূর্বের পোস্ট দ্রষ্টব্য)। যেমনিভাবে ইসলামি বিধান প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা দারুল হারব দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়; যদিও সেখানে কাফিরদের অবস্থান রয়ে যায় এবং তা ইসলামি রাষ্ট্র সংলগ্ন না হয়— অর্থাৎ তার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র দারুল ইসলাম না হয়ে অন্য কোনো দারুল হারব হয়, তবুও সবার মতেই তা দারুল ইসলাম হিসেবেই গণ্য হয়, তেমনিভাবে দারুল ইসলামেও যখন কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সেখানে মুসলমান থাকলেও এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হলেও তা দারুল হারব হিসেবেই গণ্য হবে। (মুজমা’অ আলাইহি মাসআলার ওপর কিয়াস)। [প্রাগুক্ত]

২. আল্লামা কাসানি রহ. বলেন, “এর ইল্লত হলো, আমাদের দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফর বলা— এগুলো তো দারকে (ভূখণ্ড) ইসলাম এবং কুফরের দিকে নিসবত করা। আর দারকে তো ইসলাম এবং কুফরের দিকে নিসবত করা হয়, তাতে ইসলাম কিবা কুফর প্রতিষ্ঠিত থাকার বিচারে। যেমন— জান্নাতকে ‘দারুস সালাম’ নামে নামকরণ করা হয়, তাতে ‘সালাম’ (শান্তি) থাকার কারণে। তেমনি জাহান্নামকে ‘দারুল বাওয়ার’ নামে অভিহিত করা হয়, যেহেতু তাতে ‘বাওয়ার’ (ধ্বংস) রয়েছে। ইসলাম এবং কুফর প্রতিষ্ঠিত হয় তার বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা। যখন কোনো ভূখণ্ডে কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা দারুল কুফর হয়ে যায়। তাই এই নিসবত সহিহ। এজন্য ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠা লাভের দ্বারাই কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হয়; এই একটি মাত্র শর্ত ছাড়া আর কোনো শর্ত নেই। এমনিভাবে কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই দারুল ইসলাম দারুল কুফরে পরিণত হয়।” [বাদায়িউস সানায়ি’— ৯/৪৩৭৫; আলজারিমাহ ওয়াল উকুবাহ, আবু যুহরা— ৩৪১; ফাতাওয়াল ইমাম রাশিদ রেযা— ১/৩৭৩]

তাতাররা যখন ইসলামি ভূখণ্ডের কিছু দেশ দখল করে নেয়, তখন একদল ফকিহ এর আলোকেই ফতোয়া দিয়েছেন। আল্লামা ইবনু নুজাইম রহ. এর বক্তব্য দেখুন—

“তাতারদের ব্যাপক ফেতনার পরে এই যে জায়গাগুলো, যা দখলে নিয়ে তারা সেখানে তাদের বিধিবিধান প্রয়োগ করেছে, যেমন— খুওয়ারিজম, মা ওয়ারাউন নাহর, খোরাসান প্রভৃতি, ‘যাহিরুর রিওয়ায়াত’ অনুযায়ী দারুল হারবে পরিণত হয়েছে।” [আলবাহরুর রায়িক— ৩/২৩০-২৩১; হাশিয়াতু তাবয়িনিল হাকায়িক, শিলবি— ৩/২৮৫]

দ্বিতীয় মাযহাব

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. যাহিরুর রিওয়াহর অন্যতম কিতাব ‘আযযিয়াদাতে’ ইমামে আজম আবু হানিফা রহ. এর অভিমত বর্ণনা করেন—

তিনটি শর্ত সম্মিলিতভাবে পাওয়া গেলেই দারুল ইসলাম দারুল হারবে রূপান্তরিত হবে। শর্ত তিনটি হলো—

১. এসব দেশে প্রচার-প্রসিদ্ধির সাথে কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তা এভাবে হবে যে, শাসক কাফিরদের সংবিধান-নীতির আলোকে দেশ শাসন করবে, (ইসলামের নির্দেশনা জেনে বাস্তবায়ন করার জন্য) মুসলমান বিচারকদের কাছে ধর্না দিবে না। মুসলমানদের মাঝে ইসলামের বিধানানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করবে না। তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া আইনকানুন হবে অনৈসলামিক আইনকানুন। মুসলমানদের ওপর আরোপিত বিধিবিধান হবে ইসলামের নির্দেশিত বিধিবিধানের সাথে বিরোধপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক। যেমন— ইসলাম সুদকে করেছে হারাম। চাপিয়ে দেয়া আইন তা

বৈধ করে দিবে। পবিত্র কোরআন ব্যভিচারকে করেছে হারাম, আর আরোপিত বিধান তার বৈধতা দিয়ে দিবে। তেমনি মদ, শূকর, জুয়া— ইসলাম করেছে হারাম, আর কার্যকর আইনের আলোকে এগুলো সবই পেয়ে যাবে বৈধতার মর্যাদা।

এর আলোকে অনুমিত হয়, দেশে যদি একই সাথে ইসলামি বিধান এবং কুফরি বিধান জারি করা হয়, তবে দারুল ইসলাম দারুল হারব হিসেবে গণ্য হবে না; যেমনটা আল্লামা ইবনে আবিদিন শামি রহ.ও বলেছেন।

২. দেশটি দারুল হারব সংলগ্ন, তার সাথে লাগোয়া এবং দারুল হারবের প্রতিবেশি রাষ্ট্র হতে হবে। তার মাঝে এবং দারুল হারবের মাঝে কোনো ইসলামি ভূখণ্ড অন্তরায় হতে পারবে না, যার থেকে মুসলমানদের সাহায্য আসতে পারে। কোনো দেশকে যদি চারিদিক থেকে ইসলামি রাষ্ট্র ঘিরে রাখে, আর তার ওপর কারো ক্ষমতা নাও থাকে, তখনও তা অনৈসলামিক ভূখণ্ড হিসেবে গণ্য হবে না।

আল্লামা ইবনে আবিদিন শামি রহ. বলেন, “এর আলোকে তো প্রতিভাত হয় যে, সমুদ্র কোনো অন্তরায় নয়। এরপর তিনি দু’দল ফকিহের অভিমত নকল করেন। প্রথম দল বলছেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের হুকুম দারুল হারবের হুকুমে। অপর দল বলছেন, সমুদ্র কোনো গোষ্ঠীরই নয়; যেহেতু তার ওপর কারো ক্ষমতাই কার্যকর নয়।”

শামি রহ. আরো বলেন, “এর মাধ্যমে প্রতিভাত হয় যে, ‘বিলাদুশ শামের’ অধীনে যে ‘জাবালু তাইমিল্লাহ’, যার অপর নাম ‘জাবালে দারুয’ এবং তার অনুগামী আরো কিছু শহর— এগুলো সব দারুল ইসলাম। কেননা যদিও এসব শহরের শাসক দারুয বা নাসারা এবং তাদের ধর্মীয় বিচারকও রয়েছে, যারা তাদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে, তাদের কেউ কেউ তো প্রকাশ্যে ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে গালমন্দ-কটুক্তি করে; কিন্তু তারা সকলেই আমাদের মুসলিম শাসকদের ফায়সালার অধীনস্থ।

দারুল ইসলাম চতুর্দিক থেকে তাদের এলাকাগুলোকে বেষ্টন করে রেখেছে। মুসলমান শাসকগণ যখনই তাদের মাঝে আমাদের বিধান বাস্তবয়িত করতে চাইবেন, তখন তা করতে পারবেন।”

৩. সেখানে কোনো মুসলিম কিবা কোনো যিম্মি মুসলিম শাসক প্রদত্ত পূর্বের আমান (নিরাপত্তা) –এর মাধ্যমে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত থাকবে না। অর্থাৎ কাফিরদের আক্রমণের পূর্বে মুসলমান তার ইসলামের কারণে এবং যিম্মি তার যিম্মা চুক্তির মাধ্যমে মুসলিম সরকারের পক্ষ থেকে যে আমান (নিরাপত্তা) লাভ করেছিলো, তা হারিয়ে যাওয়া। এখন তারা যদি নিরাপত্তাপ্রাপ্তও থাকে, তবে তা মুশরিকদের তরফ থেকে প্রদত্ত নিরাপত্তা; মুসলমানদের পক্ষ থেকে নয়।

আরো স্পষ্ট করে বলা হলে, মুসলমান কিবা যিম্মিরা এখন এই ভূখণ্ডে অবস্থান করা এবং নিরাপত্তা লাভ করাটা তারা ইসলামের অনুসারী এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নয়; বরং তাদের অবস্থানের বৈধতা ও নিরাপত্তা এই অঞ্চলের নতুন হারবি শাসকের সাথে কৃত ‘আহদে’র মাধ্যমে। ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়ে তারা এখন অনৈসলামিক শক্তির অধীনে। [প্রাগুক্ত এবং ফিকহুল মুলুক— ১/৪৬৩]

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর প্রমাণ

১. হুকুম যখন কোনো ইল্লতের (Cause) মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়, তো যতোক্ষণ ইল্লতের কিছু অংশও বাকি থাকে, তার কারণে হুকুমও বাকি থাকে। তাই যেহেতু কোনো ভূখণ্ড ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হয়, তো যতোক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের কিছু বিধান এবং কিছু নির্দেশনা জারি থাকবে, সেই পর্যন্ত তা দারুল ইসলাম হিসেবেই গণ্য হবে। [জামিউল ফুসুলাইন— ১/১৩]

২. আল্লামা কাসানি রহ. বলেন, “ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্যের কারণ হলো, দার (ভূখণ্ড) কে ইসলাম এবং কুফরের দিকে নিসবত করার দ্বারা আসলে তো ইসলাম কিবা কুফর –এর হাকিকত উদ্দেশ্য নয়। (ভূখণ্ড তো আর মুসলমান বা কাফির হয় না)। উদ্দেশ্য হলো আমান (নিরাপত্তা) এবং খাওফ (ভীতি)।

এর অর্থ হলো, যদি সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য আমান (নিরাপত্তা) থাকে, আর কাফিরদের জন্য স্বাভাবিকভাবে খাওফ (ভীতি) থাকে (পূর্ণ নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য আলাদা চুক্তি করতে হয়), তাহলে তা দারুল ইসলাম। আর যদি সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য খাওফ (ভীতি) থাকে আর কাফিরদের জন্য স্বাভাবিকভাবে থাকে আমান (নিরাপত্তা), তাহলে তা দারুল কুফর। হুকুমের ভিত্তি হলো আমান এবং খাওফ (নিরাপত্তা এবং ভীতি) –এর ওপর, হাকিকি ইসলাম এবং কুফরের ওপরের নয়। তাই আমান এবং খাওফকেই বিবেচনায় নেয়াটা উত্তম। তো যতোক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করতে হবে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত সাধারণভাবে আমান রয়েছে ধরা হবে। তাই তা দারুল কুফরে পরিণত হবে না।

তেমনিভাবে সাধারণ নিরাপত্তা তখনই বিনষ্ট হওয়া সম্ভব, যখন সে অঞ্চলটা দারুল হারব সংলগ্ন হবে। তাহলে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য দুটো বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল— আমান (নিরাপত্তা) নষ্ট হওয়া এবং দারুল হারবের সংলগ্ন অঞ্চল হওয়া।

‘দার’কে ইসলামের দিকে নিসবত করার হেতু (Cause)— সেটাও হতে পারে যা সাহিবাইন বলেছেন (সাহিবাইনের মাযহাবের প্রমাণ দ্রষ্টব্য), আর তাও হতে পারে যা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর পক্ষে আমরা বলছি। অর্থাৎ সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য নিরাপত্তা সাব্যস্ত থাকা। কাফিরদের জন্য নিরাপত্তা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য আলাদা ‘যিম্মাহ চুক্তি’ কিবা ‘ইস্তিমান চুক্তি’ প্রয়োজন। (বিস্তারিত বিবরণ সিরিজের অন্য লেখায় আসবে ইনশাআল্লাহ।)

দারকে ইসলামের দিকে নিসবত করার হেতু যদি তা হয়, যা সাহিবাইন বলেছেন, তাহলে কোনো অঞ্চল দারুল কুফর হিসেবে গণ্য হবে সেই কারণে, যা তারা বলেছেন। আর যদি এই নিসবতের হেতু তা হয়, যা আমরা বলেছি, তাহলে তখনই দারুল হারব হিসেবে গণ্য হবে, যখন আমাদের বর্ণিত শর্তগুলো পাওয়া যাবে। সুতরাং নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত দারুল ইসলাম শুধু সন্দেহ-সম্ভাবনার কারণে দারুল কুফরে পরিণত হবে না; স্বীকৃত মূলনীতির আলোকে— ‘‘যা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত তা সন্দেহ-সম্ভাবনার কারণে বিদূরিত হয় না।’’ [এই কায়দা (মূলনীতি) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন— আলআশবাহ ওয়ান নাযায়ির, ইবনে নুজাইম — ৫৭; আলআশবাহ, সুয়ুতি — ৫৩; আলমানসুর ফিল কাওয়ায়িদ, যারকাশি — ২/২৫৫; শরহুল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়্যা, যারকা — ৩৫-৪১; দুরারুল হুককাম — ১/২০]

তবে দারুল কুফরের বিষয়টা ভিন্ন। সেখানে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই তা দারুল ইসলাম হয়ে যাবে। কেননা সেখানে ইসলামের দিকের প্রাধান্য। (যদিও বাহ্যত মনে হয়, সেখানে সম্ভাবনাপূর্ণ বিষয়ের মাধ্যমে সুনিশ্চিত বিষয়কে রহিত করা হয়েছে, কিন্তু) হাদিসের কারণে সেখানে সন্দেহ-সম্ভাবনা দূর হয়ে যাবে। (আর সুনিশ্চিত বিষয়ের মাধ্যমে আরেকটা সুনিশ্চিত বিষয় দূর হতে পারে।) হাদিসটি হলো—

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه

ইসলাম উন্নীত থাকে। তার ওপর অন্য কিছু উন্নীত হয় না। (হাদিসটি ইবনে আব্বাস রা. থেকে মাওকুফ এবং সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন— সহিহ বুখারি, জানাযা অধ্যায়, তা’লিক— ৩/২১৮। ইমাম তহাবি রহ. হাদিসটিকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দেখুন— ৩/২৫৮। আব ইয়া’লা খলিলি আলফাওয়ায়িদে এবং রুওয়ানি আলমুসনাদে হাসান সূত্রে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আরো দেখুন— সুনানে দারাকুতনি — ৩/২৫২;

সুনানে বায়হাকি— ৬/২০৫; দালায়িলুন নুবুওয়াহ— ৬/৩৬; দালায়িল, আবু নুয়াইম— ৩২১। দেখুন— নাসবুর রায়াহ— ৩/২১৩; ফাতহুল বারি— ৩/২২০; আততালখিসুল হাবির— ৪/১২৬; তাগলিকুত তা’লিক— ২/৪৯০; ফায়জুল কাদির — ৩/১৭৯; ইরওয়াউল গালিল— ৫/১০৬-১০৯)

এরপর আল্লামা কাসানি রহ. বলেন, “নিসবত যদি ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিবেচনায়ও হয় (যেমনটা সাহিবাইনের অভিমত), তবুও কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য উপরিউক্ত দুটো শর্ত প্রয়োজন — অর্থাৎ, দারুল হারবের সংলগ্ন হওয়া এবং পূর্বের আমান (নিরাপত্তা) নষ্ট হয়ে যাওয়া। কেননা কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে কেবল প্রতিরক্ষাবাহিনীর মাধ্যমে। আর প্রতিরক্ষাশক্তি সেই দু’শর্তের মাধ্যমেই অস্তিত্ব লাভ করে। [বাদায়িউস সানায়ি— ৯/৪৩৭৫-৪৩৭৬]

দুই মাযহাবের মধ্যে পার্থক্য কী?

উপরিউক্ত আলোচনা স্পষ্টভাবে বুঝলে এ বিষয়টাকে আলাদা করে আর বলার প্রয়োজন পড়ে না। তারপরও বিষয়টাকে আরো স্পষ্ট করার জন্য আমরা এ শিরোনামে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে পারি।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং অন্য সকল ইমামই কোনো ভূখণ্ডের ওপর বিধানারোপ করার ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে শক্তি এবং প্রাধান্যতাকে

বিবেচনায় নিয়েছেন। তবে তাদের মাঝে যে বিষয়ে এসে ইখতিলাফ হয়ে গেছে, আল্লামা সারাখসি রহ. এর ভাষায় তা হলো—

“কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. বিবেচনায় নিয়েছেন বল এবং শক্তির পূর্ণতা। কেননা এই শহর ইতিপূর্বে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, মুসলমানদের রক্ষণকারী হিসেবে। এখন সেই ইহরায (রক্ষণশক্তি) মুশরিকদের পূর্ণ প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমেই বিতাড়িত হওয়া সম্ভব। আর তা এই তিন শর্ত সম্মিলিতভাবে পাওয়া গেলেই সম্ভব। কেননা যখন তা দারুশ শিরক সংলগ্ন না হবে, তখন চারিদিক থেকে মুসলমানদের বেষ্টনীর মাঝে থেকে তার অধিবাসীরা পরাভূত থাকবে। তেমনি সেখানে মুসলমান এবং যিম্মি যদি (পূর্বের নিরাপত্তার অধীনেই) নিরাপদ থাকে, তবে তা মুশরিকদের পূর্ণ প্রতাপ না থাকার প্রমাণ। এর দৃষ্টান্ত হলো সেই মাসআলা, হারবিরা যদি দারুল ইসলামে অবস্থানরত কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করে, তবে তাদের নিজেদের দেশে সংরক্ষণ করার পূর্ব পর্যন্ত তারা সেই সম্পদের মালিক হয় না; যেহেতু পূর্ণ প্রতাপ নেই।

এরপর যতোক্ষণ মূলের নিদর্শনসমূহের কোনো একটাও বাকি থাকে, তখন হুকুম তার ওপরই হয়, আপতিত বিষয়ের ওপর নয়। যেমন কোনো মহল্লা, যতোক্ষণ তার মাঝে একজন বাড়িওয়ালাও থাকবে, ততোক্ষণ হুকুম তার ওপরেই হবে, সে পর্যন্ত সেখানে নতুন আবাসগ্রহণকারী এবং ক্রেতাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। এই ভূখণ্ড তো মূলত দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, তো যতোক্ষণ তার মাঝে কোনো মুসলিম কিবা যিম্মি (পূর্বের নিরাপত্তার অধীনে নিরাপদ) থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত মূলের নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে একটি নিদর্শন তো বাকি থাকবে। সুতরাং সেই হুকুম (অর্থাৎ, দারুল ইসলাম থাকা এবং দারুল হারবে পরিণত না হওয়া) বাকি থাকবে। এটা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর একটি উসুল।

তেমনই প্রত্যেক জায়গার হুকুমের ক্ষেত্রে তার আশপাশের জায়গার অবস্থা বিবেচ্য। সুতরাং যখন এই ভূখণ্ডের চারিদিকে দারুল ইসলাম, তখন এই ভূখণ্ডের ওপর দারুল হারবের বিধান আরোপিত হবে না। যেমনিভাবে সেখানে শিরকি বিধান প্রতিষ্ঠিত না হলে তা আরোপ করা হতো না। মুরতাদরা এর ওপর দিনের কিছু সময়ের জন্য দখল নিয়েছে মাত্র।” (ফুঁ দিলেই আবার উড়ে যাবে।) [আলমাবসুত— ১০/১১৪]

তাতাররা যখন ইসলামি ভূখণ্ডের ওপর তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করে, তখন ফকিহগণের ফতোয়া দু’রকমই ছিলো। ওপরে আমরা আল্লামা ইবনে নুজায়ম রহ. এর ফতোয়া উদ্ধৃত করেছি। তিনি সাহিবাইনের অভিমতের আলোকে তখন তাতারদের পদানত রাষ্ট্রগুলোকে দারুল হারব বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। এবার আমরা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অভিমতের আলোকে প্রদত্ত ফতোয়ার নমুনা দেখবো।

ইমাম ইবনুল বাযযায কারদারি ইমাম আবু শুজা’ রহ. এর ফতোয়া উল্লেখ করেন, “আজ (হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে) যে-সব ভূখণ্ড কাফিরদের হাতে, সন্দেহ নেই যে, এ জায়গাগুলো দারুল ইসলাম। যেহেতু তা দারুল হারবের সাথে সংযুক্ত নয় এবং তাতে কুফরি বিধানও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং বিচারকরা মুসলমান। এবং শাসকরা— জরুরতের কারণে যাদের তারা আনুগত্য করে, তারা মুসলমান আর জরুরত ছাড়া যাদের আনুগত্য করে, তাদের আনুগত্য ‘মুওয়াদাআ’। যেসব অঞ্চলের ওপর তাদের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত মুসলমান গভর্নর রয়েছে, সেখানে জুমআ ঈদ কায়িম করা, খারাজ উশুল করা এবং বিচারকদের তাকলিদ করা বৈধ।...তার কাফিরদের আনুগত্য করাটা ‘মুওয়াদাআ’ বা ‘মুখাদাআ’।...আর এ উসুল তো স্থির হয়েছে যে, ইল্লতের কিছু অংশ বাকি থাকার দ্বারাও হুকুম বাকি থেকে যায়। আর আমরা সবাই তো –কোনো ইখতিলাফ ছাড়াই- হুকুম আরোপ করেছি যে, তাতারদের দখলদারিত্বের পূর্বে এই অঞ্চলগুলো দারুল ইসলামের অন্তর্গত ছিলো। আর তাদের দখলদারিত্বের পরে, আজান দেয়া, জুমআ জামাআত আদায় তাদের শাসকদের তরফ থেকে কোনো প্রকার আপত্তি ছাড়াই চলছে। তাই এসব

অঞ্চলের ওপর দারুল হারবের বিধান আরোপ করার কোনো কারণ নেই।” [ফাতাওয়া বাযযাযিয়া— ৩/৩১১-৩১২]

এরপর তিনি হানাফিদের শায়খ শামসুল আয়িম্মাহ আব্দুল আযিয আলহালওয়ানি রহ. এর ফতোয়া উল্লেখ করেন, “কোনো ভূখণ্ড দারুল হারব হয় — যখন সেখানে কুফরের বিধান জারি করা হয়। সেখানে কোনো ফায়সালা ইসলামের বিধানের আলোকে করা হয় না। এবং তা দারুল হারব সংলগ্ন হয়। আর সেখানে কোনো মুসলিম কিবা কোনো যিম্মি পূর্বের নিরাপত্তার অধীনে নিরাপদ থাকে না। যখন এই সবগুলো শর্ত পাওয়া যায়, তখন কোনো দেশ দারুল হারব হয়। যখন দলিল এবং শর্তের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়, তখন দেশ যা ছিলো তা-ই থাকবে। অথবা সতর্কতার দাবি হিসেবে ইসলামের দিকটাই প্রাধান্য পাবে। তুমি দেখছো না যে, শুধু ইসলামের বিধান জারি করার দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে দারুল হারব দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়।” [প্রাগুক্ত; আল্লামা তুমুরতাশি রহ. ও এমন ফতোয়া উল্লেখ করেছেন দুই মহান ইমামের থেকে— ইমাম ইসবিজানি এবং ইমাম ইমাদি রহ.। দেখুন— আদদুররুল মুনতাকা— ১/৬৩৪; জামিউর রুমুযের উদ্ধৃতিতে কাশশাফুল ইসতিলাহাত— ২/২৫৬]

চলবে ইনশাআল্লাহ...

ইসলামি রাষ্ট্রনীতি - ৩ (কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ফতোয়া)

ALI HASAN OSAMA·SATURDAY, MARCH 18, 2017

দারুল ইসলাম কীভাবে দারুল হারবে রূপান্তরিত হয় —এ বিষয়ে আমরা পূর্বের লেখায় সবিস্তারে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা প্রসিদ্ধ চার ইমামের ফতোয়া উল্লেখ করেছি; যার সারকথা— ইমাম মালিক ইমাম শাফেয়ি এবং ইমাম আহমদ আর আমাদের মাযহাবের সাহিবাইন— অর্থাৎ, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ রহ. —এর মতে কোনো ইসলামি

ভূখণ্ডে কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠার দ্বারাই তা দারুল হারব হয়ে যায়। ইমাম আবু হানিফা রহ. —এর মতে তিনটি শর্ত সম্মিলিতভাবে পাওয়া গেলেই কেবল কোনো ভূখণ্ড দারুল হারব হয়; অন্যথায় নয়। শর্ত তিনটির বর্ণনাও আমরা উল্লেখ করে এসেছি।

আজ আমরা এই মাসআলার পরিশিষ্টে অন্যান্য ফকিহগণের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ফতোয়া উল্লেখ করবো।

কোনো কোনো মালেকি ফকিহের অভিমত হলো, যতোক্ষণ পর্যন্ত দেশে ইসলামের শা’আইর কায়িম করা যাবে, (যেমন আযান দেয়া, ঈদ জুমআ ও নামাজের জামাত আদায় করতে পারা ইত্যাদি। শা’আইরের ব্যাখ্যা এই লেখার শেষাংশে দ্রষ্টব্য।) তখন পর্যন্ত দেশ দারুল হারব হবে না।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আ’রাফা দাসুকি রহ. (মৃত্যু— ১২৩০ হি.) বলেন, “কাফিরদের দখলদারিত্বের মাধ্যমেই কেবল ইসলামি রাষ্ট্র দারুল হারব হবে না। বরং যতোক্ষণ পর্যন্ত শা’আইরে ইসলাম পালনের সুযোগ থাকবে, তখন পর্যন্ত রাষ্ট্র দারুল ইসলামই থাকবে। যে পর্যন্ত রাষ্ট্রে ইসলামের সবগুলোর শা’আইর কিবা তার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সে পর্যন্ত রাষ্ট্র দারুল হারব হবে না।” [হাশিয়াতুদ দাসুকি আলাশ শারহিল কাবির— ২/১৮৮]

কোনো কোনো শাফেয়ি ফকিহের অভিমত— যে দেশে মুসলমানরা বসবাস করতো, এরপর কাফিররা তা দখল করে নিয়ে সেখানে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে, কুফরি বিধান-সংবিধান জারি করেছে, তা দারুল ইসলামই থাকবে; দারুল হারবে পরিণত হবে না।

শায়খ যাকারিয়া আনসারি রহ. (মৃত্যু— ৯২৬) বলেন, “যে দেশে একজন মুসলমানও বসবাস করে, তা দারুল ইসলাম। সুতরাং সেখান থেকে হিজরত করা

হারাম। যাতে করে তা দারুল হারবে পরিণত না হয়ে যায়।” [শারহু মানহাজিত তুল্লাব— ৪/২৪৪; আসনাল মাতালিব— ৪/২০৪]

আল্লামা শামসুদ্দীন রামালি রহ. (মৃত্যু— ১০০৪ হি.) দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করেছে— এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, “সে যদি সেখানে হারবিদের থেকে নিরাপদে থেকে আলাদাভাবে বসবাস করতে পারে আর (ইসলামি ভূখণ্ডে) হিজরত করার দ্বারা মুসলমানদের পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্তির আশাও না থাকে, তাহলে সেখানে তার অবস্থান করা ওয়াজিব। কেননা তার অবস্থানস্থল এখন দারুল ইসলামই রয়েছে। সে হিজরত করলে দারুল হারব হয়ে যাবে। …এর থেকে এ মাসআলাও গৃহীত হয় যে, প্রত্যেক এমন জায়গা, যেখানকার অধিবাসীরা হারবিদের থেকে নিরাপদে থাকতে পারে, তা দারুল ইসলাম থাকবে। সুতরাং কাফিরদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও তা দারুল কুফর হিসবে গণ্য হওয়াটা অসম্ভব। যেমনটা স্পষ্টভাবে হাদিসের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, “ইসলাম উন্নীত থাকবে। তার ওপর অন্য কিছু উন্নীত হবে না। (হাদিসের তাখরিজ পূর্বের পোস্টে দ্রষ্টব্য)। তাই ফকিহগণ যে বলেন, ‘অমুক দেশ তো দারুল হারব হয়ে গেছে’ —এর দ্বারা বাহ্যত (সুরাতান) তা দারুল হারব হওয়াটা উদ্দেশ্যে; হুকুমের বিচারে নয়। অন্যথায় তো অপরিহার্য হয় যে, তারা দারুল ইসলামের যে অংশ দখল করবে, তা-ই দারুল হারব হয়ে যাবে। এটা তো দুরূহ।” [নিহায়াতুল মুহতাজ— ৮/৮২, ৫/৪৫৪; মুগনিল মুহতাজ— ৪/২৩৯; হাশিয়াতুল কালয়ুবি এবং হাশিয়াতু উমায়রা— ৪/২২৭]

স্পেনে খ্রিস্টানদের দখল প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর আরগুনের মুসলমানদেরকে তিনি এই ফতোয়াই দিয়েছিলেন— “বরং এখান থেকে হিজরত করা জায়িয নেই। কেননা মুসলমানদের অবস্থানের দ্বারা অন্যান্যদের ইসলাম গ্রহণের প্রত্যাশা থাকে। আরেকটি কারণ হলো, এ ভূখণ্ড তো দারুল ইসলাম। এখন তারা যদি হিজরত করে, তবে তা দারুল হারব হয়ে যাবে। [ফাতাওয়া রামালি, ইবনে হাজার হাইতামির ‘আলফাতাওয়াল কুবরা’র হাশিয়ায় প্রকাশিত—৪/৫৩-৫৪; নিহায়াতুল মুহতাজ— ৫/৪৫৪]

তাদেরও আগে ইমাম রাফেয়ি রহ. (মৃত্যু— ৬২৩ হি.) —এর বক্তব্যেও এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেন, “দারুল ইসলাম তিন প্রকার।

১. এমন দেশ, যেখানে মুসলমানরা বাস করে।

২. এমন দেশ, যা মুসলমানরা বিজয় করেছে।

৩. এমন দেশ, যেখানে মুসলমানরা বসবাস করতো। এরপর তারা নির্বাসিত হয়েছে আর কাফিরদের আধিপত্য সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।”

কাফিরদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও তিনি সেই দেশকে দারুল ইসলামই গণ্য করছেন। এরপর তিনি এই ব্যাপক কথাটিকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন।

“ফকিহগণ (আসহাবুশ শাফেয়ি রহ.) যে তৃতীয় প্রকারকেও দারুল ইসলাম গণ্য করেছেন, তার কারণ হলো, তাদের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের পূর্বের কর্তৃত্ব (দারুল ইসলাম থাকার) হুকুম বাকি থাকার জন্য যথেষ্ট। মুতাআখখির (পরবর্তী) কোনো ফকিহকে দেখেছি, তারা এই বক্তব্যকে সেক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন, যখন হারবিরা মুসলমানদের জন্য বাধা-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। যদি তা করে, তবে সেই দেশ দারুল কুফর।” [আলআযিয শরহুল ওয়াজিয— ৬/৪২৩-৪২৪; রাওযাতুত তালিবিন, নববি— ৫/৪৩৩-৪৩৪]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু— ৭২৮ হি.) কে ‘মারিদিন’ শহর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো— তা কি দারুল ইসলাম নাকি দারুল হারব? তিনি উত্তর দিলেন, “তা দারুল হারব নাকি দারুল ইসলাম —এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তা হলো যৌগিক দেশ, যার মাঝে দু’দিকই পাওয়া যায়। তা দারুল ইসলামের পর্যায়ে নয়, যেখানকার সেনাবাহিনী মুসলমান হওয়ার কারণে তাতে ইসলামি বিধান কার্যকর রয়েছে। আবার দারুল হারবের

পর্যায়েও নয়, যার অধিবাসীরা কাফির-বেইমান। বরং তা তৃতীয় একটি প্রকার। সেখানকার মুসলমানদের সাথে তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী আচরণ করা হবে। আর ইসলামি শরিয়ত থেকে যারা খারিজ, তাদের সাথে তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী কিতাল করা হবে।” [ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া — ২৮/২৪০-২৪১]

পাঠকের এ কথা বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা নয় যে, উপরিউক্ত সবগুলো ফতোয়াই হলো বিচ্ছিন্ন মতামত, যা মাযহাবের ইমামগণের বক্তব্য-অভিমতের সাথে বিরোধপূর্ণ। এজন্য উম্মাহর ফকিহগণ এসব বিচ্ছিন্ন মতামত গ্রহণ করেননি। যারা বড়, তাদেরও দু-চারটি বিচ্ছিন্ন মতামত থাকতেই পারে। এক্ষেত্রে তারা অনুসরণীয় নন। মাওলানা আবদুল মালেক দা. বা. প্রায়ই বলেন, “যাল্লাত (ভুল-বিচ্যুতি)—এর ক্ষেত্রে কারোরই অনুসরণ জায়িয নেই।” এজন্য ইবনু তাইমিয়া রহ.—এর শাগরিদ ইবনু মুফলিহ রহ. পর্যন্ত মহান ইমামগণের সর্বসম্মত মতকে বাদ দিয়ে উস্তাদের এই বিচ্ছিন্ন অভিমত গ্রহণ করেননি। (দেখুন — আলআদাবুশ শারইয়্যাহ — ১/২১২)। তবে এই দু-চারটি বিচ্ছিন্ন মত এবং ভুলের কারণে কোনো ইমাম বা ফকিহের বিরুদ্ধে ‘যবানদারাযি’ করারও কোনো সুযোগ নেই। ইমাম মালিক রহ. সুন্দর বলেছেন —

كل يؤخذ من قوله و يترك، إلا صاحب هذا القبر؛ يعني: النبي صلى الله عليه و سلم.

“সবাই এমন, যার কিছু কথা গ্রহণ করা হয় আর কিছু কথা পরিত্যাগ করা হয়, শুধু এই কবরের মানুষটি — অর্থাৎ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ছাড়া।” (ইমাম বুখারি ‘কিরাত খালফাল ইমাম’ অধ্যায়ে ইবনে আব্বাস রা. এবং মুজাহিদ রহ. থেকেও অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।) উদ্দেশ্য হলো, একমাত্র নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই এমন, যার সব কথা ও কাজ গ্রহণীয়। এ ছাড়া অন্য যতো মানুষ আছে, সাহাবি

তাবেয়ি কিবা উম্মাহর বিদগ্ধ যতো আলিম এবং ফকিহ, সবার ব্যাপারে একই কথা— চোখ বুজে তাদের সব কথা-কাজের অনুসরণ করার সুযোগ নেই। কেননা একমাত্র নবি ছাড়া কেউই ভুলের উর্ধ্বে নয়। এ যুগে তো কিছু মানুষ এমনও পাওয়া যায়, যারা খুঁজে খুঁজে সালাফের বিচ্ছিন্ন মতগুলো বের করে সেগুলোর অনুসরণ করে, সামাজিক মাধ্যমেও তা প্রচার করে। শায়খুল ইসলাম দা. বা. —এর ভাষায়, তারা মূলত শরিয়ত নিয়ে খেলা করছে। শরিয়তকে তাদের মানস-প্রবৃত্তির অনুগামী বানিয়ে নিয়েছে। আদতে তারা শরিয়তের অনুসরণ করে না। করে নফসের পূজা।

টীকাঃ ‘শাআইর’ কাকে বলে

মাওলানা আবদুল মালেক দা. বা. এ বিষয়ে যা বলেছেন—

‘শাআইর’ আরবী শব্দ। ‘শায়ীরাতুন’ এর বহুবচন। ‘শায়ীরাতুন’ অর্থ হচ্ছে, নিদর্শন, প্রতীক। তাহলে ‘শাআইরুল্লাহ’ অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন। কুরআন-হাদীসে শাআইরের ব্যাখ্যা এসেছে; যার সারসংক্ষেপ এই যে, আল্লাহ তাআলা বিশেষ কিছু স্থান, কিছু কাজ এবং কিছু বস্তুকে সম্মানিত করেছেন এবং সেগুলোকে তাঁর কুদরত ও আযমতের চিহ্ন সাব্যস্ত করেছেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের নিদর্শন ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাআলার আদেশের কারণে এগুলো বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। শীর্ষস্থানীয় শাআইরের মধ্যে রয়েছে, কালামুল্লাহ অর্থাৎ কুরআন মজীদ এবং কালিমাতুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কালিমা। কালেমা তাইয়্যেবা, কালেমা শাহাদত ইত্যাদি। বিশেষ স্থানসমূহের মধ্যে রয়েছে বাইতুল্লাহ, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং ইহুদীদের কব্জায় থাকা মুসলমানদের প্রথম কেবলা মসজিদে আকসা। এরপর সকল মসজিদ। তদ্রূপ আরাফা, মিনা-মুযদালিফা ‘শাআইরুল্লাহ’র

অন্তর্ভুক্ত। কুরবানীর পশুও শাআইরুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। [দেখুন — http://www.alkawsar.com/article/65]

শাআইর ও ইবাদত: কিছু প্রয়োজনীয় কথা

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

গত ১৮ যিলকদ ’৩০ হি. মোতাবেক ৭ নভেম্বর ’০৯ ঈসায়ী মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়ায় অনুষ্ঠিত মাসিক দ্বীনী মাহফিলে মারকাযের আমীনুত তা’লীম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব উপরোক্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ আলোচনা করেছিলেন। ‘শাআইর’-এর পরিচয় ও মর্যাদা, দ্বীনী বিষয়ে ‘ইনকার’, ‘ইছতিহযা’ ও আমলী দুর্বলতার শরয়ী বিধান, ইবাদাতের হাকীকত বোঝার প্রয়োজনীয়তা এবং ইসলামের ইবাদত ও অন্যান্য ধর্মের উপাসনা-উৎসবের মাঝে পার্থক্য ইত্যাদি মৌলিক বিষয় ছাড়াও প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ও তাতে উঠে এসেছে। আলোচনাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে তা আলকাউসারের পাঠকদের সামনেও পেশ করা হল। ইনশাআল্লাহ এতে সবাই উপকৃত হবেন।-সম্পাদক
আমি সূরায়ে হজ্বের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। এরপর যে আরবী বাক্যগুলো বলা হয়েছে তা কুরআন মজীদের আয়াত নয়। কুরআনের কিছু অংশ তেলাওয়াত করার পর এ ধরনের বাক্য বলা হয়ে থাকে। এগুলো বলা জরুরি নয়, তবে বললে কোনো দোষও নেই।

আল্লাহর কালামের প্রতি স্বীকৃতি ও মনের ঈমানী অনুভূতি প্রকাশ করে এই বাক্যগুলো বলা হয়। প্রথম বাক্যটির অর্থ হচ্ছে-‘আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন।’ একথা বলা বাহুল্য যে, আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে বড় সত্যবাদী। তাঁর চেয়ে সত্যবাদী আর কেউ হতে পারে না। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

‘আল্লাহর কথার চেয়ে অধিক সত্য আর কার কথা হতে পারে?

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ‘লা রায়বা ফীহি’ এটা ওই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নয়। দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হল, ‘এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সত্য বলেছেন।’ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কালাম, আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ সম্পূর্ণ সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর সঙ্গে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর পৌঁছানোর মধ্যে কোনো ধরনের ত্রুটি নেই। তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যের অর্থ হচ্ছে-‘আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদানকারী ও শোকরগোযারকারীদের অন্তর্ভুক্ত।’ অর্থাৎ আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহর কালাম সত্য এবং আল্লাহর পক্ষ হতে যেভাবে তা অবতীর্ণ হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেভাবেই তা আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। এই মহা নেয়ামত লাভ করে আমরা কৃতজ্ঞ।

পঞ্চম বাক্যের অর্থ হচ্ছে-‘সকল প্রশংসা আল্লাহর।’
কথাগুলোর ভাব ও মর্ম অত্যন্ত সুন্দর। কুরআন মজীদের কিছু অংশ তিলাওয়াতের পর এভাবে মনের অনুভূতি, আস্থা ও স্বীকৃতি প্রকাশ করতে দোষ নেই। তবে এটা কোনো নির্ধারিত বিধান নয় যে, তা বলতেই হবে। কখনো কখনো বলা যায়। না বললেও অসুবিধা নেই।

অনেককে দেখা যায়, যেভাবে কুরআন মজীদের আয়াত তেলাওয়াত করেন, ঠিক সেভাবেই, একই সুরে এই বাক্যগুলোও বলেন। যদিও সম্ভাবনা কম তবুও এতে কারো কারো ভুল ধারণা হতে পারে যে, বোধ হয় এই কথাগুলোও কুরআন মজীদের আয়াত। এই দেশে এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে কি না জানি না, কিন্তু পাকিস্তানে এমন ঘটেছে বলে জানি। পাকিস্তানের করাচি বা অন্য কোনো শহরের ঘটনা। এক মজলিসে বক্তা কুরআন মজীদের আয়াত তেলাওয়াতের পর বয়ান আরম্ভ করলেন। এই বাক্যগুলো বলেননি। এক

শ্রোতা দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, জনাব আপনার একটি আয়াত তো রয়ে

গেছে। অর্থাৎ সে মনে করেছে, কুরআনের যেখান থেকেই পড়া হোক

সেখানে একটি আয়াত আছে-‘সাদাকাল্লাহুল আযীম।’ তো পরে ওই বক্তা

সাদাকাল্লাহ্ বলার বিরুদ্ধে একটি বই লিখে দিয়েছেন। এটা অবশ্য

বাড়াবাড়ি। কেননা, ‘সাদাকাল্লাহ’ পড়াই যাবে না এমন বিধান দেওয়া

ভুল। তবে ‘সাদাকাল্লাহ’ পড়াকে জরুরি মনে করা বা তাকে কুরআনের

আয়াত মনে করাও ভুল।

যাক, সূরা হজ্বের এই আয়াতে বলা হয়েছে, ‘যে ‘শাআইরুল্লাহ’র সম্মান

করে এটা তার অন্তরের তাকওয়া ও খোদাভীতির পরিচায়ক।’ আল্লাহর

শাআইরকে সম্মান করা দ্বারা বোঝা যায়, অন্তরে ঈমান আছে এবং

আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা আছে।

‘শাআইর’ কাকে বলে
‘শাআইর’ আরবী শব্দ। ‘শায়ীরাতুন’ এর বহুবচন। ‘শায়ীরাতুন’ অর্থ হচ্ছে, নিদর্শন, প্রতীক। তাহলে ‘শাআইরুল্লাহ’ অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন। কুরআন-হাদীসে শাআইরের ব্যাখ্যা এসেছে, যার সারসংক্ষেপ এই যে, আল্লাহ তাআলা বিশেষ কিছু স্থান, কিছু কাজ এবং কিছু বস্তুকে সম্মানিত করেছেন এবং সেগুলোকে তাঁর কুদরত ও আযমতের চিহ্ন সাব্যস্ত করেছেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের নিদর্শন ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাআলার আদেশের কারণে এগুলো বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। শীর্ষস্থানীয় শাআইরের মধ্যে রয়েছে, কালামুল্লাহ অর্থাৎ কুরআন মজীদ এবং কালিমাতুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কালিমা। কালেমা তাইয়্যেবা, কালেমা শাহাদত ইত্যাদি। বিশেষ স্থানসমূহের মধ্যে রয়েছে বাইতুল্লাহ, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং ইহুদীদের কব্জায় থাকা মুসলমানদের প্রথম কেবলা মসজিদে আকসা। এরপর সকল মসজিদ। তদ্রূপ আরাফা, মিনা- মুযদালিফা ‘শাআইরুল্লাহ’র অন-র্ভুক্ত। কুরবানীর পশুও শাআইরুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত।
বিশেষ কাজের মধ্যে রয়েছে, নামায। কেউ যখন নামায পড়ে তখন বোঝা যায়, সে মুমিন। যেকোনো ধর্মের লোক তাকে দেখুক, বলবে যে, এই মানুষটি মুসলমান। এজন্য নামায শাআইরের অন্তর্ভুক্ত। জামাতের নামায, জুমআর নামায, ঈদের নামায-এগুলোও শাআইরুল্লাহ।
তদ্রূপ ‘হজ্ব’ শাআইরুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। আমি এই আরবী শব্দটি বারবার এজন্য ব্যবহার করছি যেন তা আমাদের সবার ইয়াদ হয়ে যায়। শরীয়তের পরিভাষাগুলো আমাদের মুখস্থ থাকা উচিত।

কিছু যিকর অর্থাৎ মুখে উচ্চারণ করা হয় এমন কিছু বিষয় শাআইরুল্লাহর মধ্যে গণ্য। যেমন আযান। কোনো জনপদে আযান হলে যে কেউ বুঝবে যে, এখানে মুসলমানদের বসবাস আছে এবং তাদেরকে ইবাদতের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে। আযান ইসলামের শীর্ষস্থানীয় শাআইরের অন-র্ভুক্ত। মুমিনের অন্তরে আযানের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা না থেকে পারে না। একজন সাধারণ দ্বীনদার মানুষ আমাকে বলেছেন যে, আমার কাছে আযান শুনতে খুব ভালো লাগে। যখন আযান হয় তখন ছেলেদের বলি যে, সব জানালা খুলে দাও। আমি আযান শুনব। আর অনেকে তো শুধু এ কারণে বাসা পরিবর্তন করে ফেলে যে, সেখানে আযানের আওয়াজ শোনা যায় না।

পক্ষান্তরে এই দেশে এমন লোকও আছে যারা বলে, আযানের কারণে শব্দ দুষণ হয়! আহারে বাংলাদেশ! যে দেশে চারদিকের অনাহূত শব্দে কান পাতা দায় সেই দেশে নাকি আযানের কারণে শব্দ দুষণ হয়! এমন কথা যে বলে সে কখনো মুমিন হতে পারে না। সে হয় মুনাফিক নয়তো বেদ্বীন। আর এই সব লোক তো এখন আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিরও হর্তাকর্তা! যাই হোক, মুমিনমাত্রই শাআইরুল্লাহর সম্মান করবে। শাআইরুল্লাহর প্রতি তার ভক্তি ও আস্থা থাকবে। কোনো মুমিন কখনো এটাকে কটাক্ষ করতে পারে না।

দাড়ি ও মিসওয়াক
ইসলামের ‘শাআইর’ অনেক এবং তাতে বিভিন্ন প্রকার ও পর্যায়ক্রমও রয়েছে। ক্রমান্বয়ে আসতে আসতে একপর্যায়ে আসবে দাড়ি-টুপি, মিসওয়াক ইত্যাদি। এগুলো সাধারণ বিষয় নয়। দাড়িকে অনেকে সাধারণ সুন্নত মনে করে এবং এ কারণে এর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে। অথচ সাধারণ সুন্নতেরও গুরুত্ব কম নয়। আর দাড়ি তো ‘সুন্নতে ওয়াজিবা’ অর্থাৎ ওয়াজিব পর্যায়ের সুন্নত। এর গুরুত্ব অনেক বেশি। হযরত আদম আ. থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত

সকল নবীর দাড়ি ছিল। তাই দাড়ি কখনো সৌন্দর্য্য হানিকর হতে পারে না। বিকৃত পরিবেশের কারণে কারো কাছে দাড়ি কামানো সৌন্দর্যের বিষয় মনে হতে পারে। কিন্তু এটা হচ্ছে বিকৃতি। প্রকৃত সৌন্দর্য দাড়ি রাখার মধ্যেই রয়েছে।

এখানে আরেকটি বিষয়েও সাবধান হওয়া দরকার। তা হচ্ছে দাড়ি না রাখা গুনাহ, কিন্তু দাড়িকে অবজ্ঞা করা বেদ্বীনী। যেসব মুসলমান দাড়ি রাখে না তারা নিজেদেরকে অপরাধী মনে করতে হবে। তাদের এই অনুভূতি থাকতে হবে যে, একটি গুনাহের কাজে তারা লিপ্ত। এটা যদি না থাকে তাহলে গুনাহ আরো বেড়ে যাবে। আর যদি দাড়িকে অবজ্ঞা করা হয় তাহলে তো ঈমানই থাকবে না।

মিসওয়াকও সাধারণ সুন্নত নয়, শাআইর পর্যায়ের সুন্নত। এজন্য কেউ যদি কখনোই মিসওয়াক না করে তাহলে সে গোনাহগার হবে। মাঝে মাঝে করল না তাহলে মিসওয়াকের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবে।

দেখুন আবারো বলছি, ইসলামের কোনো একটি বিধান পালন করতে না-পারা অপরাধ, কিন্তু এর দ্বারা ঈমান নষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে সেই বিধানকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে ঈমান চলে যায়। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যা আকীদা পর্যায়ের। এটা ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। ইনকার, ইছতিহযা ও আমলী দুর্বলতা

এখানে তিনটি বিষয় আছে: ‘ইনকার’, ‘ইছতিহ্যা’ ও ‘আমলী দুর্বলতা’। ইনকার অর্থ অস্বীকার করা আর ইছতিহ্যা অর্থ বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা করা। ইনকার দ্বারাও ঈমান নষ্ট হয় তবে সবক্ষেত্রে নয়। ইসলামের যে বিষয়গুলো অকাট্য এবং কুরআন-হাদীস দ্বারা সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত তা অস্বীকার করলে ঈমান থাকে না। যেমন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত-এগুলো ইসলামের অকাট্য ইবাদত। এগুলো

অস্বীকার করলে ঈমান চলে যাবে। এমন আরো বহু অকাট্য বিষয় আছে যা জেনে নেওয়া আমাদের কর্তব্য। আর যেসব বিধান ইজতিহাদী পর্যায়ের তা অস্বীকার করাও গুনাহ কিন্তু এর দ্বারা ঈমান নষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে ইছতিহযা এত মারাত্মক যে, শরীয়তের সামান্য কোনো বিষয়কে ইছতিহ্যা বা বিদ্রূপ করলে ঈমান চলে যাবে। আপনি মিসওয়াক করেন না-এটা অপরাধ। কিন্তু যদি মিসওয়াককে বিদ্রূপ করে বলেন, ব্রাশ আছে পেস্ট আছে তা বাদ দিয়ে এই সব কী, ছাগলের খুটা পকেটে ভরে রেখেছে। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ঈমান চলে যাবে।

কোনো আলিম ফতোয়া দিয়েছেন! তখন আপনি যদি বলেন, ‘না না, আপনি ঠিক বলেননি। বিষয়টা এমন নয়।’ তবে এটা ইনকার হল। এটা অবশ্যই অপরাধ। কেননা ফিকহ-ফতোয়ার লোক না হয়েও আপনি এ বিষয়ের লোকের কথা অস্বীকার করেন কীভাবে? এটা তো অনধিকার চর্চা। তবে এর দ্বারা ঈমান নষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে ‘ফতোয়া’ বিষয়টাকেই যদি অবজ্ঞা করা হয়-আরে রাখেন আপনার ফতোয়া, কে মানে ফতোয়া? আদিকালের কথাবার্তা নিয়ে বসে আছেন! তাহলে এটা ‘ইছতিহ্যা’। এ কারণে ঈমান চলে যাবে।
দ্বীনের কোনো বিষয়কে উপহাস করার দ্বারা বোঝা যায়, দ্বীনের প্রতি তার ভক্তি নেই। আস্থা ও ভালবাসা নেই। কেননা, যার প্রতি আস্থা থাকে মানুষ কখনো তাকে উপহাস করে না।

ইছতিহযা মুমিনের স্বভাব নয়, মুনাফিকদের স্বভাব। কুরআন মজীদে মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা মুসলমানের সঙ্গে ‘ইছতিহযা’ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

তৃতীয় বিষয় হল আমলী দুর্বলতা। শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করা গুনাহ। আর গুনাহ মানুষের আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর। এজন্য অনুতপ্ত থাকা চাই এবং গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করা চাই। অনুতাপের বিপরীত হল অহঙ্কার। এটা মানুষকে ইনকার ও ইছতিহযাতে লিপ্ত করে দেয়।
হজ্ব শাআইরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত
মূল কথায় ফিরে আসি। শাআইরুল্লাহর সম্মান হচ্ছে ঈমানের অংশ এবং তা তাকওয়া ও খোদাভীতির পরিচায়ক।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, শাআইরুল্লাহর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু শাআইর আছে কর্মগত। অর্থাৎ এমন কিছু কাজ, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরত ও আযমতের নিদর্শন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের চিহ্ন হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এইসব কাজের মধ্যে অন্যতম হল হজ্ব। মুসলমানগণ নির্ধারিত স্থানে একত্র হয়ে প্রকাশ্যে আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করে। এটা ইসলাম ও মুসলমানদের চিহ্ন। হজ্বের কাজগুলো পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, এর মূল বিষয় হল আল্লাহ তাআলার ইবাদত। ইসলাম তাওহীদের দ্বীন এবং এর সকল ইবাদতের মূল বিষয় হচ্ছে তাওহীদ। এটা এতই পরিষ্কার যে, এ বিষয়ে বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই।

অন্যান্য বাতিল ধর্মের সাথে ইসলামের কোনো মিল নেই এবং এখানে কোনো তুলনাও চলে না। তবে নাম ও বাহ্যিক কিছু বিষয়ে কিছু সাদৃশ্য মনে হতে পারে। যেমন হজ্বের সময় মুসলমানরা আরাফার ময়দানে, মিনায়, মুযদালিফায় জমায়েত হয়। অন্য ধর্মের লোকদেরও বিভিন্ন তীর্থস্থানে জমায়েত হওয়ার রেওয়াজ আছে। কিন্তু এটা তো শুধু বাহ্যিক সাদৃশ্য। স্বরূপ, তাৎপর্য ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এই সকল বিষয়ে ইসলামের ইবাদত অন্য সকল ধর্মের উপাসনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অথচ আমাদের সাংবাদিক-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী মহলের প্রবণতা হল তারা সব বিষয়কে সমান বলতে আগ্রহী। এজন্য তারা ইসলামের ইবাদত-বন্দেগী, হজ্ব-কুরবানী-ঈদ ইত্যাদিকে ঠিক সেভাবেই উপস্থাপন করে যেভাবে উপস্থাপন করে হিন্দুদের পূজা-অর্চনা ও ধর্মীয় আচার-উৎসবকে। মুসলিম সমাজে মুসলিম নাম পরিচয় বহন করেও তারা এইসব কাজ করে। অথচ ইসলামের ইবাদত ও অন্যান্য ধর্মের পূজা-অর্চনায় কোনো মিল নেই।

ইসলামের ইবাদত ও অন্যান্য ধর্মের উপাসনার মাঝে পার্থক্য

ইসলামের ইবাদতের মূল ভিত্তি হল তাওহীদ ও সুন্নাহ। পক্ষান্তরে অন্যান্য ধর্মের উপাসনার মূল বিষয় শিরক ও বিদআত। কোনো মুসলমান কীভাবে সকল ধর্মকে সমান মনে করতে পারে? দেখুন, প্রথম পার্থক্য তো এখানেই যে, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন। পক্ষান্তরে অন্য সকল ধর্ম তাঁর কাছে প্রত্যাখ্যাত। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে-

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন শুধু ইসলাম। আল্লাহ ইসলামকেই সবার জন্য পছন্দ করেছেন, কিন্ত যারা তা মানল না, অন্য ধর্মে গেল তারা আল্লাহর দ্বীনকে পরিত্যাগ করল। দ্বিতীয় পার্থক্য হল ইসলামের ইবাদত বন্দেগী আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নির্দেশিত। এখানে কারো নিজস্ব মতের কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। সুতরাং নামায পাঁচ ওয়াক্তই। পৃথিবীর কোনো মুসলমান নামাযকে ছয় ওয়াক্ত বানাতে পারবে না। ফজরের নামায দুই রাকাত, যোহর-আসর চার রাকাত, মাগরিব তিন রাকাত, ইশা চার রাকাত-এভাবে আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত এবং সারা মুসলিমজাহানে নামায এভাবেই। কেউ একথা বলতে পারবে না যে, আসরের নামায চার রাকাত পড়লাম, সামনে ইশাও চার রাকাত পড়ব, মাঝে মাগরিব তিন রাকাত কেন? এটাও চার রাকাত পড়ি। এখানে নিজের ইচ্ছার কোনো অবকাশ নেই। নামায শুরু হবে তাকবীর দ্বারা শেষ হবে সালাম দ্বারা। এটাই নামাযের নিয়ম। পৃথিবীর কোথাও এর ব্যতিক্রম নেই। নামাযের কিছু মাসাইলের ক্ষেত্রে সেসব পার্থক্য দেখা যায় এটাও এজন্য নয় যে, কেউ মনগড়াভাবে কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে; বরং ওই একাধিক পদ্ধতি হাদীস শরীফেই আছে। এক মুজতাহিদ এক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, অন্য মুজতাহিদ অন্য পদ্ধতি। কিন্তু সবগুলো হাদীস শরীফ থেকেই নেওয়া হয়েছে।

এবার অন্যান্য ধর্মের উপাসনা ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে খোঁজ নিন। দেখবেন যে, এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। জিজ্ঞাসা করলে তারা বলবে যে, আমরা বাপ-দাদাদের এভাবেই করতে দেখেছি কিংবা এমন কিছু গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিবে যেগুলো বিকৃত, পরিবর্তিত ও ভিত্তিহীন। বাইবেল সম্পর্কে খোঁজ নিন। তা প্রকৃত ইঞ্জিল নয়। ইঞ্জিল ছিল আসমানী কিতাব। কিন্তু তা সংরক্ষিত থাকেনি। লোকেরা তা বিকৃত ও পরিবর্তিত করে ফেলেছে। এখন বিভিন্ন ভাষায় যেসব অনুবাদ পাওয়া যায় সেগুলো তুলনা করে দেখুন, যত অনুবাদ তত পার্থক্য। শুধু শব্দের পার্থক্য নয়, তথ্যের পার্থক্য। মোটকথা, সেসব ধর্মের উপাসনা ও উপাসনা-পদ্ধতির কোনো ভিত্তি নেই। পক্ষান্তরে ইসলামের সকল ইবাদত আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নির্দেশিত ও প্রমাণিত।

তৃতীয় বিষয় হল ইসলামের ইবাদতের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ ও সুন্নাহ। পক্ষান্তরে অন্য সকল ধর্মের উপাসনার মূল ভিত্তি হল শিরক ও বিদআত। এভাবে একেক দিক থেকে যদি বিচার-বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখবেন, ইসলামের ইবাদতের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের উপাসনার কোনো মিল নেই।

হজ্বের মূল বিষয় আল্লাহর ইবাদত
আমাদের আলোচ্য বিষয় হজ্ব সম্পর্কেই চিন্তা করুন। হজ্বে আমরা বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করি। কিন্তু এটা বাইতুল্লাহর সম্মানের জন্য করা হয় না। করা হয় আল্লাহর ইবাদতের জন্য। আল্লাহ তাআলা বাইতুল্লাহর চারপাশে তাওয়াফ করতে বলেছেন তাই তাওয়াফ করা হয়। এটা ঠিক যে, আল্লাহ তাআলা বাইতুল্লাহকে সম্মানিত করেছেন, কিন্তু তাওয়াফ সে সম্মানের জন্য নয়; বরং তা আল্লাহর ইবাদত। দেখুন, তাওয়াফ শুরু হয় হজরে আসওয়াদ থেকে। বাইতুল্লাহকে বাম পাশে রেখে তাওয়াফ করতে হয়। তাওয়াফের হালতে বাইতুল্লাহর দিকে তাকানো নিষেধ। বাইতুল্লাহর দিকে সীনা ফেরানোও নিষেধ। কেউ যদি

বাইতুল্লাহর দিকে সীনা ফেরায় তাহলে যতটুকু সময় সীনা বাইতুল্লাহর দিকে ছিল ওই পরিমাণ তাওয়াফ হয়নি। আবার পিছিয়ে এসে তাওয়াফ করতে হবে। কী প্রমাণ করে এই মাসআলাগুলো? এটাই প্রমাণ করে যে, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ বাইতুল্লাহর জন্য নয়, আল্লাহর জন্য। এটা আল্লাহর ইবাদত। হজরে আসওয়াদে চুম্বন করার বিষয়টি দেখুন। নিয়ম হল, অন্যকে কষ্ট না দিয়ে যদি হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা সম্ভব হয় তাহলে চুম্বন করবে। তবে সাধারণত হজ্বের মওসুমে এটা সম্ভব হয় না। একেবারে মওসুমের শুরুতে চলে গেলে কিংবা মওসুমের শেষে যদি কেউ থেকে যায় তা চুম্বনের সুযোগ পাওয়া যায়। অন্যথায় তা পাওয়া যায় না। দূর থেকে হাত উঁচিয়ে হাতে চুম্বন করবে।

হজরে আসওয়াদে চুম্বনের বিষয়টি বাহ্যত মনে হতে পারে পাথরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ। অথচ মোটেই তা নয়। হজরে আসওয়াদ হচ্ছে বেহেশতী পাথর। আল্লাহ তাআলা বেহেশত থেকে তা পাঠিয়েছেন এবং এতে চুম্বন করলে তিনি বান্দার গুনাহ মাফ করবেন। লক্ষ করুন, গুনাহ মাফ করবেন আল্লাহ তাআলা। তাই আল্লাহর আদেশে হজরে আসওয়াদে চুম্বন করা হয়। হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলে তা কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে যে, এ ব্যক্তি তাওহীদের লোক ছিল। দেখুন, তাওহীদপন্থী ছিল বলে সাক্ষ্য দিবে। কেননা, তা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশিত।

হযরত ওমর ফারূক রা.-এর ঘটনা অনেকেরই জানা আছে। হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার সময় তিনি বললেন, ‘আমি জানি, তুমি একটি পাথরমাত্র। কল্যাণ বা অকল্যাণের কোনো ক্ষমতা তোমার নেই। আমি যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে আমি কখনো তোমাকে চুম্বন করতাম না।’ তাহলে পরিষ্কার পার্থক্য হয়ে গেল হিন্দুদের পাথর-পূজা ও আমাদের হজরে

আসওয়াদে চুম্বনের মাঝে। এভাবে হজ্বের সকল কাজকর্মের সম্পর্কে চিন্তা করুন। দেখা যাবে যে, এর হাকীকত হচ্ছে তাওহীদ ও ইবাদত। আর তা আদায়ের পদ্ধতি রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ্য়। তাই স্বরূপ, তাৎপর্য এবং সম্পাদনের পদ্ধতি কোনো বিষয়েই অন্যান্য ধর্মের পূজা-অর্চনার সঙ্গে এর মিল নেই। তাহলে ইসলামের ইবাদত-বন্দেগী এবং ঈদ ও কুরবানীকে অন্যান্য ধর্মের উৎসব ও উপাসনার সঙ্গে এক কাতারে কীভাবে নিয়ে আসা যায়? অথচ এ কাজটিই আমাদের দেশের সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী মহলের প্রধান প্রবণতা। এটি সত্যিই অত্যন্ত দুঃখজনক।

এজন্য ইবাদত-বন্দেগীর হাকীকত ও স্বরূপ পরিষ্কারভাবে বোঝা উচিত। হাকীকত না বোঝার কারণে ইবাদতের প্রসঙ্গটি আমাদের অনেকের কাছেই অনেক হালকা ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। তারা একে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য বিভিন্নভাবে এর তাৎপর্যগত বিকৃতি সাধন করে থাকে। বস্তুত এটা ইবাদতের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল।

হজ্বের তাৎপর্যগত অপব্যাখ্যা
অনেকে হজ্বকে মুসলমানদের বৈশ্বিক পর্যায়ের মহাসমাবেশ বলে ব্যাখ্যা করে থাকে। এটা বিকৃতি। হজ্বকে যেমন অন্য ধর্মের উপাসনার সঙ্গে মেলানো যাবে না তেমনি একে নিছক সম্মেলনও বলা যাবে না। মুসলমানরা অবশ্যই একত্র হবেন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যা ও সংকট নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন। তবে তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। হজ্বকে এর সঙ্গে মেলানো যাবে না। হজ্ব খালিছ ইবাদত। দেখুন, হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে সামর্থ্য। সামর্থ্যবান ব্যক্তি শিক্ষিত হোক কি অশিক্ষিত, তার উপর হজ্ব ফরয। হজ্ব যদি মুসলমানদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনই হত তাহলে শুধু বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোকদেরকেই সেখানে যেতে বলা হত।

বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিজীবী
প্রসঙ্গত বলি, আমি কিন্তু বুদ্ধিমান বলছি, বুদ্ধিজীবী বলছি না। আমি এ দুটো শব্দের মধ্যে পার্থক্য করি। বুদ্ধিমান হচ্ছে যারা বুদ্ধির দ্বারা খালিকের পরিচয় পেয়েছে, রাসূলের পরিচয় পেয়েছে এবং বুদ্ধিকে মানুষের সেবা ও কল্যাণের কাজে নিবেদিত করেছে। এরা হচ্ছে বুদ্ধিমান। কুরআনের ভাষায় ‘উলূল আলবাব’। পক্ষান্তরে বুদ্ধিজীবী হল যারা বুদ্ধি বিক্রি করে খায়। তাদের বুদ্ধি সমাজের কোনো ক্ষতি ছাড়া উপকার করে না। বর্তমানে বুদ্ধিজীবী নামে যে মহলটি প্রসিদ্ধ তাদের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করলে এটাই বলতে হয়। আমরা কখনো কখনো বুদ্ধিমান অর্থে বুদ্ধিজীবী শব্দ ব্যবহার করি তবে তা ঠিক নয়।

যাই হোক, হজ্ব যদি নিছক মুসলমানের আন্তর্জাতিক সম্মেলন হত তাহলে শুধু বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল মানুষকেই দাওয়াত দেওয়া হত। যেন তারা একত্র হয়ে মুসমিলম উম্মাহর সঙ্কট ও সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। অথচ বিষয়টি এমন নয়।

তদ্রূপ হজ্বের কাজকর্মগুলো লক্ষ করুন, আজ মিনায়, পরদিন আরাফায়, এরপর মুযদালিফায়, আবার মিনায়, এরপর মক্কায়, এভাবে হাজীরা শুধু সফরের ওপর থাকেন। পক্ষান্তরে সম্মেলনের দাবি হচ্ছে, একস্থানে শান্ত হয়ে বসে চিন্তা-ভাবনা ও মতবিনিময় করা। এটা তো এ আমলের সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এজন্য ইবাদত-বন্দেগীর হাকীকত সঠিকভাবে বোঝা উচিত। অন্যথায় এ ধরনের বিভিন্ন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিকভাবে ইবাদত-বন্দেগী করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইসলামি রাষ্ট্রনীতি - ৫ (প্রসঙ্গঃ দারুল আমান)

ALI HASAN OSAMA·SATURDAY, APRIL 8, 2017

আমরা পূর্বের পর্বগুলোতে সবিস্তারে আলোচনা করে এসেছি, যে ভূখণ্ডে ইসলামের বিধান-সংবিধান প্রতিষ্ঠিত, তা-ই দারুল ইসলাম। এর ব্যাপকতার মধ্যে যা যা অন্তর্ভুক্ত হয়—

১. দারুল হারবের কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের শহরেই অবস্থান করে, তবে তাদের ইসলাম গ্রহণের সময় থেকে তা দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

২. দারুল হারবের কোনো ভূমি বিজয় এবং তার ওপর ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়নের ঘোষণার মাধ্যমেও দেশ দারুল ইসলাম হয়। সারাখসি রহ. বলেন, “মুসলমানরা যদি শত্রুদের কোনো ভূমি বিজয় করে এবং তাদের পূর্ণ দখলে আসে, হারবি অধিবাসীরা পলায়ন করে, তবে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা তা দারুল ইসলাম হয়ে যাবে।” [শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৩/১০০৪-১০০৬, ৪/১২৫৩, ১২৫৭; আলমাবসুত— ১০/২৩, ১১৪]

৩. দারুল হারবের কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি মুসলমানদের সাথে ‘যিম্মাহ চুক্তি’ করে এবং মুসলমানরা তাদের অঞ্চলে ইসলামি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত করে, তবে তাও দারুল ইসলাম।

৪. সন্ধির মাধ্যমে কোনো দেশ বিজিত হলে তার ভূমি থাকবে মুসলমানদের মালিকানায় এবং হারবি অধিবাসীরা খারাজ প্রদান করে সেখানে অবস্থান করতে পারবে— এটাও দারুল ইসলাম হিসেবেই গণ্য হবে।

এই চার প্রকারের বাইরে যা-কিছু আছে, সবই দারুল হারব, অন্য শব্দে— দারুল কুফর, দারুশ শিরক। পূর্বের লেখাগুলোতে আমরা পূর্ববর্তী

ইমাম ও ফকিহগণের বক্তব্য উল্লেখের পাশাপাশি উস্তাদ আব্দুল কাদির আওদার ভাষায় দারুল হারবের সুন্দর সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছি। তিনি বলেন, “দারুল হারব প্রত্যেক এমন অনৈসলামিক রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা মুসলমানদের শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রবেশ করেনি, কিবা যেখানে ইসলামের বিধান প্রকাশিত নয়। এ রাষ্ট্রগুলো একই সরকারের পরিচালনাধীন থাক কিবা ভিন্ন ভিন্ন সরকারের— সবই সমান। তার স্থায়ী নাগরিকদের মাঝে মুসলমানরা থাকা বা না থাকা সবই সমান; যতোদিন তারা ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে অক্ষম থাকে।” [আততাশরিউল জিনায়ি আলইসলামি— ১/২৭৭]

আমরা আরো আলোচনা করে এসেছি— দারুল হারব মানে যুদ্ধবিদ্ধস্ত বা যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্র নয়। অনেকে ভাবেন, দারুল হারব শুধু এমন রাষ্ট্রকেই বলা হয়, যা কোনো মুসলিম ভূখণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। বাস্তবতা এমন নয়। কোনো ভূখণ্ডে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হয় (বিস্তারিত জানতে পূর্বের পর্বগুলো দ্রষ্টব্য) আর কোথাও কুফরি এবং শিরকি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে তাকে দারুল হারব বলা হয়। দারুল হারবকে অন্য শব্দে— দারুল কুফর, দারুশ শিরক ইত্যাদিও বলা হয়। এসব পরিভাষার মাঝে কোনো বিরোধ নেই। ফকিহগণ দারুল হারবের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। এজন্যই সারাখসি রহ. বলেন, “দারকে আমাদের দিকে বা তাদের দিকে নিসবত করাটা মূলত ক্ষমতা এবং প্রাধান্যতার বিচারে।’’ [আলমাবসুত, সারাখসি— ১০/১১৪]

এ বিষয়টাকেই আল্লামা কাসানি রহ. আরো বিস্তারিত করে এভাবে বলেছেন, “কোনো রাষ্ট্রে কুফরের আহকাম-বিধিবিধান প্রকাশিত হলে তা দারুল কুফর হয়ে যায়।... রাষ্ট্র শুধু কুফরের বিধানাবলী প্রকাশিত হওয়ার

দ্বারাই দারুল কুফর বলে গণ্য হয়।” [বাদায়িউস সানায়ি— ৯/৪৩৭৫; আরো দেখুন— আহকামুদ দিয়ার, আবিদ সুফয়ানি— ১৫]

বোঝা গেলো, কোনো রাষ্ট্র দারুল হারব (অন্য শব্দে— দারুল কুফর, দারুশ শিরক) হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য লড়াই-যুদ্ধ চলমান থাকা অপরিহার্য নয়। এজন্যই হাম্বলি ফকিহগণ বলেন, “হারবি শব্দটা হারবের দিকে সম্পর্কিত। হারব অর্থ— কিতাল (লড়াই), তেমনি এর অর্থ দূরত্ব এবং বিদ্বেষও। তো দারুল হারব অর্থ হলো এমন রাষ্ট্র, যার সাথে মুসলমানদের দূরত্ব কিবা মুসলমানদের প্রতি রয়েছে যার বিদ্বেষ। হারবিকে হারবি এই দ্বিতীয় অর্থ, তথা দূরত্ব এবং বিদ্বেষ— এর বিচারেই বলা হয়। কার্যত যুদ্ধে লিপ্ত থাকা জরুরি নয়। [আলমুতলি’ আলা আবওয়াবিল মুকনি’, বা’লি— ২২৬]

উম্মাহর ফকিহগণের আলোচনা থেকে তো স্পষ্ট অনুমিত হয়, দারুল ইসলাম এবং দারুল হারবের বাইরে আর কোনো বিভক্তি তাদের দৃষ্টিতে ছিলো না। সমগ্র পৃথিবী দু’ভাগে বিভক্ত; একভাগের নাম দারুল ইসলাম, আরেক ভাগের নামের দারুল হারব। তৃতীয় আর কিছু নেই। এ ব্যাপারে উম্মাহর বিদগ্ধ ফকিহণের ঐকমত্য রয়েছে। এখানে আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকজনের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি।

কাজি আবু ইয়া’লা রহ. বলেন, “প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড যেখানে বিজয় কুফরের নয়, ইসলামের বিধান-সংবিধানের, তা দারুল ইসলাম। আর প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড যেখানে বিজয় ইসলামের নয়, কুফরেরর বিধান-সংবিধানের, তা দারুল কুফর। ব্যতিক্রম হলো গোমরাহ কাদারিয়্যাদের বক্তব্য। তারা বলে, যে ভূখণ্ডে পাপিষ্ঠদের প্রাধান্য, কাফির বা মুসলিমদের নয়, তা দারুল কুফর নয়, দারুল ইসলামও নয়; তা হলো দারুল । এ বক্তব্যের ভিত্তি হলো, তাদের সেই মূলনীতি— ‘মানযিলাতুন

বাইনাল মানযিলাতাইন’ (ইসলাম এবং কুফরের মাঝে আরেকটি স্তর)। আমাদের দলিল ইমানের অধ্যায়ে বিগত হয়েছে। শরিয়তের মুকাল্লাফ যারা তাদের তো এ কয়েকটি অবস্থাই হতে পারে—

১. কাফির
২. মুমিন— পরিপূর্ণ ইমানের অধিকারী বা ত্রুটিপূর্ণ ইমানের অধিকারী।

তো সকল মানুষ হয়তো মুমিন, কিবা কাফির। এমন তো হতে পারে না যে, কোনো শরিয়তের মুকাল্লাফ মানুষ মুমিনও নয়, আবার কাফিরও নয়। (উল্লেখ্য, মুনাফিক আলাদা কিছু নয়। তারা তো কাফিরদের সর্বনিম্ন শ্রেণি। চিরস্থায়ী জাহান্নামী। জাহান্নামের সবচে নিম্নসতরে হবে তাদের বসবাস।) তেমনিভাবে ‘দার’ও দুই অবস্থা থেকে মুক্ত হবে না। হয়তো তা দারুল কুফর হবে, কিবা তা দারুল ইসলাম হবে। {আলমু’তামাদ ফি উসুলিদ দীন, আবু ইয়া’লাঃ ২৭৬}

আল্লামা ইবনু মুফলিহ রহ. বলতেন, “প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড, যেখানে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত, তা দারুল ইসলাম। আর যদি কোনো ভূখণ্ডে কুফরি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে তা দারুল কুফর। এদু’য়ের বাইরে আর কোনো দার নেই।’’ {আরো দেখুন— আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ইবনুল কায়্যিমঃ ১/৪৭৫-৪৭৬}

হাঁ, তৃতীয় আরেকটি ‘দারে’র অস্তিত্বের বর্ণনা আমরা পাই ইউরোপীয় ও প্রাচ্যবিদ গবেষকদের কাছে তারা এটাকে ‘দারুল আহ্দ’ নামে, কেউ ‘দারুল আমান’ নামে, কেউ ‘দারুল মুওয়াদায়াহ’ নামে উল্লেখ করেন। {দেখুন— ইকতিশাফুল মুসলিমিন লি উরুব্বা, বার্নাড লুইসঃ ৬৯; আততাকসিমুল ইসলামি লিল মা’মুরাহ, ড. মুহিউদ্দিন কাসিম; ৪৯;

মানহাজুল ইসলাম ফিল হারব ওয়াস সালাম, ড. উসমান জুমআহ যামিরিয়্যাহঃ ৫৮}

সর্বপ্রথম আমরা এই বন্টন দেখতে পাই ‘দায়িরাতুল মা’আরিফ আলইসলামিয়া’র (Islamic Encyclopedia) লেখকদের কাছে। এরপর বিদগ্ধ গবেষকদের মধ্যে এই আলোচনার সূত্রপাত করেন ড. নজিব (আশশারুদ দুওয়ালি ফিল ইসলামঃ ৫০)। তারপর একে আরো শক্তিশালী করেন শায়খ আবু যুহরা (আলআলাকাতুদ দুওয়ালিয়্যাহঃ ৫৫; নাযরিয়্যাতুল হারবঃ ১৪)। একই চিন্তা লালন করেন ড. ওয়াহবা যুহায়লি, ড. মুহাম্মাদ দাসুকি, ড. আব্দুল হামিদ আলহাজ, ড. মাজিদ, উস্তাদ আল্লাল আলফাসি আলমাগরিবি

{দেখুন— আসারুল হারবঃ ১৭৫-১৭৬; আলআলাকাতুদ দুওয়ালিয়্যাহঃ ১০৭-১০৮; আলইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ওয়া আসারুহু ফিল ফিকহঃ ৩৩০; আননুযুমুদ দুওয়ালিয়্যাহঃ ১৮২-১৮৩; আলকানুনুদ দুওয়ালি আলইসলামিঃ ২২-২৩; মাকাসিদুশ শারিয়াহ ওয়া মাকারিমুহাঃ ২২৯}

আমাদের ইমামগণের মতে দারুল হারব দুই প্রকার।

১. এমন দারুল হারব, যার সঙ্গে মুসলমানদের কোনো চুক্তি নেই। এটা হলো দারুল খাওফ— অর্থাৎ, ভয়ের শহর। যেখানে মুসলমানরা নিরাপদ নয়।

২. এমন দারুল হারব, যার অধিবাসীরা মুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানদের নিরাপত্তা চুক্তি করেছে। এটাকে আমরা দারুল আমান, দারুল আহদ বা দারুল মুওয়াদাআহ বলতে পারি। এই রাষ্ট্র যদিও ইসলামি রাষ্ট্র নয়, কিন্তু সেখানে চুক্তির কারণে মুসলমানরা নিরাপদ। যেমন ছিলো রাসুলের যুগে নাজাশির রাষ্ট্র হাবাশাহ (ইথিওপিয়া)।

দ্বিতীয় প্রকারটিকেও আমাদের মহান ইমামগণ দারুল হারবের মাঝেই গণ্য করেছেন। তারা এটাকে স্বতন্ত্র কোনো ‘দার’ নয়, বরং দারুল হারব গণ্য করেই এর ভিত্তিতে অনেক মাসআলা এবং ফতোয়া প্রদান করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, “দারুল হারবের দেশসমূহের কোনো দেশের অধিবাসীরা যদি মুসলমানদের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তবদ্ধ হয়, তারা প্রতি বছর মুসলমানদের খারাজ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্য কোনো কর প্রদান কর প্রদান করবে এই শর্তে যে, মুসলমানরা তাদের ওপর ইসলামের বিধিবিধান প্রয়োগ করবে না, এবং তারা যিম্মিও হয়ে যাবে না— এরপর তাদের কেউ এই চুক্তির ভিত্তিতে অনেক ধনসম্পদ নিয়ে দারুল ইসলামের উদ্দেশে বের হয়, তাহলে সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত।”

ইমাম সারাখসি রহ. এর ইল্লত (Cause) বর্ণনা করেন, "যে লোকটি দারুল ইসলামের উদ্দেশে বেরিয়েছে, সে তার অবস্থানুযায়ী হারবি, যিম্মি নয়, তবে সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। কেননা চুক্তিবদ্ধ নাগরিকদের ওপর ইসলামের বিধান প্রয়োগ হয় না।... এই চুক্তির দ্বারা তাদের দেশ দারুল ইসলাম হয়ে যায়নি, যেহেতু সেখানে ইসলামের বিধিবিধান কার্যকর করা হয়নি। তা দারুল হারবই থেকে যায়।" {আসসিয়ারুল কাবির মা’আ শরহিস সারাখসিঃ ৫/২১৫৭, ২১৬৫}

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. আরো বলেন, "চুক্তিকারীদের কোনো নাগরিক তাদের দেশে (দারুল মুওয়াদাআহ-তে) অপর কোনো নাগরিককে হত্যা করলে তার ওপর কিসাস কার্যকর হবে না। আর যদি আমাদের রাষ্ট্রে (দারুল ইসলামে) কোনো মুসতামিন অপর কোনো মুসতামিনকে হত্যা করে, তবে তার ওপর কিসাস অপরিহার্য হবে।”

ইমাম সারাখসি রহ. এর ইল্লত (Cause) বর্ণনা করেন, “কেননা চুক্তিকারীরা ইসলামের বিধিবিধান নিজেদের ওপর অপরিহার্য করে নেয়নি। কেননা তারা চুক্তিই করেছে এই মর্মে যে, তাদের ওপর ইসলামের

বিধিবিধান কার্যকর করা হবে না। তাই তাদের রাষ্ট্র পূর্বের মতো দারুল হারবই থাকবে।” {আসসিয়ারুল কাবির মা’আ শরহিস সারাখসিঃ ৫/১৮৫৭, ১৮৯৩}

তিনি আরো বলেন, “কেননা যখন তারা ইসলামের বিধানের সামনে নতি স্বীকার করেনি, তখন চুক্তি করার দ্বারা চুক্তিকারী হলেও তারা ‘হারবি’র কাতার থেকে বেরিয়ে যায়নি। তুমি দেখছো না, কৃত চুক্তির মেয়াদ গত হলেই তো পুনরায় তারা (কাট্টা) হারবিই হয়ে যাবে।” {শরহুস সিয়ারিস সগির, আলমাবসুতের অন্তর্ভুক্তঃ ১০/৮৮-৮৯, ৯৭}

এবার আমরা বর্তমান বিশ্লেষকগণের বক্তব্যের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করি। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সবার বক্তব্য উদ্ধৃত করা তো সম্ভব নয়। তাই সূত্রগুলো উল্লেখ করে দিয়েছি। কেউ চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারবে। তবে সংক্ষেপে তাদের বক্তব্যগুলোর মৌলিক কয়েকটি পয়েন্টের পর্যালোচনা উল্লেখ করার প্রয়াস পাবো।

১. তৃতীয় কোনো ‘দার’ এর অস্তিত্ব গণ্য করা মহান ইমাম এবং ফকিহণের ঐকমত্যের বিপরীত। সন্ধিকারীরা ইসলামের বিধিবিধানের অনুগত হলে তাদের রাষ্ট্র ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবেই গণ্য হবে, তাতে মুসলমানের সংখ্যা যতো কমই হোক কিবা মোটেও তাদের অস্তিত্ব না থাক। আর যদি তারা ইসলামের বিধান-সংবিধান এবং ইসলামি শাসনক্ষমতার সাথে একমত না হয়, তাহলে তা দারুল হারব। এর বাইরে আর কোনো সুরত নেই।

২. কেউ কেউ ইমাম শাফেয়ি এবং তার শাগরেদদের বক্তব্য দ্বারা এই তৃতীয় ‘দার’কে প্রমাণ করতে চান। ইমাম শাফেয়ি তো এক্ষেত্রে বড়ই মাজলুম। পূর্বের পর্বে আলোচনা করে এসেছি, একশ্রেণির অথর্ব ইমাম শাফেয়ির বক্তব্য বিকৃত করে পুরো দুনিয়াকে এক ‘দার’ হিসেবে অভিহিত

করতে চায়। তারা দারুল ইসলাম এবং দারুল হারবের বিভক্তিকেই স্বীকার করে না। এই আরেক শ্রেণি তার বক্তব্যকে অপাত্রে প্রয়োগ করে, পুরো দুনিয়াকে তিন ‘দার’ বানাতে চায়। তবে মজার বিষয়, তারা তার বক্তব্যকে হুবহু উদ্ধৃত করেন না। এই অভিমতকে শুধু তার দিকে নিসবত করেই ক্ষান্ত হন। আল্লাহ জানেন, সামনে কে এসে কীভাবে আরো বিকৃত করে।

৩. কেউ কেউ তো ইমাম মুহাম্মাদ এবং কাজি আবু ইয়া’লা রহ. এর দিকেও এই সারহীন অভিমতকে নিসবত করে। ওপরে তো আমরা তাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখ করেই এসেছি। কাজি আবু ইয়া’লা রহ. তো পরিষ্কার ভাষায় তৃতীয় ‘দারে’র অস্তিত্ব অস্বীকার করছেন।

৪. কেউ ইবনে তাইমিয়া রহ. এর একটি ফতোয়াকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। আমাদের এই সিরিজের তৃতীয় পর্বে আমরা সে সম্পর্কে আলোচনা করে এসেছি।

৫. কেউ মাওয়ারদি রহ. এর একটি বক্তব্য থেকে ভুল বুঝে বা অপাত্রে প্রয়োগ করেও এই মাকসাদ হাসিল করেছেন। তবে এই তৃতীয় ‘দারে’র অস্তিত্বের প্রথম ঘোষক প্রাচ্যবিদ মহোদয়গণ এতোটা বে-ইনসাফ হননি। তারা পর্যন্ত মাওয়ারদি রহ. এর বক্তব্য দ্বারা যে তৃতীয় কোনো ‘দারে’র অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না— স্বীকার করেছেন।

৬. হাবাশাকে তৃতীয় ‘দারে’র পক্ষে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা ইলমি অগভীরতার প্রমাণ বহন করে। কেননা হাবাশায় ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত ছিলো না, তাই তা দারুল হারব। হাঁ, সেখানে মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। এর কারণে তা দারুল হারব থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা আমরা ওপরে বলে এসেছি, দারুল হারব দু’ধরনের— দারুল খাওফ (যেখানে মুসলমানরা নিরাপদ নয়) এবং দারুল আহদ, দারুল মুওয়াদাআহ বা দারুল আমান (যেখানে মুসলমানরা নিরাপদ)।

{{চলবে ইনশাআল্লাহ}}

ইসলামি রাষ্ট্রনীতি - ৭ (দারুল হারবে সুদের লেনদেন)

ALI HASAN OSAMA·FRIDAY, MARCH 31, 2017

পূর্বের পোস্টে আমরা ‘দারে’র ভিন্নতার কারণে আহকামের ভিন্নতা এবং দারুল হারবে হারবিদের সাথে মুসলমানদের আচরণরীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং সেখানে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর বর্ণিত ব্যাপক মূলনীতি উদ্ধৃত করেছি। তার আলোকে আমরা ইনশাআল্লাহ ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি মাসআলা আলোচনা করবো। আজ আলোচ্যবিষয়— “দারুল হারবে সুদের লেনদেন”।

(উল্লেখ্য, বাংলা সুদের থেকে আরবি ‘রিবা’ শব্দটি অনেক ব্যাপক। এখানে বোঝার সুবিধার্থে সুদ শব্দ উল্লেখ করা হলো। এদুয়ের মাঝে পার্থক্য জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট স্থানে দ্রষ্টব্য।)

‘দারে’র ভিন্নতার কারণে আহকামে ভিন্নতা আসে কি না সেই ইখতিলাফের ভিত্তিতে এই মাসআলায় ইমামগণের দু’ধরনের অভিমত রয়েছে। তবে কিছু বিষয়ে তাদের সকলের ঐকমত্যও রয়েছে। মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আমরা উভয় ফরিকের ঐকমত্যের ক্ষেত্রগুলোর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করি।

ক. সকল ইমাম ও ফকিহের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত— দারুল ইসলামে মুসলমানের জন্য সুদি লেনদেন করা বৈধ নয়, এবং এমন স্থানেও তা বৈধ

নয়, যেখানে মুসলমানদের বিধিবিধান চলে, যেমন দারুল হারবে অবস্থানরত মুসলিম সেনাদল। চাই উক্ত লেনদেন কোনো মুসলমানের সাথে করা হোক, কিবা কোনো যিম্মি বা মুসতামিন (দারুল ইসলামে অবস্থানরত নিরাপত্তাগ্রহণকারী হারবি) এর সাথে। কেননা কোনো মুসলমানের জন্য অমুসলিমদের সাথে শুধু সে লেনদেনগুলোই বৈধ, যা মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে বৈধ।

খ. তেমনি সকল ইমাম ও ফকিহের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত— দারুল হারবে কোনো মুসলমানের জন্য হারবিকে সুদ দেয়া বৈধ নয়, যেমনিভাবে দারুল ইসলামে তা বৈধ নয়। আর দারুল হারবে অবস্থানরত মুসলমানদের সাথে তার আচরণবিধি ঠিক তেমনই হবে, যেমন দারুল ইসলামে অবস্থানরত মুসলমানদের সাথে হয়। কেননা মুসলমান যেখানেই থাক, সে অবশ্যই ইসলামের বিধিবিধান মান্যকারী।

এরপর তৃতীয় বিষয়টিতে এসে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য হয়ে গেছে। কোনো মুসলমান যদি ‘আমান’ নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করে, এরপর হারবিদের সাথে সুদি চুক্তিতে ক্রয়-বিক্রয় বা অন্য কোনো লেনদেন করে আর সে হারবিদের থেকে সুদ গ্রহণ করে— এ সুরতে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম আহমদের একটি বর্ণনা (শরহুয যারকাশি দ্রষ্টব্য, ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ঝোঁকও এই বর্ণনার দিকে অনুমিত হয়।) এবং আরো কিছু সালাফের মতে, যেমন ইবরাহিম নাখয়ি, ইবনুল মাজিশুন এবং অন্য আরো ক’জনের মতে তা বৈধ হবে।

আর অধিকাংশ ইমাম ও ফকিহের মতে তা বৈধ নয়। নিচে আমরা ইমামগণের বক্তব্য এবং উভয় ফরিকের মৌলিক দলিলগুলোর প্রতি আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর অভিমত

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, “মুসলমান যখন ‘আমান’ নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করে, তখন তার জন্য হারবিদের মনোতুষ্টির সাথে তাদের সম্পদ গ্রহণ করা বৈধ — তা যে-কোনো পন্থায়ই হোক।” {আসসিয়ারুল কাবির — ৪/১৪১০, ১৪৮৬; কিতাবুল আসল, সিয়ার অধ্যায় — ১৮১}

ইমাম সারাখসি রহ. এর ইল্লত (Cause) বর্ণনা করেন, “কেননা ‘আমান’ নিয়ে প্রবেশ করার দ্বারাই তো আর হারবিদের অর্থসম্পদ সংরক্ষিত (معصوم) হয়ে যায় না। তবে সে ‘আমান’ চুক্তির দ্বারা এ অঙ্গীকার করে নিয়েছে যে, সে খেয়ানত করবে না। এজন্য খেয়ানত থেকে বেঁচে থাকা তার ওপর অপরিহার্য। যে-কোনো পন্থায় সে তাদের মনোতুষ্ট করে অর্থসম্পদ গ্রহণ করলে সে তো বৈধ পন্থায় তা গ্রহণ করেছে বলেই বিবেচিত হবে। সে কোনো ধোঁকা-প্রতারণার তো আশ্রয় নেইনি। এজন্য তার জন্য সেই সম্পদ পবিত্র বলে বিবেচিত হবে। বন্দি এবং ‘আমান’গ্রহণকারী উভয়ের এক্ষেত্রে একই বিধান। এমনকি সে যদি এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম গ্রহণ করে, কিবা অর্থের বিনিময়ে মৃত বস্তু বিক্রি করে, অথবা কিমার-জুয়ার পন্থায় তাদের থেকে অর্থসম্পদ গ্রহণ করে — এ সবই তার জন্য বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

এটা পুরোটাই ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর অভিমত।

ইমাম সুফয়ান সাওরি রহ. বলেন, বন্দি মুসলিমের জন্য তা তো বৈধ হবে; কিন্তু ‘আমান’গ্রহণকারী মুসলিমের জন্য তা বৈধ হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এরও একই মত।

তাদের জবাবে আমরা বলবো, বন্দির থেকে ‘আমান’গ্রহণকারীর বিধানের ভিন্নতা তো শুধু হারবিদের মনোতুষ্টি ছাড়ার অর্থসম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে। মনোতুষ্টির সাথে অর্থসম্পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে ‘আমান’গ্রহণকারীর বিধান বন্দির মতোই। কেননা তার ওপর শুধু এতোটুকু অপরিহার্য, সে তাদেরকে ধোঁকা দিবে না। আর মনোতুষ্টির সাথে অর্থসম্পদ গ্রহণের মাঝে তো কোনো ধোঁকা নেই। {শরহুস সিয়ারিল কাবির — ৪/১৪১০-১৪১১}

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. আরো বলেন, “আমানগ্রহণকারী যদি তাদের কাছে এক বছর মেয়াদে দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি করে, এরপর আমাদের রাষ্ট্রে চলে আসে, তারপর পুনরায় তাদের কাছে ফিরে যায় অথবা সেই বছর চলে এসে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর গিয়ে দিরহাম গ্রহণ করে, তাহলে কোনোই সমস্যা নেই। কেননা মুসলমানদের বিধিবিধান ওখানে চলে না। {আসসিয়ারুল কাবির— ৪/১৪৮৬; কিতাবুল আসল, সিয়ার অধ্যায়— ১৮১; শরহু মুশকিলিল আসার, তাহাবি— ৮/২৪৮}

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, কোনো মুসলমান যদি ‘আমান’ নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করে, এরপর তাদের কাছে দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি করে, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা মুসলমানদের বিধিবিধান তাদের ওপর প্রয়োগ হবে না। তাই তাদের সন্তুষ্টির সাথে যে-কোনো উপায়ে তাদের সম্পদ গ্রহণ করে, তা বৈধ। {কিতাবুর রদ আলা সিয়ারিল আওযায়ি; কিতাবুর রাদ আলা মুহাম্মাদ, কিতাবুল উম— ৭/৩৭৮-৩৭৯}

এবার আমরা তাদের দলিলগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করি। এই মাসআলার ভিত্তি হাদিস আসার এবং কিয়াসের ওপর। ধারাবাহিকভাবে সবগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর দলিল

১ম দলিল—

ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله

রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, শোনো, জাহেলি যুগের সুদ বিলুপ্ত। তোমরা মূলধন পাবে। তোমরা জুলুম করবে না। তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না। তবে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদের কথা ভিন্ন। কেননা তা পুরোটাই বিলুপ্ত। {সহিহ মুসলিম — ১২১৮ (১৪৭); সুনানে ইবনে মাজাহ — ৩০৭৪; সুনানে তিরমিযি — ৩০৮৭। ইমাম তিরমিযি বলেন, এই হাদিসটি হাসান সহিহ।}

আব্বাস রা. এর ইসলামগ্রহণের সময় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে। কেউ বলেন, তিনি বদর যুদ্ধের পূর্বে ইসলামগ্রহণ করেছেন। আর কারো বক্তব্য হলো, বদরযুদ্ধে তিনি বন্দি হয়েছেন। এরপর ইসলামগ্রহণ করেছেন। অনন্তর রাসুলুল্লাহ সা. সকলের অনুমতি নিয়ে তাকে মক্কায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তো ইসলামগ্রহণের পর থেকে পর্যন্ত তিনি মক্কায় অবস্থানরত ছিলেন। মক্কা বিজয় পর্যন্ত সেখানে তিনি সুদি লেনদেন করতেন। অথচ সুদ হারাম হওয়ার বিধান মক্কা বিজয়ের অনেক আগেই নাযিল হয়েছে। খায়বারের দিন রাসুলুল্লাহ সা. দুই সাদ রা. (সাদ ইবনে আবি ওয়াককাস এবং সাদ ইবনে উবাদা) এর উদ্দেশ্যে বলেছেন—

أربيتما فردا

তোমরা সুদি লেনদেন করেছো। তাই ফিরিয়ে দাও। {মুয়াত্তা মালিক — ২/৬৩২; আততামহিদ— ২৪/১০৬; শরহুয যারকানি — ৩/২৭৬। উল্লেখ্য, কারো কারো বর্ণনায় দিনটিকে হুনায়নের দিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন — গাওয়ামিযুল আসমা, ইবনে বাশকুওয়াল — ২০২}

তাছাড়া পবিত্র কোরআনের আয়াত —

يأيُّها الَّذين آمنوا لا تأكلوا الرِّبا أضعافاً مُضاعفة

হে ইমানদারগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেও না। {সুরা আলে ইমরান — ১৩০}

এই আয়াত মক্কা বিজয়ের অনেক পূর্বে উহুদ যুদ্ধের সময়ে নাযিল হয়। এরপরও মক্কা বিজয়ের সময় রাসুলুল্লাহ সা. আব্বাস রা. এর লেনদেনগুলোকে বাতিল ঘোষণা করেননি, শুধু সেগুলো ছাড়া, যার কবজা পূর্ণ হয়নি — এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দারুল হারবে মুসলমান এবং হারবির মাঝে সুদি লেনদেন বৈধ। আর কবজা করার পূর্বেই সেই ভূমি দারুল ইসলাম হয়ে গেলে চুক্তি নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। {শরহুস সিয়ারিল কাবির — ৪/১৪৮৭-১৪৮৮}

ইবনে আব্বাস রা. এর সুদ বিলুপ্তির বর্ণনার পরে ইমাম সারাখসি রহ. বলেন, "এ বিধান দেয়া হয়েছে, কেননা ইবনে আব্বাস রা. ইসিলামগ্রহণ করার পরে মক্কায় ফিরে এসেছেন আর তিনি সুদি লেনদেন করতেন। তিনি তার কাজকর্মের কথা রাসুলুল্লাহ সা. থেকে গোপন রাখতেন না। এরপরও রাসুলুল্লাহ সা. যখন তাকে তা থেকে বারণ করেননি, এটাই প্রমাণ করে যে, তা বৈধ। এর মধ্য থেকে মক্কা বিজয়ের মুহূর্ত পর্যন্ত যা কবজা করা হয়নি রাসুলুল্লাহ সা. সেগুলোকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন। আমাদের অভিমতও এটাই। এই আয়াতের প্রেক্ষাপটও তাই —

وذَرُوا ما بَقيَ منَ الرِّبا

তোমরা বকেয়া সুদ ছেড়ে দাও। {সুরা বাকারাহ — ২৭৮} । {দেখুন — আলমাবসুত— ১৪/৫৭}

ইমাম আবু জাফর তহাবি রহ . বলেন, “আব্বাস রা . এর ইসলামগ্রহণ খায়বার বিজয়ের পূর্বেই হয়েছিলো , যেমনতা হাজ্জাজ ইবনে ইলাত সুলামির হাদিস (দেখুন — শরহু মুশকিলিল আসার — ৮/২৪২-২৪৪; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক — ৫/৪৬৬-৪৬৯; মুসনাদে আহমাদ — ৩/১৩৮-১৩৯; বায়হাকি — ৯/১৫১) প্রমাণ করে। সে সময়ে দারুল ইসলামে মুসলমানদের ওপর সুদ হারাম ছিলো। ... এরপর বিদায় হজের ভাষণে রাসুলুল্লাহ সা . বলেন—

ربا الجاهلية موضوع

“জাহেলি যুগের সুদ বিলুপ্ত ”— আ বাক্যের মাঝেই প্রমাণ রয়েছে যে , মক্কা যেহেতু দারুল হারব ছিলো , তাই বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে সুদ প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কেননা মক্কা থেকে জাহিলিয়্যাত দূর হয়েছে তার বিজয়ের দ্বারা। রাসুলুল্লাহ সা . এর ওই বাক্যটিতে প্রমাণ রয়েছে যে , আব্বাস রা . এর সুদও কায়িম ছিলো অনন্তর রাসুলুল্লাহ সা . তা বিলুপ্ত করেছেন। কেননা তা -ই শুধু বিলুপ্ত করা যায় , যা কায়িম থাকে। যা পূর্বেই রহিত হয়ে আছে , তা বিলুপ্ত করা যায় না। খায়বার বিজয় হয়েছে সপ্তম হিজরিতে। মক্কা বিজয় হয়েছে অষ্টম হিজরিতে। আর বিদায় হজ হয়েছে দশম হিজরিতে।

এতেই প্রমাণ রয়েছে যে , মক্কা জয় পর্যন্ত আব্বাস রা . এর সুদি লেনদেন অব্যাহত ছিলো। অথচ তিনি তো মুসলিম আগেই হয়েছেন। এর মাঝে এই প্রমাণও রয়ে গেছে যে , মক্কা দারুল হারব হওয়ায় সেখানে মুসলমান এবং উশরিকদের মধ্যে সুদি লেনদেন হালাল ছিলো। অথচ তখন দারুল ইসলামে তা মুসলমানদের মাঝে হারাম ছিলো। {শরহু মুশকিলিল আসার , তাহাবি —

৮/৪৪২-৪৫২; মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা লিত তাহাবি, জাসসাস — ৩/৪৯২; আলমুকাদ্দিমাতুল মুমাহহিদাত — ২/৯-১০; আহকামুল কুরআন, জাসসাস — ১/৩৭১}

২য় দলিল—

মাকহুল রহ. রাসুলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন—

لا ربا بين أهل الحرب

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, আমার ধারণা, এরপরের শব্দটা এরূপ—

و أهل الإسلام

ইমাম সারাখসি রহ. এভাবে বর্ণনা করেছেন—

لا ربا بين المسلمين و بين أهل الحرب في دار الحرب

অর্থাৎ — দারুল হারবে মুসলমান এবং হারবিদের মাঝে কোনো সুদ নেই। {আররাদ্দু আলা সিয়ারিল আওযায়ি — ৯৭; কিতাবুল উম — ৭/৩২৬; মারিফাতুস সুনান ওয়াল আসার, বায়হাকি — ১৩/২৭৬; নাসবুর রায়াহ — ৪/৪৪; তাকমিলাতুল মাজমু শরহুল মুহাযযাব, নববি — ১১/১৫৯; ফাতহুল কাদির — ৫/৩০০}

ইমাম সারাখসি রহ. বলেন, “এই হাদিসটি যদিও মুরসাল, তবে মাকহুল রহ. ফকিহ এবং সিকাহ। এমন ব্যক্তিত্ব থেকে মুরসাল গ্রহণীয়। দারুল হারবে হারবিদের কাছে দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি করার বৈধতার ব্যাপারে এটা ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর দলিল।” {আলমাবসুত, সারাখসি — ১৪/৫৬}

৩য় দলিল—

বনু কাইনুকার হাদিস। কেননা নবি সা. যখন তাদেরকে নির্বাসিত করেছেন, তখন তারা বললো, আমাদের কিছু ঋণ রয়েছে, যা পরিশোধের মেয়াদ এখনও আসেনি। তখন রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, নগদ দিয়ে দাও এবং (এর কারণে কিছু) কম দাও। বনু নাযির গোত্রকে নির্বাসন করার সময়ও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। {আসসিয়ারুল কাবির— ৪/১৪১২}

সারাখসি রহ. বলেন, এটা তো সুবিদিত যে, এ ধরনের লেনদেন মুসলমানদের মাঝে বৈধ নয়। কেননা যার যিম্মায় নির্দিষ্ট মেয়াদে অন্য কারো ঋণ থাকে, এরপর সে নগদ দেয়ার শর্তে তা কিছুটা কমিয়ে দেয়, তাহলে এটা বৈধ নয়। উমর, যায়দ বিন সাবিত এবং ইবনে উমর রা. তা অপছন্দ করেছেন। নবিজি সা. তাদের ব্যাপারে এটার বৈধতা দিয়েছেন, কেননা তারা সেই সময়ে হারবি ছিলো। এজন্য তাদেরকে নির্বাসিত করেছেন। তো আমরা জানতে পারলাম, মুসলমান এবং হারবির মাঝে এমন সব বিষয় বৈধ, যা মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে বৈধ নয়। {শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৪/১৪১২}

৪র্থ দলিল— কিয়াস

দারুল হারবে হারবিদের সম্পদ তো মৌলিকভাবে বৈধ। তা গ্রহণ করার অর্থ হলো অমালিকানাধীন মুবাহ সম্পদের কবজা নেয়া। ‘আমান’ গ্রহণের মাধ্যমে তা সংরক্ষিত সম্পদ হয়ে যায়নি। তবে ‘আমান’গ্রহণকারী মুসলিম দারুল হারবে পবেশের সময়ে অঙ্গীকার করে নিয়েছে যে, সে তাদেরকে ধোঁকা দিবে না, তাদের মনোতুষ্টি ছাড়া তাদের অর্থসম্পদ ভোগদখল করবে না। এখন তার জন্য এ বিষয়গুলো নিষিদ্ধ, যাতে সে ধোঁকাবাজ প্রতীয়মান না হয়। হারবি যখন স্বেচ্ছায় তার অর্থ প্রদান করলো, তখন নিষিদ্ধতার কারণ দূর হয়ে গেলো। মৌলিক বৈধতার কারণেই

এক্ষেত্রে তা গ্রহণ করা বৈধ হয়েছে, সুদ হালাল— এ বিবেচনায় নয়। {আলইনায়াহ— ৫/৩০০; আলবাহরুর রায়িক— ৬/১৪৭; তাবয়িনুল হাকায়িক— ৪/৯৭; বাদায়িউস সানায়ি’— ৯/৪৩৭৮; মাজমাউল আনহুর এবং আদদুররুল মুনতাকা— ২/৮৯-৯০}

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মুহাম্মাদের বক্তব্যের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইমাম সারাখসি রহ. বলেন, “তারা বলছেন, এ তো মনোতুষ্টির সাথে কাফিরের সম্পদ গ্রহণ। এর অর্থ— তাদের অর্থসম্পদ মৌলিক বৈধতার ওপরেই আছে। সে নিজেই অঙ্গীকার করে নিয়েছে যে, তাদের সাথে খেয়ানত করবে না। এ সকল উপায়ে সে তাদেরকে সন্তুষ্ট করে নিচ্ছে ধোঁকা-প্রতারণা থেকে দূরে থাকার জন্য। এরপর সে তাদের সম্পদ গ্রহণ করছে মৌলিক বৈধতার কারণেই, (নিষিদ্ধ) চুক্তির কারণে নয়। এর মাধ্যমেই হুকুম দারুল ইসলামে অবস্থানকারী আমানগ্রহণকারী কাফিরদের থেকে ভিন্ন হয়ে গেলো। কেননা ‘আমানে’র মাধ্যমে তাদের অর্থস্মপদ সংরক্ষিত হয়ে গেছে। বৈধতার বিচারে তা গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। {আলমাবসুত— ১০/৯৫; আলফুরুক,কারাবিসি— ১/৩২৬-৩২৭; মাজমাউল আনহুর— ২/৯০; ফাতাওয়া শামি— ৫/১৮৬}

এই হলো তাদের দলিলের প্রতি সংক্ষিপ্ত আলোকপাত। {আরো দেখুন— শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৪/১৪৮৬; শরহু মুশকিলিল আসার, তাহাবি— ৮/২৪৮-২৪৯; মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা— ৩/৪৯১; তাবয়িনুল হাকায়িক — ৪/৯৭; ফাতহুল কাদির এবং আলইনায়াহ— ৫/৩০০; আলবাহরুর রায়িক— ৬/১৪৭; মাজমাউল আনহুর— ২/৯০; আলমুকাদ্দিমাতুল মুমাহহিদাত, ইবনে রুশদ— ২/৯-১০; আলমুবদি’ শরহুল মুকনি’— ৪/১৫৭; আলইনসাফ— ৫/৫৩; আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবি— ১/৫১৬; ইখতিলাফুল ফুকাহা, তাবারি— ৫৯}

জমহুরের অভিমত

অধিকাংশ ইমাম ও ফকিহ— আবু ইউসুফ, হাসান ইবনে যিয়াদ, শাফেয়ি, মালিক, আওযায়ি, লাইস ইবনে সা’দ, আবু সাওর, আহমদ ইবনে হাম্বলের এক বর্ণনা, ইসহাক এবং অন্যান্যদের অভিমত হলো, মুসলমানের জন্য দারুল হারবে হারবিদের থেকে সুদ গ্রহণ করা জায়িয নয়। {দেখুন— প্রাগুক্ত এবং আওরাদ্দু আলা সিয়ারিল আওযায়ি, ইমাম আবু ইউসুফ— ৯৬-৯৭; কিতাবুল আসল, সিয়ার অধ্যায়— ১৮০-১৮১; কিতাবুল উম, ইমাম শাফেয়ি— ৪/১৬২-১৬৫, ১৮১-১৮২, ৭/৩২৬; তাকমিলাতুল মাজমু’— ১১/১৫৮-১৫৯; রাওযাতুত তালিবিন— ৩/৩৯৫; আলমুগনি, ইবনে কুদামা— ৪/১৭৬-১৭৭, ১০/৫০৭; কাশশাফুল কিনা’— ৩/২৫৯; মাতালিবু উলিন নুহা— ৩/১৮৯; আলমুহাল্লা— ৮/৫১৪-৫১৫; আলফুরুক, কারাফি— ৩/২০৭; হাশিয়া ইবনুশ শাত আলাল ফুরুক— ২৩১; ইখতিলাফুল ফুকাহা, তাবারি— ৬০-৬৩; মা’রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার, বায়হাকি— ১৩/২৭৬}

জমহুরের দলিল

জমহুরের দলিল তো অসংখ্য। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করছি—

১. পবিত্র কোরআনের আয়াত এবং অগণিত সহিহ হাদিসে সুদ নিষিদ্ধতার ব্যাপকতা। এসব তো কোনো জায়গা বা কোনো কাওমের সাথে বিশেষিত নয়। সর্বদা সব জায়গায় প্রযোজ্য।

২. মুসলমান যেখানেই থাক, শরিয়তের বিধান মান্যকারী থাকবে। কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা তার থেকে হক বিদূরিত করবে না, যেমন দারুশ শিরকে অবস্থান সত্ত্বেও তার থেকে নামাজের বিধান রহিত হয় না। আর ইসলামের বিধান হচ্ছে এ ধরনের কারবার-লেনদেন হারাম। যেমনিভাবে তা দারুল ইসলামে আমান নিয়ে বসবাসকারী হারবিদের সঙ্গে বৈধ নয়, তেমনি দারুল হারবের হারবিদের সঙ্গেও তা বৈধ হবে না।

৩. দারুল ইসলামে যা কিছু হারাম, তার সবই দারুল হারবেও হারাম। যেমন — মদপান, ব্যভিচার থেকে শুরু করে সকল অশ্লীলতা, পাপাচার ও গুনাহ।

৪. সুদ যেমনিভাবে মুসলমানদের জন্য হারাম, তেমনি কাফিরদের জন্যও হারাম। কেননা শরিয়তের নিষিদ্ধ এবং হারাম বিধিবিধানের মুখাতাব তারাও। কোরআনের নস দ্বারা কাফিরদের জন্যও সুদ হারাম করা হয়েছে। {এ বিষয়টা বিস্তারিত জানতে দেখুন— উসুলুস সারাখসি— ১/৭২-৭৮; তাইসিরুত তাহরির— ২/১৪৮-১৫০; আততালওয়িহ আলাত তাওযিহ— ১/২১৩-২১৫; তাফসিরে কুরতুবি— ৬/১২, ৪/১৪৬; কাশফুল আসরার— ৪/২৪৩-২৪৫; আলবুরহান, ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনি— ১/১০৭-১১০; শরহু তানকিহিল ফুসুল, কারাফি— ১৬৬-১৬৭; আলফুরুক— ১/২১৮; নিহায়াতুস সুল— ১/৩৬৯-৩৮৩; শরহুল কাওকাবিল মুনির— ১/৫০০-৫০৫; তাখরিজুল ফুরু’ আলাল উসুল, যানজানি— ৯৮-১০০; আততামহিদ, ইসনাওয়ি— ১২৬-১৩২; আলকাওয়ায়িদ ওয়াল ফাওয়ায়িদ আলউসুলিয়্যাহ, ইবনুল লাহহাম— ৪৯-৫৭; আলমানসুর ফিল কায়ায়িদ, যারকাশি— ৩/৯৭-১০১; শরহুল মানহাজিল মুনতাখাব ইলা কাওয়ায়িদিল মাযহাব, ইমাম আহমাদ ইবনে আলী মানজুর— ২৬১-২৬৬; উসুলুল ফিকহ, শায়খ আবুন নুর যুহায়র— ১/১৮৪-১৯১}

৫. এই কারবারে গৃহীত সম্পদ ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে গৃহীত সম্পদ। আর ফাসিদ চুক্তি মালিকানার ফায়দা দেয় না।

৬. দারুল হারব দারুল বাগয়ি (বিদ্রোহের শহর) এর মতো, তার ওপর আদিল ইমাম (মুসলমানদের ন্যায়নিষ্ঠ শাসক) এর কোনো কতৃত্ব নেই। আর সর্বসম্মতিক্রমে দারুল বাগয়িতে সুদের লেনদেন বৈধ নয়। তেমনি দারুল হারবেও তা বৈধ হবে না।

জমহুরের পক্ষ থেকে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মুহাম্মাদের দলিলসমূহের খণ্ডন

১. দারুল হারবে সুদের লেনদেনের বৈধতার পক্ষে আব্বাস রা. এর ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করা অনেক কারণেই যুক্তিযুক্ত নয়। মৌলিক কারণ দুটো।

ক. আব্বাস রা. এর যিম্মায় সুদ ছিলো জাহেলি যুগে, তার ইসলামগ্রহণের পূর্বে। হাদিসের শব্দকে এ অর্থে গ্রহণ করাই যথেষ্ট। তিনি ইসলামগ্রহণের পরও সুদি লেনদেন অব্যাহত রেখেছেন— এমন কোনোই দলিল নেই। আর যদি মেনেও নেয়া হয় যে, ইসলামগ্রহণের পরও তিনি সুদি কায়কারবার করেছেন, তাহলে হতে পারে যে, তিনি তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। তাই নবিজি সা. এই মূলনীতি সেদিন থেকে এই মূলনীতি স্থির করতে চেয়েছেন।

খ. আব্বাস রা. সাধারণভাবেই মুশরিকদের থেকে সুদ নিতেন। তা এজন্য করতেন না যে, দারুল ইসলামে সুদের লেনদেন অবৈধ হলেও দারুল হারবে তা

বৈধ। বরং এজন্য যে , তখনও সুদ চূড়ান্তভাবে হারাম হয়নি। সুদের নিষিদ্ধতা কয়েক ধাপে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা পূর্ণতা লাভ করেছে এই আয়াতের মাধ্যমে —

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

হে ইমানদারগণ , আল্লাহকে ভয় করো এবং বকেয়া সুদ ছেড়ে দাও। যদি মুমিন হয়ে থাকো, তবে তা করো। {সুরা বাকারাহ — ২৭৮}

এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সাকিফ গোত্রের ইসলামগ্রহণ এবং সন্ধির পর , যা হিজরি নবম বর্ষে সংঘটিত হয়েছে ; অর্থাৎ , বিদায় হজের কিছু আগের ঘটনা। এর আগে সুদের নিষিদ্ধতা অকাট্য এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত ছিলো না। এজন্য আব্বাস রা . মক্কায় মুশরিকদের সাথে সুদি লেনদেন করতেন এবং তাদের থেকে সুদ নিতেন। নবম হিজরিতে অবতীর্ণ সেই আয়াতকেই বিদায় হজের ভাষণে রাসুলুল্লাহ সা . আরো তাকিদ করেছেন তার সেই ঐতিহাসিক বক্তব্যের দ্বারা।

২. মাকহুল রহ . থেকে বর্ণিত হাদিসটি প্রমাণিত নয়। এমনকি অনেক হানাফি আলিমও মন্তব্য করেছেন , এটা একটি মাজহুল (অজ্ঞাত) বর্ণনা , যা কোনো সহিহ, মুসনাদ কিবা নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে বর্ণিত হয়নি। তাছাড়া এটি একটি মুরসাল বর্ণনা , যা হাদিস হওয়ার সম্ভাবনা রাখে মাত্র। এই সম্ভাবনাপূর্ণ একটি বর্ণনা সুদের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে অকাট্য সব দলিলের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না।

আর যদি এই মুরসাল বর্ণনার প্রামাণ্যতা মেনেও নেয়া হয় , তবুও হানাফিদের উসুলেই তা টিকে না। কেননা হানাফিদের উসুল হলো , খবরে ওয়াহিদের মাধ্যমে কিতাবুল্লাহর ওপর যিয়াদাহ করা জায়িয নেই।

কেননা তখন এটা নসখ বলে ধর্তব্য হয়। আর খবরে ওয়াহিদ কিতাবুল্লাহ নসখ করার যোগ্যতা রাখে না।

তাছাড়া "লা রিবা" বলার দ্বারা "নাহি"ও উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন এই আয়াতে "নাফি" দ্বারা "নাহি" উদ্দেশ্য —

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

আর দলিলের মাঝে একাধিক সম্ভাবনা চলে আসলে তা দলিল হিসেবে উল্লেখ করার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

৩. তাদের কিয়াসও এক্ষেত্রে দলিল হিসেবে টিকে না। কেননা গনিমতের মাধ্যমে তাদের অর্থসম্পদ বৈধ হওয়া তো এটা অপরিহার্য করে না যে, ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমেও তা বৈধ হবে। এজন্যই তো হারবি নারীদেরকে বন্দি করার মাধ্যমে তারা হালাল হয়ে যায়, কিন্তু তাই বলে ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে তা তো বৈধ হয় না। সুদ ইসলামে নিষিদ্ধ একটি চুক্তি। সুতরাং এর দ্বারা মালিকানা লাভ হতে পারে না। তাই এটা অবৈধ পন্থায় সম্পদ আত্মসাৎ হিসেবে ধর্তব্য হবে, পবিত্র কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে যা সুস্পষ্ট ও অকাট্য হারাম।

৪. বনু নাযিরের ঘটনাকেও দলিল হিসেবে উল্লেখ করা সঙ্গত নয়। কেননা এই বর্ণনাটি এতোই দুর্বল, যা প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করার যোগ্য নয়। তাছাড়া এই দলিলে আরো একাধিক সমস্যার দিক রয়েছে। বিস্তারিত জানতে শাইখুল ইসলাম তাকি উসমানি দা. বা. প্রণীত "বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যা মুআসিরাহ" দ্রষ্টব্য।

জমহুরের দলিল এবং ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদের দলিলের পর্যালোচনা সম্পর্কে জানতে ওপরের সূত্রগুলো দ্রষ্টব্য।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দারুল হারবে হারবিদের থেকে সুদ গ্রহণের মাসআলায় জমহুরের মাযহাব যে শক্তিশালী তা প্রমাণিত হলো। তাছাড়া অনেক হানাফি ফকিহও এই অভিমতই পোষণ করেছেন। যেমন ওপরে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর কথা বর্ণিত হয়েছে। বিদগ্ধ হানাফি মুফতিরাও এর আলোকেই ফতোয়া দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। দু-চারজন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদের মতকে অবলম্বন করেছেন। এর ভিত্তিতেই মুফতি খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি দা. বা. ভারতে কাফিরদের থেকে সুদ নেয়া বৈধ, যেহেতু ভারত দারুল হারব— মর্মে ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞ মুফতিগণ তার এই ফতোয়া গ্রহণ করেননি।

{{চলবে ইনশাআল্লাহ...}}

ইসলামি রাষ্ট্রনীতি – ৮ (প্রসঙ্গঃ ‘যিম্মি’ এবং ‘যিম্মা চুক্তি’— ১ম পর্ব)

ALI HASAN OSAMA·SATURDAY, APRIL 8, 2017

‘যিম্মা চুক্তি’ এবং ‘যিম্মির’ পরিচয়

যিম্মা চুক্তি ইসলামি ফিকহের একটি পরিভাষা। প্রথমে আমরা এই পরিভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নেই।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, তা হলো এমন চুক্তি, যার দ্বারা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এর মাধ্যমে যিম্মি ইসলামের সেসব বিধান নিজের ওপর অবধারিত করে নেয়, যা মুআমালাত-লেনদেনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং সে সন্তুষ্টচিত্তে দারুল ইসলামে বসবাস করার সম্মতি প্রদান করে। {আসসিয়ারুল কাবির— ১/১৯১}

ইমাম গাযালি রহ. বলেন, যিম্মা চুক্তি হলো, দারুল ইসলামে অমুসলিমদেরকে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা, তাদের নিরাপত্তা বিধান করা, তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া থেকে নিবৃত্ত থাকা— তাদের তরফ থেকে জিযয়া এবং ইসলামের আনুগত্য লাভের মাধ্যমে। {আলওয়াজিয, গাযালি— ২/১৯৭}

{আরো দেখুন— বাদায়িউস সানায়ি’— ৯/৪৩১১, ৪৩২৭; আলমুবদি’ শরহুল মুকনি’— ৩/৪০৪; কাশশাফুল কিনা’— ৩/১০৮; মাতালিবু উলিন নুহা— ২/৫৯১; আততাশরিউল ইসলামি, শায়খ আব্দুল্লাহ মুস্তাফা— ৩০}

উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে যিম্মির পরিচয়ও পরিস্ফুট হয়ে যাওয়ার কথা। বোঝার সুবিধার্থে আলাদাভাবে যিম্মির সংজ্ঞা উল্লেখ করছি।

ড. হামিদ সুলতান বলেন, তারা হলো এমন সব বিদেশী নাগরিক, যারা যিম্মা চুক্তির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে দারুল ইসলামে অবস্থান করে। {আহকামুল কানুন আদদুওয়ালি— ২২৪}

{আরো দেখুন— আযযাহির, আযহারি— ৩৭৫; আলওয়াজিয, গাযালি— ২/১৯৮; আদদুররুন নাকি, ইবনু আবদিল হাদি— ১/২৯০; মাবাদিউল কানুন

আদদুওয়ালি আলআম— ৫২; আলজিহাদ ওয়াল কিতাল ফিস সিয়াসাতিশ শারইয়্যাহ— ১/২০৭}

যিম্মা চুক্তির প্রকৃতি

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, হারবিদের কোনো গোষ্ঠী যদি মুসলমানদের যিম্মি হতে চায়, …তাহলে ইমামের ওপর অপরিহার্য তাদের আহ্বানে সাড়া দেয়া। কেননা যিম্মা গ্রহণ করা ওয়াজিব। {আসসিয়ারুল কাবির— ৪/১৫২৯, ৫/২১৯১, ২১৯৮-২১৯৯}

ইমাম তাবারি রহ. বলেন, এ ব্যাপারে সকলের ইজমা-ঐকমত্য রয়েছে যে, যাদের থেকে জিযয়া গ্রহণ করা হালাল, তারা যদি জিযয়া প্রদানপূর্বক যিম্মা পেতে চায় আর তারা পরাভূত না হয়েই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত থাকে, তাহলে মুসলমানদের ইমামের জন্য তা গ্রহণ করা থেকে এবং তাদেরকে যিম্মি বানানো থেকে বিরত থাকার কোনো বৈধতা নেই। {ইখতিলাফুল ফুকাহা, তাবারি— ২০৮}

এজন্যই ফকিহগণ বলেছেন, যাদের থেকে জিযয়া গ্রহণ করা যায়, তারা যখন যিম্মা চুক্তি তলব করবে এবং তাদের মধ্যে চুক্তির সবগুলো শর্তও বিদ্যমান থাকবে, চুক্তি করতে অন্য কোনো বাধাও থাকবে না, তখন ইমামের জন্য তাদের সেই তলবে সাড়া দেয়া এবং তাদের সঙ্গে যিম্মা চুক্তি করা ওয়াজিব। আর তখন তাদের সঙ্গে লড়াই করা হারাম। {দেখুন— আকদুল জাওয়াহিরিস সামিনাহ— ১/৪৮৬; আলখিরাশি আলা মুখতাসারিল খালিল— ৩/১৪৩-১৪৪; কিতাবুল উম— ৪/৯৭; আলওয়াজিয, গাযালি— ২/১৯৮; আলমুহাযযাব— ১৮/১৯০; তাহরিরুল আহকাম— ২৪৮; রাওযাতুত তালিবিন— ১০/২৯৭; মুগনিল মুহতাজ— ৪/২৪৩; আলমুগনি— ১০/৫৬৮; আলমুবদি’— ৩/৪০৪; আশশারহুল কাবির, মাকদিসি— ১০/৫৭৫}

[illegible]

[illegible]

[illegible]

> قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم

যদি তারা অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাদের কাছে জিযয়া চাও। যদি তারা সাড়া দেয় , তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করো এবং তাদের সঙ্গে লড়াই করা থেকে নিবৃত্ত হও। যদি তারা জিযয়া পদান করতে অস্বীকৃতি জানায় , তাহলে আল্লাহ কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের সঙ্গে লড়াই করো। {সহিহ মুসলিম — ১৭৩১; সুনানে আবি দাউদ — ২৬১২; সুনানে তিরমিযি — ১৬১৭; সুনানে ইবনে মাজাহ — ২৮৫৮}

তাছাড়া ইসলামের ইতিহাসও এর পক্ষে প্রোজ্জ্বল সাক্ষী। রাসুলুল্লাহ সা. এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের সিরাতের দিকে তাকালে এর অসংখ্য বাস্তব নমুনা পাওয়া যাবে ; পরিভাষায় যেটাকে ‘সুন্নাতে আমালিয়্যাহ’ বলা হয়।

গ. যুক্তি এবং কিয়াসের দাবিও তা-ই। কেননা তারা যদি ইসলামগ্রহণের দরখাস্ত জানাতো , তাহলে তো তা গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে যেতো। একইভাবে যিম্মার ক্ষেত্রেও হবে। কেননা যিম্মার মাধ্যমে তারা লেনদেনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ইসলামের বিধিবিধান নিজেদের ওপর অপরিহার্য করে নিচ্ছে। এরপর মুসলমানদের সঙ্গে অবস্থানের দ্বারা ইসলামের অপার্থিব সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তারা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিবে — এরও সমূহ প্রত্যাশা রয়েছে। {শরহুস সিয়ারিল কাবির — ৪/১৫২৯-১৫৩০}

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কখনো এমন কারণও দেখা দেয়, যার জন্য এই অপরিহার্যতার বিধান রহিত হয়ে যায়। যেমন মুসলমানদের ইমাম যদি মনে করেন , এখন এই যিম্মা

চুক্তি গ্রহণ করা হলে সমূহ ক্ষতির আশংকা রয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন—

“মুশরিকদের কোনো ব্যক্তি যদি তার রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে কোনো দূর্গে অবস্থান গ্রহণ করে মুসলমানদের কাছে আহ্বান জানায় যে, যিম্মি হওয়ার শর্তে আমরা যেনো তার সঙ্গে সন্ধি করে নেই আর তখন মুশরিক গোষ্ঠী বলে যে, যদি তোমরা এ কাজ করো, তাহলে আমরা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করবো এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে হত্যা করে ফেলবো, তখন যদি মুসলমানদের শক্তি-সক্ষমতা থাকে, তাহলে ইমাম তার আহ্বানে সাড়া দিবেন এবং মুশরিকরা কী বলছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না। … আর যদি মুসলমানদের শক্তি-সক্ষমতা না থাকে, তারা নিজেদের ব্যাপারেই শঙ্কাবোধ করে, তাহলে তারা সেই আহ্বানে সাড়া না দেয়ার বৈধতাও রয়েছে।” {আসসিয়ারুল কাবির— ৪/১৬১৪}

“শিরকের কোনো শহর যদি আমাদের যিম্মি হওয়ার জন্য চুক্তি করতে চায় আর তখন চুক্তিকৃত দারুল হারবের রাজা তা অপছন্দ করে হুমকি দেয় যে, যদি তোমরা এমনতা করো, তাহলে আমরা আমাদের হাতে বন্দি তোমাদের জনগণকে হত্যা করে ফেলবো অথবা দাস-দাসী বানিয়ে ফেলবো, আর যদি এমনটা না করো, তাহলে এই বন্দিগুলোকে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবো। তখন ইমাম এবং মুসলমানগণ এ বিষয়টির প্রতি ভালো করে দৃষ্টিপাত করবেন, যদি যিম্মা প্রদান থেকে বিরত থাকাকে মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর মনে হয়, তাহলে তারা বিরত থাকবেন। আর যদি যিম্মা তলবকারীদের থেকে যিম্মা গ্রহণ করে নেয়াটাই কল্যাণকর মনে করেন, তাহলে তা গ্রহণ করে নিবেন। ইমাম সারাখসি রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, কেননা ইমাম মুসলমানগণের অবস্থার প্রতি লক্ষকারী। সুতরাং তিনি তা-ই গ্রহণ করবেন, যেক্ষেত্রে উপকারিতার দিক অধিক স্পষ্ট। হাঁ, উত্তম হলো, সে উদ্যোগই গ্রহণ করা, যার মাধ্যমে মুশরিকদের হাতে থাকা মুসলিম বন্দিরা মুক্তি পায়।” {প্রাগুক্ত— ৫/১৭৬০}

তেমনই তারা যিম্মা তলব করা সত্ত্বেও ইমাম যদি মনে করেন, মুসলমানরা তাদের নিরাপত্তা বিধানে অক্ষম, তাহলে তাদের যিম্মা গ্রহণ করা অপরিহার্য নয়। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন—

“তারা যদি এই শর্তে যিম্মা তলব করে যে, তারা তাদের অবস্থানস্থলেই অবস্থান করবে …সেই জায়গাটি যদি এমন হয়, যেখানে রয়ে যাওয়া মুসলমানরা তাদের ওপর শক্তিশালী না হয় এবং তাদের মাঝে ইসলামের বিধানানুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করার মতো সামর্থ্যবান না হয়, তাহলে মুসলমানদের জন্য তাদের সেই আহ্বানে সাড়া দেয়া উচিত হবে না।” {আসসিয়ারুল কাবির— ৫/২১৯২, ২১৯৩-২১৯৯}

মালেকি শাফেয়ি হাম্বলি অনেক ফকিহেরও এই-ই অভিমত। তারা যিম্মা চুক্তির আহ্বানে সাড়া দেয়াকে তখনই অপরিহার্য মনে করেন, যখন দারুল ইসলামে এই হারবিদের বসবাসের কারণে মুসলমানদের জন্য কোনো ক্ষতি ও শঙ্কার বিষয় না থাকবে। কেননা কখনও মুসলমানদের মাঝে অমুসলিমদের অবস্থান দারুল ইসলামের শৃঙ্খলা এবং মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্যের জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া কখনও তাদের যিম্মা প্রার্থনার পেছনে ষড়যন্ত্রও থাকতে পারে। নিতান্ত ধোঁকা, গোয়েন্দাগিরি, চক্রান্তের অংশ হিসেবেও তারা যিম্মা তলব করতে পারে। এ ধরনের কিছু যদি প্রমাণিত হয়, তখন কিছুতেই মুসলমানদের জন্য তা গ্রহণ করা অপরিহার্য হতে পারে না। {দেখুন— আকদুল জায়াহিরস সামিনাহ— ১/৪৮৬; আলমুহাযযাব— ১৮/১৯০; আলওয়াজিয, গাযালি— ২/১৯৭-১৯৮; রাওযাতুত তালিবিন— ১০/২৯৭-২৯৮; মুগনিল মুহতাজ— ৪/২৪৩; কাশশাফুল কিনা’— ৩/১০৮}

যিম্মা চুক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে শেষ কথা

যিম্মা চুক্তি কোনো সাময়িক চুক্তি নয়, বরং একটি চিরস্থায়ী চুক্তি। কেননা জান-মালের নিরাপত্তা লাভের জন্য যিম্মা হলো দুনিয়াবি বিধিবাধানের ক্ষেত্রে ইসলামের বিকল্প। ইসলাম যেমন সাময়িক হয় না, যিম্মাও তেমনই সাময়িক হবে না।

যিম্মা চুক্তির বৈশিষ্ট্য হলো, তা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য একটি চুক্তি, যা কোনো অবস্থায়ই ভঙ্গ করা যাবে না। ইসলাম কোনো মুসলমানকে চুক্তি এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের অধিকার দেয়নি। হাঁ, যিম্মিদের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ বৈধ চুক্তি, অপরিহার্য নয়।
তাদের ক্ষেত্রে যিম্মা ভেঙ্গে যেতে পারে। তবে তা তিনটি বিষয়ের কোনো একটি পাওয়া গেলেই শুধু ভঙ্গ হবে; অন্যথায় নয়।

১. ইসলাম গ্রহণ করে নিলে।

২. দারুল হারবে চলে গেলে।

৩. বিদ্রোহ করলে।

{দেখুন— যিয়াদাতুয যিয়াদাত, ইমাম মুহাম্মাদ, বি-শারহিস সারাখসি ওয়াল ইতাবি— ১৪৪; বাদায়িউস সানায়ি’— ১০/১৩৩৪; তাবয়িনুল হাকায়িক — ১০/৪৩৩৪}

উল্লেখ্য, ফকিহগণের কাছে চুক্তি অপরিহার্য (‘আকদুন লাযিম’) হওয়ার অর্থ, এক পক্ষ ওপর পক্ষের সন্তুষ্টি ছাড়া তা ভঙ্গ করতে পারে না— যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি। তো মুসলমানদের জন্য যিম্মা একটি অপরিহার্য চুক্তি হুয়ার অর্থ হলো তারা যিম্মিদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতিরেকে কিছুতেই তা ভঙ্গ করতে পারবে না। আর সাধারণ বৈধ চুক্তি (‘আকদুন জায়িযুন গাইরু লাযিমিন’) হওয়ার অর্থ, এক পক্ষ ওপর পক্ষের সন্তুষ্টি ব্যতীতও চুক্তি ভঙ্গ করতে

পারে। চুক্তি কখনও এমন হয়, যা একপক্ষের বিচারে অপরিহার্য, কিন্তু ওপর পক্ষের বিচারে সাধারণ— যেমন হিবাহ চুক্তি, যিম্মা চুক্তি।

{বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন— আলমানসুর ফিল কাওয়ায়িদ— ২/৩৯৮-৪০২; আলআশবাহ ওয়ান নাযায়ির, ইবনে নুজাইম— ৩৩৬-৩৩৮; আলমুআমালতুল মালিয়্যাহ ফিশ শারিয়াহ, আহমদ ইবরাহিম— ৯৯; আলমিলকিয়্যাহ ওয়া নাযরিয়্যাতুল আকদ, আবু যুহরা— ৪২০-৪২৪; আলআমওয়াল ওয়া নাযরিয়্যাতুল আকদ, ড. মুহাম্মাদ ইউসুফ মুসা— ৪৪৭}

এ ব্যাপারে ইমামগণের ইজমা-ঐকমত্য রয়েছে যে, যিম্মি যদি তার অঙ্গীকার অনুসারে দারুল ইসলামে বসবাস করে, তাহলে তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করা যাবে না এবং সে চুক্তিতে নিজের ওপর যা অপরিহার্য করেনি, সে ব্যাপারে তাকে বাধ্য করা যাবে না। {দেখুন— আদদাসুকি আলাশ শারহিল কাবির— ২/২০৪-২০৫; আলফুরুক, কারাফি— ৩/১৩; কিতাবুল উম— ৪/১৮৮; আলওয়াজিয, গাযালি— ২/১৯৭; মুগনিল মুহতাজ— ৪/২৫৮; আলমুগনি— ১/৫৬৩}

যিম্মা চুক্তির জন্য অপরিহার্য শর্তাবলি

ক. চুক্তি স্থায়ী হতে হবে; সাময়িক নয়। এর জন্য নির্ধারিত মেয়াদ আরোপ করা হলে চুক্তি শুদ্ধ হবে না। {বায়য়িউস সানায়ি’— ৯/৪৩৩০; শরহু যিয়াদাতিয যিয়াদাত, সারাখসি— ১৪৪}

অধিকাংশ মালেকি শাফেয়ি হাম্বলি ফকিহেরও একই অভিমত। হাঁ, চুক্তির স্থায়িত্বের কথা চুক্তিপত্রে লিখিত থাকা জরুরি নয়। স্বাভাবিকভাবেই তা স্থায়ী বলে গণ্য হবে।

খ. এমন অমুসলিমদের সঙ্গেই যিম্মা চুক্তি করা যাবে, যাদের থেকে জিযয়া নেয়া গ্রহণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ আরবের মুশরিক কিবা নাস্তিক-মুরতাদ হতে পারবে না। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

গ. চুক্তিকারী ইমাম অথবা ইমামের প্রতিনিধি হতে হবে। কেননা যিম্মা যেহেতু একটি স্থায়ী চুক্তি, সুতরাং তা জনস্বার্থমূলক কাজ, ইমাম এবং খলিফার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়েরও বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

ঘ. যিম্মিকে নিজের ওপর ইসলামের বিধিবিধান অপরিহার্য করে নিতে হবে। সেসব বিধান, যেগুলো আর্থিক চুক্তি ও লেনদেন সামাজিকতা এবং বিশেষ বিশেষ অপরাধের দণ্ড-জরিমান ইত্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ঙ. রাষ্ট্রের উন্নয়নের স্বার্থে সক্ষম ব্যক্তিদের ওপর নির্ধারিত জিযয়া-কর আরোপ করতে হবে। জিযয়ার বিধান অসংখ্য নসের মাধ্যমে সাব্যস্ত। সুতরাং এর আওতার বাইরে শুধু তারাই থাকবে, যাদের ব্যাপারে নস এসেছে।

যাদের সঙ্গে যিম্মা চুক্তি করা যাবে এবং যাদের থেকে জিযয়া নেয়া যাবে

এ ব্যাপারে ইমামগণের ইজমা-ঐকমত্য রয়েছে যে, কিতাবি— অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টান, মাজুস এবং অনারব মূর্তিপূজকদের থেকে যিম্মা চুক্তি এবং জিযয়া গ্রহণ করা যাবে আর মুরতাদদের থেকে তা কিছুতেই গ্রহণ করা যাবে না।

এর বাইরে যেসব অমুসলিম রয়েছে, তাদের ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর অভিমত হলো, আরবের মুশরিকদের থেকে যিম্মা এবং জিযয়া গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর একটি বর্ণনাও এমন। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, আরবের কোনো অমুসলিমের থেকেই যিম্মা এবং জিযয়া গ্রহণ করা হবে না, মুশরিক হোক কিবা কিতাবি হোক। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, জিযয়ার ভিত্তি ধর্মের ওপর, বংশের ওপর নয়। তাই কিতাবিদের থেকে যিম্মা এবং জিযয়া গ্রহণ করা যাবে, আরব হোক কিবা অনারব। আর মুশরিকদের থেকে কোনো অবস্থায়ই তা গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম মালিক এবং ইমাম আওযায়ি রহ. এর অভিমত হলো, মুরতাদ ছাড়া সকল অমুসলিমের থেকেই যিম্মা এবং জিযয়া গ্রহণ করা যাবে।

{এ বিষয়ে সবিস্তারে জানার জন্য দেখুন— শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৩/১০৩৫-১০৩৬; কিতাবুল উম— ১/৯০-৯২, ৪/৯৫-৯৬; তাহরিরুল আহকাম, ইবনে জামাআহ— ২৪৯; কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসুফ— ১২২-১২৪; আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ইবনুল কায়্যিম— ১/১, ১/৯০-৯২; ফাতহুল কাদির— ৪/৩৭০-৩৭২; বাদায়িউস সানায়ি’— ৯/৪৩২৯; শরহুল বিকায়া— ১০২; আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া— ২/২৪৪-২৪৫; ফাতাওয়া শামি— ৪/১৯৮; আকদুল জাওয়াহিরিস সামিনাহ— ১/৪৮৬; আলমুকাদ্দিমাতুল মুমাহহিদাত— ১/৩৭৫-৩৭৬; আলকাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যা— ১৬৩; আলমুহাযযাব— ১৮/১৬৯-১৭০; আলআযিয শরহুল ওয়াজিয— ১৩/৫০৬-৫০৭; রাওযাতুত তালিবিন— ১০/৩০৪; তাহরিরুল আহকাম— ২৪৯; আলমুগনি— ১০/৫৫৮-৫৫৯; আলমুবদি’— ৩/৪০৪; মাজমুউ ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া— ২৮/৩৫৬, ২৯/২১৮; কাশশাফুল কিনা’— ৩/১০৮; আলইফসাহ, ইবনে হুবায়রা— ১/২৯২; আলমিযানুল কুবরা, শা’রানি— ২/১৮৪; আলমুহাল্লা, ইবনে হযম— ৭/৩৪৫; শরহুস সুন্নাহ— ১১/১৭০; উসুলিদ দীন, ইবনে মানসুর বাগদাদি— ৩১৮; আদদুররুল মুনতাকা — ১০/৬৭০; মুগনিল মুহতাজ— ৪/২৪৪; আলমুগনি— ১০/৫৫৯, ৫৬৪-৫৬৫; আলইনসাফ— ৪/২১৭; আলজামিউস সাগির— ২৪৮; কিতাবুল আসল, সিয়ার অধ্যায়

— ২২২; আলমাবসুত— ১০/১১৮-১১৯; ফাতহুল কাদির— ৪/৯৫-৯৬; তাবয়িনুল হাকায়িক— ৩/২৭৭; আততাশরিউল জিনায়ি আলইসলামি— ২/৭২১-৭২২}

ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবি, ইবনু তাইমিয়া, ইবনুল কায়্যিম, শাওকানি, মুকবিলি রহ. শেষোক্ত মাযহাবকে তারজিহ দিয়েছেন। অর্থাৎ মুরতাদ ছাড়া সকল অমুসলিমের থেকেই যিম্মা এবং জিযয়া গ্রহণ করা যাবে। কিতাবিদের থেকে গ্রহণ করার কথা তো কোরআন মাজিদেই এসেছে। মাজুসের ব্যাপারটি সুন্নাহ থেকে বিধৃত হয়েছে। মাজুসরা মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের থেকে যিম্মা এবং জিযয়া গ্রহণের বিষয়টিই সকল মুশরিকের থেকে গ্রহণের বৈধতা প্রমাণ করে। তাছাড়া পূর্বে উল্লিখিত বুরায়দার হাদিসের ব্যাপকতা এ বিষয়টিকে শক্তিশালী করে। তাছাড়া শরিয়তের কোনো বিধানের ক্ষেত্রে আরবজাতিকে বিশেষিত করা হয়নি। তেমনই কোনো গোষ্ঠীর কুফরি অপর গোষ্ঠীর কুফরির থেকে অধিক নিকৃষ্ট নয়।

বাকি থাকলো, রাসুলুল্লাহ সা. আরবের মুর্তিপূজারকদের থেকে জিযয়া কেনো নেননি? কারণ তখনও জিযয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। আর আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়েছে, তার আগেই তারা ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে। যেমনিভাবে রাসুলুল্লাহ সা. আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে ইহুদিদের থেকেও তো তা নেননি।

তাহলে রাসুলুল্লাহ সা. যে ইহুদি-খ্রিস্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করতে বলেছেন? হাঁ, এর দ্বারা এ কথা কীভাবে সাব্যস্ত হলো যে, আরব উপদ্বীপের বাইরে অবস্থানকারী কিতাবিদের থেকেও যিম্মা এবং জিযয়া গ্রহণ করা যাবে না?!

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, দলিলের বিচারে এই মাযহাবই অধিক বিশুদ্ধ। এজন্যই আল্লামা শাওকানি রহ. বলেন, “কেউ যদি দাবি করে, কাফিরদের অমুক গোষ্ঠীর ওপর জিযয়া আরোপ করা জায়েয নেই, বরং তাদেরকে

শুধু ইসলাম এবং তরবারি — এ দুয়ের মাঝে কোনো একটিকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হবে মাত্র , তাহলে দাবিকারীকে অবশ্যই দলিল পেশ করতে হবে। প্রমাণস্বরূপ পেশ করার মতো কোনো দলিলই নেই। হাঁ , মুরতাদের ব্যাপারেই শুধু দলিল রয়েছে। তাই শুধু তাদের বিধানটাই ভিন্ন। ”

{দেখুন — আসসাইলুল জাররার, শাওকানি — ৪/৫৭১; আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবি— ২/৯২২; মাজমুউ ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া — ১৯/১৮-৩০, ২৮/৩৫৬; যাদুল মাআদ — ৫/৯১-৯২; আহকামু আহলিয যিম্মাহ — ১/৬-১২; আদদুরারুল বাহিয়্যাহ — ২/৫১০; আররাওযুন নাযির — ৪/৬৪২; আলজিহাদু ওয়াল কিতাল ফিস সিয়াসাতিশ শারইয়্যাহ — ৩/১৪৬১; ফিকহুল ইমাম আওযায়ি— ২/৫৩০}

চলবে ইনশাআল্লাহ ...

ফারেগিন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী নসিহতঃ আল্লামা ইসমাইল বরিশালী দা . বা .

ALI HASAN OSAMA·THURSDAY, MARCH 30, 2017

الحمد لله وحده و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى. أمابعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، و قال فأين تذهبون، و قال فأنى تؤفكون. و قال النبي ص. ألا لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، و قال الرزق مقسوم.

১৪৩৫ হি . মোতাবেক ২০১৫ ঈ. শিক্ষাবর্ষে বাইতুস সালাম মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস সমাপনকারী আমার প্রিয় তালিবানে ইলম ও অম্লানবদনে বহু ত্যাগ -তিতীক্ষা বরণকারী সম্মানিত অভিভাবকমণ্ডলী !

আলোচনার সূচনায়ই একটি উর্দু কবিতা মনে পড়লো। কবিতাটি পুরনো। এই মুহূর্তে মনে পড়লো মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ .এর প্রাসঙ্গিকতায় , যিনি ছিলেন আমাদের শেষ সম্পদ। হুজুরের কথা জানি না কেনো যেনো হঠাৎ মনে পড়ে গেলো। আসল কথা হলো, রণাঙ্গনের ঘোড়সওয়ার নেই তো। কেউ নেই। ময়দান একেবারে ফাঁকা। কার কাছে যাবো ? আমাদের পর্যায়ে যারা আছি , আমরা যদি হঠাৎ ঠেঁকায় পড়ি , যাওয়ার মতো একটি মানুষও অবশিষ্ট নেই। সমস্যা তো সবারই হতে পারে। ছাত্রের সমস্যা হলে উস্তাদ থেকে জিজ্ঞেস করে নেয়। কখনোবা জেনে নেয় ওপরের জামাতের কোনো ছাত্র থেকে। কিন্তু হায় , আমরা যাবো কার কাছে ?! চোখ ভিজে যায় জলে! সর্বশেষ এই একজন মানুষ ছিলেন , যার কাছে ছিলো ইলমি সমস্যাবলীর সরল সমাধান। ছিলেন তিনি ইলমের ভরপুর জাহাজ। মাঠে ময়দানেও তিনি ছিলেন অকুতোভয় , বড় হিম্মতি এবং সৎসাহসী। ছিলেন বাতিলের বিরুদ্ধে দৃপ্ত কণ্ঠস্বর। হায় , শূন্য ! একেবারে শূন্য ! তাগুতের বিরুদ্ধে সত্যবাণী উচ্চারণ করার মতো একটি ব্যক্তির অস্তিত্ব মিলছে না সারা দেশের কোথাও। দুয়েকটি হুংকার এদিক -সেদিক থেকে কানে এলেও রাখছে না কোনো কার্যকরী ভূমিকা।

আহ! সেই মুফতী আমিনীর কণ্ঠস্বর আজও কানে বাজে। তার মুখে বহুবার শোনা একটি কবিতা দিয়েই তাই শুরু করছি

موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی + ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی

উদাসীন হে , মৃত্যুকে ভেবেছো তুমি জীবনের সমাপ্তি। হাঁ , এটা নশ্বর সংক্ষিপ্ত এক জীবনের সাঁঝ ; কিন্তু তা যে অন্তহীন আরেক জীবনের প্রভাত।

সেই জীবন যার শুধরে যাবে, শুধরাবার মতো ব্যবস্থা যার অর্জিত হবে সেই সফল, ভাগ্যবান। আর এই গণ্ডির বাইরে যার অবস্থান সে প্রবল প্রতাপশালী হলেও প্রকৃত অর্থে সে ব্যর্থ, শূন্য, একেবারেই শূন্য।

এই কবিতাটি বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য তালিবানে ইলমের উদ্দেশ্যে এ আর্জি উপস্থাপন করা, দাওরায়ে হাদিসকে আমাদের সমাজে লেখাপড়ার জীবনের সমাপ্তি জ্ঞান করা হয়। সম্বোধনটাও চলে আসছে সেরূপ, "ফারিগুত তাহসিল" জ্ঞানার্জন সমাপ্তকারী। শব্দটি আসলে ভুল। প্রচলনটি নিতান্তই ধোঁকা। আপনারা অন্তত এ ধোঁকার জালে ফাঁসবেন না।

দাওরায়ে হাদিসের হাকিকত সামান্য কথায় আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পাবো। আপনারা দাওরায়ে হাদিস সমাপন করেছেন, এর অর্থ হলো, আপনাদের মধ্যে এ যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে, আপনারা এখন কোনো কিতাব হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারবেন। পারবেন তার উলুম এবং মা'আরিফের ভাণ্ডার থেকে উপকৃত হতে। পৃথিবীর বুকে রচিত কোটি কোটি পৃষ্ঠা, যা ছড়িয়ে আছে গ্রন্থাগারগুলোতে, তা থেকে আপন প্রচেষ্টায় জ্ঞান আহরণের প্রাথমিক যোগ্যতার স্তর সবেমাত্র অতিক্রম করেছেন আপনারা। আপনারা এখন ইলম সমুদ্রের পাশে দণ্ডায়মান এক সাঁতারু, রাজপ্রাসাদের সামনে অপেক্ষমান এক বিভিক্ষু। প্রকৃত সম্পদ তো সাগরতলে ও রাজপ্রাসাদে। এগিয়ে যেতে হবে তাই আপনাদেরকে দৃপ্ত পদবিক্ষেপে, অসীম আগ্রহে। মূল কথা হলো, আপনাদের পড়াশোনার মাত্র হাতেখড়ি হলো। উপরিউক্ত কবিতায় যেমন বলা হয়েছে, মৃত্যুর মাধ্যমে প্রকৃত জীবনের মাত্র সূচনা হলো।

মুহতারাম আদিব হুজুর, যার আলোকিত স্বপ্নেরই বাস্তবায়ন এই মাদানি নেছাব, তিনি এই নেছাবের সূচনালগ্নেই বলেছিলেন, মাদানি নেছাব প্রতিষ্ঠার পেছনে আমার বড় এক উদ্দেশ্য হলো, তালিবানে ইলমের পূর্ণ যোগ্যতার খোরাক দিয়ে অবশেষে তাদের দুয়েকটি বছর বাঁচিয়ে দেয়া।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনের পরে প্রত্যেকেই যেনো নিজের জন্য উপযুক্ত বিষয়ে দক্ষ অভিজ্ঞ ও শাস্ত্রীয় কোনো উস্তাদের তত্ত্বাবধানে থেকে অতিরিক্ত দুয়েক বছর গভীর অধ্যাবসায় , কঠোর সাধনা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারে। নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে হতে পারে পূর্ণাঙ্গ এক আলিম।

তাই আমার তালিবে ইলম ভাইদের উদ্দেশ্যে আমার একান্ত নিবেদন , আপনারা আরো পড়ুন। পূর্ণরূপে যোগ্যতা অর্জন করুন। আপন প্রতিভা বিকশিত করুন। আমাদের সময়ে আমরা এ সুযোগ পাইনি। দাওরায়ে হাদিসের পরে আর প্রতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার সুযোগ ছিলো না তেমন। আপনারা যেহেতু সে সুযোগ পেয়েছেন সুতরাং তা গনিমত মনে করুন।

সম্মানিত অভিভাবকগণের উদ্দেশ্যে এবার দুয়েকটি অগোছালো কথা নিবেদন করি। আপনাদের মনে এটা আসতে পারে এবং স্বাভাবিকভাবেই আসতে পারে , আমার ছেলে দাওরায়ে হাদিস সমাপন করেছে , আলিমের তালিকায় তার নাম উঠেছে , সে এখন আয়-রোজগার করবে, আমাদের ভোজ-আহারের ব্যবস্থা করবে। এই ভাবনা দোষের নয় , খারাপও নয়। কিন্তু কখনো একজন আলিমের অভিভাবকের মূল চিন্তা ও উদ্দেশ্য এটা হতে পারে না। কেননা আপনারা কী খাবেন , কে খাওয়াবে , উপার্জন কে করবে , সব কিছু তো পূর্ব নির্ধারিত। আপনাদের দেশে এখন বাজেটের মাস চলছে। আপনার আমার জীবনের বাজেট তো সেই কবে আমাদের সৃষ্টিরও বহুকাল পূর্বে ঘোষিত হয়ে আছে। সবকিছু চলবে সে অনুযায়ীই। তার থেকে এক চুল এদিক -সেদিক হবে না কখনো। সুতরাং নির্ধারিত সেই জীবনোপকরণ অর্জনের ক্ষেত্রে যদি সঠিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় , তবে তাই সাফল্যের দীপ্ত শিখা। আর যদি পদ্ধতিগত ত্রুটির শিকার হয় বান্দা , তবে তা নিতান্তই ভুল ও নিন্দনীয়। তাই রিজিক নিয়ে অযথাই মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه + و كم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا.

هذا الذي ترك الأوهام حائرة + و صير العالم النحرير زنديقا

কতো জ্ঞানীর জীবিকার সকল পথ রুদ্ধ। অথচ কতো মূর্খকে দেখতে পাবে বেশ সুখী সচ্ছল। এ এমন বিষয় , যা চিন্তাকে বিমূঢ় করে দেয় এবং মহান আলিমকে পর্যন্ত ধর্মহীন করে ছাড়ে।

পৃথিবীতে কতো বুদ্ধিমানই তো না খেয়ে দিন গুজরান করে। এমন নজিরও তো অসংখ্য , এক বাবার একাধিক সন্তান। যে সন্তান নিতান্তই নির্বোধ অক্ষরজ্ঞানহীন , বিত্তে -প্রাচুর্যে সে অন্যদেরকে হার মানায়। আমাদের দেশে শীর্ষ ধনীদের তালিকায় এমন অর্বাচিনেরও নাম আছে , স্বাক্ষর করতে যার কলম ভাঙ্গে।

তো ভাই বিত্তের প্রাচুর্যের ভিত্তি না শক্তির ওপরে না জ্ঞানের ওপরে আর না অন্য কিছুর ওপরে। তা তো আল্লাহর বরাদ্দ থেকে বাড়বে না , কমবেও না। মানুষ যে পন্থাই অবলম্বন করুক না কেনো। যে পেশাই গ্রহণ করুক না কেনো।

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. و من أراد الآخرة و سعى لها سعيها و هو مؤمن فأولائك كان سعيكم مشكورا.

যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনের ভোগ -সম্ভোগের উপকরণ চায় আমি সত্ত্বর যাকে যদ্দুর ইচ্ছে দিয়ে দেই। এরপর তার জন্য নির্ধারণ করি জাহান্নাম। তাতে সে প্রবেশ করবে ধিকৃত লাঞ্ছিত অবস্থায়। আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা -সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। সূরা বনী ইসরাঈল - ১৮,১৯।

তাই সরল পথে থেকে যতোটুকু আসে তাকেই গনিমত মনে করা। আর এর জন্য অস্থির না হওয়া। চিত্তকে দুনিয়ার পেছনে প্রলুব্ধ না করা।

সহজ উদাহরণ দেখুন, একজন সাধারণ রিক্সাওয়ালা, সারাদিনে তার কামাই অন্তত ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা। কিন্তু দেশের অধিকাংশ কওমি মাদরাসার বিজ্ঞ অভিজ্ঞ প্রাজ্ঞ একজন শিক্ষকের তিন-চার দিনের বেতন মেলালেও ৫০০ টাকা হয় না। সুতরাং ছেলের আয়-রোজগারকে মূল লক্ষ্য বানিয়ে কোনো লাভও নেই। উপরন্তু তাতে রয়েছে ইখলাস-একনিষ্ঠতা বিলুপ্তির পূর্ণ শঙ্কা।

এক সাহাবি রাসূলের দরবারে এসে অভিযোগ জানালেন, আমরা নিতান্তই গরিব হতদরিদ্র পরিবার। অজপাড়াগাঁয়ের ছোট্ট এক খুঁপড়িতে আমাদের বসবাস। এমন সকরুণ অবস্থায় আমার ভাই এসে সারাদিন আপনার মজলিসে পড়ে থাকে। সে দীনী জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে। অপরদিকে তার পরিবার অবর্ণনীয় কষ্টে দিনাতিপাত করে। তাকে একটু বলে দিন, সে যেনো পরিবারের জন্য কিছু মেহনত-পরিশ্রম করে। এ ব্যাপারে যদিও শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি সেটাই, যা এই সাহাবি আবেদন করেছেন। কিন্তু মহান রাসুল সেদিন সে জবাব দেননি। বরং তিনি বললেন, لعلكم ترزقون بضعفائكم সম্ভবত দুর্বলদের কারণেই তোমরা রিজিকপ্রাপ্ত হও।

একটি গল্প মনে পড়ে গেলো, এক ভদ্রলোক ভাত খাওয়ার সময় একটি ভাত মস্তিষ্কে চলে গেলো। সাধারণত হাঁচি দিলে এ সকল ক্ষেত্রে ভাত বেরিয়ে আসে। কিন্তু কোনো উপায়েই তার ভাত আর বের হচ্ছে না। পরিত্রাণের সকল উপায় যখন রুদ্ধ অকেজো, দিনভর যন্ত্রণায় কাঁতরাতে

কাঁতরাতে অবশেষে সেও নিরাশপ্রায় , তখন কোনো বিজ্ঞজন তাকে তৎকালীন পৃথিবীর যে শহরে ছিলো চিকিৎসা -বিজ্ঞানের জয়জয়কার - সেই ইউনানে গিয়ে চিকিৎসা গ্রহণের পরামর্শ দিলো। পরামর্শ অনুযায়ী সেও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো। ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে বসতেই তার এক হাঁচি এলো। অমনি বেরিয়ে এলো মস্তিষ্কে প্রবল যন্ত্রণা সৃষ্টিকারী সেই ভাত। ভাতটি মাটিতে পড়তেই টুপ করে গিলে ফেললো পাশে থাকা একটি মুরগী। তারও আর চিকিৎসার প্রয়োজন হলো না। সকল যন্ত্রণা মুহূর্তেই লাঘব হলো।

তো ভাই, ঐ ভাতের দানা সেই মুরগিটির জন্যই তো নির্ধারিত ছিলো। তাই হাজার মাইল দূর থেকে মানুষের মস্তিষ্কে চড়ে অবশেষে তা যথাসময়ে সেই মুরগির কাছেই পৌঁছেছে। যদিও মাঝে পাড়ি দিয়ে এসেছে বহু চড়াই -উৎরাই। এই তো রিজিকের হাকীকত! ألا لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله و أجملوا في الطلب. জেনে রেখো , প্রাণী যাবত না তার রিজিক পূর্ণরূপে ভোগ করেছে তার মৃত্যু হতে পারে না কিছুতেই। সুতরাং ভয় করো তোমরা আল্লাহকে। আর জীবিকা অন্বেষণে সংক্ষিপ্ততম পন্থা গ্রহণ করো।

আমাদের জীবন তো খোদার রাহে ওয়াকফ। এই ওয়াকফকৃত সম্পদ থেকে যা আসে , যতোটুকুই আসে তাই অতিরিক্ত।

আর ভাই, ওয়াকফ যখন করা হয়েই গেছে, তো আজ দৃঢ়ভাবে এই অঙ্গীকার করে নাও, জীবন আল্লাহর পথেই চলবে। আসুক না যতো বাধা। মারয়াম আ . এর মা

সন্তানকে বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমাতে ওয়াকফ করেছিলেন। কোরআনে
যার বর্ণনা এরূপ ,

قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.

মারয়াম আ.এর মা যখন বললো, হে আমার পালনকর্তা ! আমার গর্ভে যা রয়েছে
আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে।
আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও , নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ,
সর্বজ্ঞ।

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى و الله أعلم بما وضعت و ليس الذكر كالأنثى و
إني سميتها مريم و إني أعيذها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم.

এরপর যখন সে গর্ভ প্রসব করলো তখন বললো , হে আমার পালনকর্তা ! আমি
একে কন্যা প্রসব করেছি। বস্তুতঃ কি সে প্রসব করেছে আল্লাহ তা
ভালোই জানেন। পুত্র তো আর কন্যার মতো নয়। আমি তার নাম রাখলাম
মারয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ
করছি অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে।

فتقبلها ربها بقبول حسن و أنبتها نباتا حسنا و كفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا
المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق
من يشاء بغير حساب

তারপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে
প্রবৃদ্ধি দান করলেন - অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাঁকে
যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পন করলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবের
মধ্যে তার কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস
করতেন "মারয়াম , কোত্থেকে এ সকল খাবার তোমার কাছে এলো ?" তিনি

বলতেন, "এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান করেন।" সূরা আলে ইমরান - ৩৫-৩৭।

তো ভাই, তাকওয়ার যিন্দেগি অবলম্বন করো। আকাবির-আসলাফের যিন্দেগিকে নিজেদের জন্য নমুনা বানাও। এই মুহূর্তে থানবি রহ.এর একটি ঘটনা মনে পড়ে গেলো। ঘটনাটির নাম আমি দিয়েছি "তারপর"। ঘটনাটি হলো, একবার থানবি রহ. কোথাও সফর করে থানাভবন ফিরছিলেন। রেলগাড়ি ছিলো তখনকার যাতায়াত মাধ্যম। পথিমধ্যে তিনি কিছু আখ কিনলেন। তার ধারণা অনুযায়ী ট্রেনে বিনামূল্যে বহনযোগ্য ওজনের থেকে আখের ওজন ছিলো বেশি। তিনি তাই অতিরিক্ত ভাড়া পরিশোধের জন্য স্টেশন মাস্টারের কাছে গেলেন। মাস্টারকে বললেন, ওজন করে অতিরিক্ত মূল্য নিয়ে নিন। মাস্টার পূর্ব থেকেই থানবি রহ.কে চিনতেন। তিনি তাই অতিরিক্ত ভাড়া নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। বললেন, আরে, এ আর কী! সামান্য জিনিসই তো! আপনি ট্রেনে উঠে পড়ুন। ভাড়া লাগবে না। থানবি রহ. বললেন, না, আপনি ওজন করে এর ভাড়া নিয়ে নিন। তখন মাস্টার বললো, না হুজুর, ভাড়া লাগবে না। আমি গার্ডকে বলে দেবো। থানবি রহ. বললেন, তারপর? মাস্টার বললেন, তারপর তো আপনি নেমে চলে যাবেন। থানবি রহ. বললেন, যেহেতু সাবলাইন, আমাকে তো তাই ট্রেন পাল্টাতে হবে। মাস্টার বললেন, সমস্যা নেই। আমি গার্ডকে বলে দেবো, সে যেনো ঐ গাড়ির গার্ডকে বলে দেয় যে, হুজুর ভাড়া দিতে চেয়েছিলেন। আমরা নেইনি। থানবি রহ. বললেন, তারপর? মাস্টার বললেন, তারপর আপনি নেমে বাড়িতে চলে যাবেন। থানবি রহ. বললেন, না তারপর আরেকটা আছে। মাস্টার বললেন, হুজুর, সেই তারপর তো বুঝলাম না। থানবি রহ. বললেন, আচ্ছা মাস্টার সাহেব, ইংরেজ সরকার কি আপনাদেরকে এ অধিকার দিয়েছে, আপনারা চাইলে কারো ভাড়া মাফ করে দিতে পারবেন? মাস্টার সাহেব বললেন, হুজুর, কাগজের আইনে সে অধিকার আমরা প্রাপ্ত হইনি। তবে আমরা এমনটা তো করে থাকি। থানবি রহ. বললেন, মাস্টার সাহেব, আল্লাহ তো আমাকে কিছু ইলম দিয়েছেন। কেয়ামতের দিন তিনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে বসেন, এ পরিমাণ মাল বিনা ভাড়ায় বহন করা রাষ্ট্রীয় আইনে অবৈধ। তবু কেনো এ অন্যায়

কাজ তুমি করলে ? তখন আমি কী জবাব দেবো? তখন তো আমি পাবো না আপনাকে আর না আপনার গার্ডকে। কী অবস্থা হবে তখন আমার ?

ভাই, আমার এ কথার সারনির্যাস হলো , و اتقوا الله و يعلمكم الله

তাকওয়া অবলম্বন করো। আল্লাহ তোমাদেরকে ইলম দিবেন। তাকওয়া শব্দটি পবিত্র কোরআনে বহুবার এসেছে। যার মূল ধাতুর অর্থ হচ্ছে , রক্ষা করা তথা আত্মরক্ষা করা। শত্রুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো। আর মানুষের প্রকৃত শত্রু হলো তার নফস এবং শয়তান। এ শত্রুদ্বয়ের কথা মান্য করলে যেতে হয় জাহান্নামে। তাকওয়া হলো সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। এর সর্বনিম্ন স্তর হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা। আর সর্বোচ্চ স্তর হলো যা কিছু করা , সবই এক আল্লাহর সন্তুষ্টের নিমিত্তে করা। যেমন আপনার ছেলেকে আপনি লেখাপড়া করাচ্ছেন , এটাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। যদিও এটা আপনার দায়িত্ব। এমনকি ভালোবেসে স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দিলে তাতেও সদকার সাওয়াব লেখা হবে। তাই আপনি আপনার ছেলেকে পড়াচ্ছেন এবং উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার মানসে আরো পড়াবেন, তার পেছনে অনেক টাকা খরচ হবে , তবে মনে রাখবেন , অন্যকে সদকা করলে যে সাওয়াব আপনি পেতেন , তারচে বহুগুণ বেশি এক্ষেত্রে পাবেন। কতো বেশি - আল্লাহই তা ভালো জানেন। সুতরাং দুনিয়াতে এর বিনিময় আশা করা অনর্থক বৈ কিছু নয়।

আর একটি কথা হলো, সময়ের মূল্যায়ন করতে হবে। আমরণ ইলম অন্বেষণের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। থানবি রহ . এর কথা মনে পড়লো। তিনি লিখতে থাকতেন। হঠাৎ বদনা নিয়ে টয়লেটের দিকে দৌড়ে যেতেন। আবার কখনো বদনা টয়লেটে রেখে পুনরায় ছুটে আসতেন টেবিলের কাছে। না জানি আসমানি ইলহাম-ভাবনা উধাও হয়ে যায় টয়লেটে অবস্থান করতে করতে।

ইবনে জারির তাবারি রহ . এর ঘটনা। মৃত্যুর আধ ঘণ্টা পূর্বে এক ব্যক্তি তার কাছে এসে জানালো , অমুক বর্ণনাকারী রাসুলুল্লাহ সা .

সূত্রে এই দোয়া বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন , জলদি কাগজ-কলম দাও। আশপাশের ব্যক্তিরা বললো , হুজুর এ অবস্থায়ও ? তিনি বললেন , ইলম শেখার ধারা অব্যাহত থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ . যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত , তখন ইমাম আওযাইয়ি রহ. তার সাক্ষাতে গেলেন। ইমাম আবু ইউসুফ রহ . তাকে জিজ্ঞেস করলেন , হজে কঙ্কর নিক্ষেপের সময় ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলবে না বাহনে ? আওযায়ি রহ. বললেন, পায়ে হেঁটে। আবু ইউসুফ রহ . বললেন, না আওযায়ি রহ. বললেন, তাহলে বাহনে চড়ে। আবু ইউসুফ রহ . বললেন, না। আওযায়ি রহ . বিস্মিত হয়ে এর সমাধান জানতে চাইলেন। ইমাম আবু ইউসুফ রহ . বললেন, প্রথম দুই শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপের সময় পায়ে হেঁটে চলবে আর শেষ শয়তানের ক্ষেত্রে বাহনে আরোহণ করবে। উত্তর শুনে আওযায়ি রহ . আরো বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন , কেনো? আবু ইউসুফ রহ. বললেন, প্রথম দুটির পরে তো দোয়া আছে আর শেষটির ক্ষেত্রে কোনো দোয়া নেই। এ আলোচনা শেষ করে আওযায়ি রহ. দরজার কাছে আসতেই খবর এলো, ইমাম আবু ইউসুফ রহ . শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

এই হলো জীবন! এ জীবনটাকে ঢেলে সাজাতে হবে। সুন্দর করতে হবে। ইলম অন্বেষণের ধারা আমরণ অব্যাহত রাখতে হবে এবং এই অন্বেষণকে সৌভাগ্য জ্ঞান করতে হবে। আমরা উভয় পক্ষ , তালিবানে ইলম ও তাদের অভিভাবকগণ , কেউ ইলমের বিনিময়ে পৃথিবীর স্বল্প অর্জনের প্রতি প্রলুব্ধ হবো না।আমাদের বিনিময় তো আল্লাহর কাছে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমিন।

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

২.৬.২০১৫

বয়ানঃ মাওলানা ইসমাইল বরিশালী দা. বা.

শাইখুল হাদিস - বাইতুস সালাম মাদরাসা এবং দীর্ঘ বাইশ বছরের সফল ইতিহাস রচয়িতা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বেফাক শিক্ষা বোর্ড; খলিফা - হাফেজ্জী হুজুর রহ.

শ্রুতিলিখনঃ আলী হাসান উসামা ও যোবায়ের বিন জাহিদ

নির্দেশক্রমেঃ মাওলানা খন্দকার মনসুর আহমাদ, সিনিয়র মুহাদ্দিস, বাইতুস সালাম মাদরাসা

(তাকমিল, বাইতুস সালাম মাদরাসা - ১৪৩৫-৩৬ শিক্ষাবর্ষ)

বাবরি মসজিদ ট্রাজেডিঃ

ইতিহাসের লাল অধ্যায়

ALI HASAN OSAMA·TUESDAY, APRIL 4, 2017
লেখাটি চার বছর পূর্বে আননাদিল ইমদাদি আল-ইসলামির মুখপত্র মাসিক সেবার একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো। সংরক্ষণের জন্য এখানে নোট আকারে পাবলিশ করা হলো।

এক.

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই নির্যাতিত হচ্ছে মুসলিম জাতি। নিপীড়িত হচ্ছে প্রতিটি ক্ষণে। সুপ্রশস্ত পৃথিবী তাদের জন্য বড় সংকীর্ণ সেই প্রাচীন যুগ থেকে আজও। মুসলমানের দুঃখ-দুর্দশায় দু’ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরাবে এমন সৎ ও সাধুর দেখা মিলে না ধরিত্রীর কোথাও। ইউরোপ আমেরিকা ভারত ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো মুসলিম নিধনের মহড়া চালাচ্ছে অবিরাম। এতে বেশ উল্লসিত বহু হৃদয়, উচ্ছসিত অসংখ্য অন্তর। মুসলমানের খুন ঝরলে, ইসলামি সাম্রাজ্য পর্যুদস্ত হলে গগনবিদারী হাসির হররা ছোটে তাদের মহলগুলোতে। পৃথিবী থেকে মুসলিম জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর তারা। তাদের প্রতিজ্ঞা, সত্যের দীপ্ত মশালকে নিজেদের মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে তবেই তারা ক্ষান্ত হবে। কিন্তু কেনো এই হিংস্রতা ও নির্মমতা? মুসলমানদের প্রতি কেনো এই রূঢ়তা ও অবজ্ঞা? কী তাদের অপরাধ? সাহাবিদের সোনালি যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বুকের লাল খুনে রঞ্জিত হয়েছে কতো যে মুসলিম, গুড়ানো হয়েছে কতো যে মসজিদ তার হিসাব আল্লাহই ভালো জানেন। স্মরণকালে বাবরি মসজিদ বিধ্বস্ত হওয়া ধারাবাহিক সেই নৃশংসতার এক করুণ ইতিহাস! বুকের তপ্ত খুনে রচিত লাল ইতিহাস।

দুই.

১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে আক্রমণ করেন সম্রাট বাবর। পরপর চারবার পরাজয় বরণের পরে ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের ভূমিতে মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন তিনি। ভারতের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনে এ বিজয়। ইসলামের হেলালি নিশান পতপত করে উড়তে থাকে পুরো দেশজুড়ে। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট বাবর ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা রাজ্যে তার গভর্নর নিযুক্ত করেন মীর বাকি তাশকন্দিকে। সম্রাটের আজ্ঞাবহ গভর্নর মীর বাকি তাশকন্দি ১৫৩৮ সালে অযোধ্যা রাজ্যের ফয়জাবাদে এক খণ্ড পতিত জমিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। সম্রাট বাবরের স্মরণে মসজিদের নাম রাখা হয় বাবরি মসজিদ।

তিন.

ভারতে মুসলমানদের আধিপত্য কোনোক্রমেই সইতে পারছিলো না সেখানকার কট্টরপন্থী হিন্দুরা। ক্ষোভের দহনে ছটফট করছিলো তারা। মুসলমানদের রাজ্য জয় তাদের দেহ থেকে ধড় আলাদা করে দিয়েছে, ভেতর থেকে প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। মুসলমানদের রক্তে গা ভেজাতে মরিয়া হয়ে ওঠে তাদের অন্তরাত্মা। উদ্দেশ্য সাধন করতে এক ঝান্ডার ছায়াতলে আশ্রয় নেয় তাদের সকলে। মুসলমানের ক্ষতি সাধন করতে প্রয়াসী তাদের প্রতিটি সদস্য। ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করে তারা। পরিশেষে তাদের ষড়যন্ত্র পরিগ্রহ করে এক ভয়াবহ রূপ। ফয়জাবাদের যে ১৫০০ শতকে নির্মিত হয়েছিলো বাবরি মসজিদ, সেই জমিকে রাম মন্দিরের জন্য বরাদ্দকৃত বলে ঘোষণা দেয় তারা। প্রোপাগান্ডা ছড়াতে থাকে দেশের সর্বত্র। উগ্রতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে তাদের সত্তা-অন্তরাত্মা। ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র! একবার, দু’বার পরপর বিশবার হামলা চালায় তারা। খোদার ঘরের সঙ্গে এ ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে তারা উল্লাসে ফেটে পড়ে। খুশির প্রচণ্ডতায় মিছিল বের করে এলাকার পর এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

চার.

ভারত তখন ব্রিটিশ শাসনের অধীন। এহেন সময় মোঘল সম্রাটদের দেশ পরিচালনা ও তাদের দ্যুতিময় স্মৃতি কাঁটা হয়ে বিঁধতে থাকে মুসলমানদের হৃদয়ে। কাল অতিক্রান্ত হতে থাকে, দিন অতিবাহিত হতে থাকে, মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশাও অধিক থেকে অধিকতর হতে থাকে। হিন্দুস্তানের গাছপালা আজও সাক্ষী হয়ে আছে, কী ভয়াল বিভীষিকা আবর্তিত হয়েছিলো তখন মুসলমানদের ওপরে। পথের দু’ধারে গাছের ডালে ডালে ঝুলছিলো বিজ্ঞ আলিমগণের পঁচে যাওয়া লাশ। গন্ধের তীব্রতায় পথচলা অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো তখন। প্রকাশ্যে আজান ও জামাতের সাথে

নামাজ আদায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বাবরি মসজিদের ওপর চলতে থাকে পিশাচদের ক্রমাগত হামলা।

পাঁচ.

১৮৮৫ সালে অযোধ্যার কট্টরপন্থী হিন্দুরা বাবরি মসজিদ গুড়িয়ে হৃদয়ের খেদ ও অন্তরের জ্বালা মেটাতে ও পূর্বপুরুষদের সাধ-লালসা বাস্তবায়ন করতে আরো মরিয়া হয়ে ওঠে। ক্ষুধার্ত হায়েনার মতো তেড়ে আসতে থাকে বাবরি মসজিদ পানে। চোখে তাদের এক মন্দিরের স্বপ্ন। বুকে তাদের এক মসজিদ চূর্ণ করার বাসনা। সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে উপস্থিত হয় তারা বাবরি মসজিদ প্রাঙ্গণে। ইমানের সুপ্ত শিখা জ্বলে ওঠে মুমিনদের হৃদয়ে। খোদাদ্রোহীদের বিষাক্ত ছোবল থেকে খোদার ঘরকে সুরক্ষিত রাখতে প্রতিরোধের ময়দানে তারা ছুটে আসে। লাঠিসোটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্ধত হিন্দুদের ওপরে। কিন্তু হিন্দুদের উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের সামনে তাদের প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ে। একের পর এক লুটিয়ে পড়তে থাকে ফয়জাবাদের ভূমিতে। শহিদানের রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে সেখানকার সবকিছু। বাবরি মসজিদকে শেষ বিদায় জানিয়ে, তার চিরোজ্জ্বল শোভার প্রতি আরেকবার দৃষ্টি বুলিয়ে শহিদানের কাফেলা হারিয়ে যেতে থাকে না ফেরার জগতে। পঁচাত্তর জন ইমানদীপ্ত মুসলমান সেদিন খোদাদ্রোহীদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন।

ছয়.

এভাবেই নির্যাতিত হচ্ছিলো মুসলিম জাতি। নির্যাতিত হচ্ছিলো বাবরি মসজিদ। অসহায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর দৃষ্টি তখন ঊর্ধ্বালোকে। পার্থিব ক্ষমতা ও প্রতাপ নেই তাদের। নেই হিন্দুদের প্রতিরোধ করার মতো সমরশক্তি। সরকারের সমর্থনও তারা পায়নি। তাদের সম্বল ছিলো শুধু ইমানি বল ও খোদার মদদ। তবুও তারা দমবার পাত্র নয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাবরি মসজিদে ইবাদত-বন্দেগি চালু রাখে। রোনাজারি ও ফরিয়াদ

করতে থাকে খোদার দরবারে। অশ্রুর বান বইয়ে দিয়ে দু’হাত তুলে প্রার্থনা করতে থাকে, খোদা হে, তোমার ঘরকে তুমিই রক্ষা করো। আমরা বড় দুর্বল। আমাদের তুমি শক্তি যোগাও। তোমার পবিত্র ঘরের সাথে হঠকারীদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দাও।

সাত.

১৮৮৭ সালে হিন্দুরা পুনরায় হামলা করে বাবরি মসজিদের ওপরে। মুসলমানরাও মৃত্যুর শপথ নিয়ে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে। এক পর্যায়ে অনন্যোপায় হয়ে পড়ে তারা। শহিদানের লাশ নিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয় মুসলমানরা। শহিদানের কাফেলা বাবরি মসজিদের চত্বরে ও দেয়ালে সাক্ষীস্বরূপ রেখে যায় রক্তের ছিটেফোঁটা। মুসলমানদের দুর্বল করে মসজিদ চত্বরের কিছু অংশ দখল করে নেয় কট্টরপন্থী হিন্দুরা। তারা তখন সেখানে রামপূজার ছোট বেদি নির্মাণ করে। মুসলমানরা তখনও খোদার ঘরে ইবাদত-বন্দেগি চালু রাখে। ফলে একই সাথে চলতে থাকে মহান স্রষ্টার ইবাদত ও পাথরে নির্মিত রামের পূজা। মুসলমানদের হৃদয় গহীনে বাজতে থাকে বেদনার সকরুণ সানাই। পানির বুকে যেমন তলতল ধারা, মুসলমানদের বুকে তখন তেমন খলখল সর্বনাশা বান। অবিরমা কান্নার স্রোত বইতে থাকে তাদের দু’চোখ বেয়ে। কান্নার খিনখিন আওয়াজে রণিত হয়ে ওঠে আকাশ বাতাস। ফরিয়াদের আওয়াজ ভেসে আসে, হে মহান খোদা, আবরাহার হস্তিবাহিনীর হামলা থেকে বাইতুল্লাহকে তো তুমিই সুরক্ষিত রেখেছিলে। আজ আমাদের এই সুকঠিন ও অসহায় মুহূর্তে বাবরি মসজিদকে তোমার গায়বি ব্যবস্থায় সুরক্ষিত রাখো। আমরা আমাদের সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এখন তোমার হাতেই সবকিছু। ওদেরকে তুমি ধ্বংস করো। কালিমার হেলালি নিশান সমুন্নত করো।

আট.

১৯৩৪ সালে সারা ভারতজুড়ে শুরু হয় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা। মুসলমানদের জন্য বড় সংকীর্ণ হয়ে যায় পৃথিবী। তাদের লাশের স্তুপ ও রক্তের বন্যা দেখে আকাশ বাতাসও কেমন যেনো ভারি হয়ে ওঠেছিলো। মুসলিম জাতির সেই কঠিন কালে হিন্দুরা পুনরায় হামলা চালায় বাবরি মসজিদের ওপরে। মসজিদের দেয়ালের অংশবিশেষ ভেঙ্গে ফেলে তারা। এরপর আসে ১৯৪৯ সাল। তা ছিলো অসহায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য চরম বিপর্যয়ের সময়। অকস্মাৎ একদিন উগ্র হিন্দুরা বাবরি মসজিদে ঢুকে সেখানে রামের মূর্তি স্থাপন করে। এ নিয়ে উত্তেজনা দেখা দিলে সরকার মসজিদ চত্বরকে ‘বিরোধপূর্ণ এলাকা’ ঘোষণা দেয়। এতে মুসলমানরা মসজিদে নামাজ আদায় করার সুযোগ না পেলেও হিন্দুরা রামের পূজা অব্যাহত রাখে। মুসলমানরাও পা গুটিয়ে বসে থাকেনি। কিছুদিনের মধ্যেই তারা বাবরি মসজিদ দখলে এনে তাতে তালা লাগিয়ে দেয়। ফলে সাময়িক সময়ের জন্য হিন্দুদের রামপূজা ব্যাহত হয়। ১৯৮৩ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মসজিদ চত্বরে মন্দির নির্মাণের অভিযান শুরু করে এবং মসজিদের তালা খুলে দেয়ার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানায়। মুসলমানরা তাদের আহ্বান ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফয়জাবাদের জেলা জজ তার এক রায়ে মসজিদের তালা খুলে দেয়ার নির্দেশ জারি করে, হিন্দুরা যাতে বিনা বাধায় বাবরি মসজিদে রামের পূজা করতে পারে। এ রায়ের প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। গঠন করা হয় ‘বাবরি মসজিদ একশন কমিটি’। বাবরি মসজিদ রক্ষার্থে জীবন বিসর্জনের শপথ নেয় কমিটির সকল সদস্য। বুকের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও বাবরি মসজিদকে খোদাদ্রোহীদের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখবে এ অঙ্গীকার করে তারা। ‘বাবরি মসজিদ একশন কমিটি’র ডাকে ১৯৮৭ সালের ১৪ জানুয়ারি পালন হয় ‘কালো দিবস’। সারা ভারতে তখন পুনরায় শুরু হয় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা। আবারো সারা দেশজুড়ে বইতে থাকে রক্তবন্যা।

নয়.

১৯৮৯ সালে হিন্দু পরিষদ, ভারতীয় জনতা পার্টি প্রভৃতি হিন্দু সংগঠন বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির নির্মাণের ঘোষণা দেয়। এ বছরই ২রা নভেম্বর বাবরি মসজিদে নিশান উড়িয়ে তারা তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করে। সে সময়ে ভারতের ক্ষমতায় ছিলো রাজীব গান্ধী। অধিকাংশ বিশ্লেষকের ধারণা, কংগ্রেসের সহযোগিতায় হিন্দুরা এ কাজ করতে সমর্থ হয়েছে। কংগ্রেসের পতন হলে ১৯৯০ সালে বিজেপির সহযোগিতায় ক্ষমতার আসনে সমাসীন হন ‘বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং’। বিশ্বনাথ প্রতীপ সিং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিন পরেই বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদভানি বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে রাম মন্দির নির্মাণের ঘোষণা দেয় এবং অযোধ্যা অভিমুখে রথযাত্রার আয়োজন করে। এ সময়ে ভারতের উত্তর প্রদেশের ক্ষমতায় বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের জনতা দল যাদবের নেতৃত্বাধীন ছিলো রাজ্য সরকার। সরকার লালকৃষ্ণ আদভানির এ অমার্জিত অন্যায় ও উগ্র তৎপরতাকে বাধা দেয় এবং তার নির্দেশে পুলিশ আদভানিকে গ্রেফতার করে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করে। এ সময়ে পুলিশের গুলিতে বিজেপির বিশ সদস্য নিহত হয়। হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় নিহত হয় আরো শত শত লোক।

এ বছরের জুলাই মাসে নরসীমা রাওয়ের সময় বাবরি মসজিদ প্রাঙ্গণে রাম মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। তখনও মসজিদের ক্ষতি সাধন করেনি খোদাদ্রোহীরা। উগ্র হিন্দুদেরকে প্রতিরোধ করতে সর্বস্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলমানরা। আবারো শুরু হয় রক্তের খেলা। বিরোধ নিষ্পত্তি জন্য নরসীমা তিন মাসের জন্য মন্দির নির্মাণের কাজ স্থগিত রাখে। পরিশেষে ১৯৯২ সালের ৫ই ডিসেম্বর লাখ লাখ লোকের উপস্থিতিতে উগ্র হিন্দুরা খোদার ঘর বাবরি মসজিদকে সমূলে ধ্বংস করে উল্লাসে ফেঁটে পড়ে। কিছু উগ্র যুবক পেশাব করে বাবরি মসজিদের বিধ্বস্ত ভবনে। মুসলমানদের হৃদয়গহিনে বয়ে যায় বেদনার স্রোত। দু’চোখ বেয়ে যায় অশ্রুর বান। হাপুসনয়নে অবিরাম কেঁদে চলে তারা। আকাশ-বাতাশ, বৃক্ষলতা ও পত্রপল্লব হতবাক হয়ে দেখছিলো এ নির্মম ঘটনা। বাতাসের প্রবাহের সেদিন কেমন যেন বইছিলো ধীরে ধীরে।

দশঃ

উগ্রবাদী হিন্দু সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার পর সারা ভারতে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা ছাড়িয়ে পড়ে। এদিন এবং তার পরের দিন হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় নিহত হয় ২৩৭ জন নিরীহ মুসলিম। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ভারত সরকার উত্তর প্রদেশের বিজিপির নেতৃত্বাধীন সরকারকে বরখাস্ত করে এবং সেখানে প্রেসিডেন্ট শাসন জারি করে। ৭ই ডিসেম্বর সারা ভারতে ঘটে এক নারকীয় দাঙ্গা এবং সহিংসতা। দিল্লি, আহমদাবাদ, জয়পুর, ভূপাল, এলাহাবাদ, বোম্বাই প্রভৃতি এলাকায় প্রচণ্ড সহিংসতায় প্রায় ১ হাজার নিরীহ মুসলমান শাহাদত বরণ করেন। ক্রমেই দাঙ্গা আরো ব্যাপকতা লাভ করে এবং পরের দিন তা গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ প্রদেশ এবং মহীশুরে তণ্ডবলীলার আকার ধারণ করে। শাহজানপুর, ফয়জাবাদ, লাখনৌ, বানারসি, ফহেতনগর এবং কাঁসীতেও তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। চলমান সহিংসতায় আরো দেড় হাজার মুসলমান শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন। ১০ ও ১১ ডিসেম্বরও এ দাঙ্গার প্রচণ্ডতা কমেনি। মুসলমান জনপদের ঘরে ঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। অবুঝ শিশুদের আঁছড়ে আঁছড়ে, বেয়োনটের খোঁচায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মুসলিম মেয়েদের সম্ভ্রমহানি করা হয়। মুসলমানদের রক্তে ভারতের মাটি হয়ে যায় রঞ্জিত। মুসলমানরা ধন-সম্পদের বুভুক্ষ ছিলো না, ছিলো না ক্ষমতার সুউচ্চ মহলের বিবিক্ষু। তারা চেয়েছিলো একটু নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু তাদেরকে চির বঞ্চিত করা হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে নির্মমভাবে।

চলমান ভয়াবহ দাঙ্গায় নিহত হয় আরো প্রায় দু’হাজার মুসলিম। দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কোলকাতা ও হাওড়ায় কারফিউ জারি করা হয়। কারফিউ চলাকালে ভারতীয় হিন্দু পুলিশ মুসলমানদের ওপর বেপরোয়া গুলি চালায়। কোথাও কোথাও ঘর থেকে টেনে এনে মুসলমানদেরকে হত্যা করা হয়। ভারতের সহিংসতার কারণে মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর

ব্যাপক হামলা ও হুমকির সৃষ্টি হয়। এদিকে মুসলমানদের প্রতিবাদ এবং রক্তাক্ত প্রতিরোধকে পরোয়া না করে উত্তর প্রদেশ সরকার বাবরি মসজিদের স্থানে হিন্দুদের পূজার অনুমতি দিলে আবারো সহিংসতা বৃদ্ধি পায়। ১১ই জানুয়ারি বোম্বাই এবং আহমদাবাদে ঘটে প্রচণ্ড দাঙ্গা এবং সহিংসতা। হিন্দুরা বল খাটিয়ে মুসলমানদের ঘরবাড়ি দখল করে নেয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো জোরপূর্বক নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। শুধু এতেই ক্ষান্ত হয় না। মুসলমানরা যেনো অফিস আদালত ও অন্যান্য কর্মস্থলে যোগদান করতে না পারে এজন্য তারা সরকার ও প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। অব্যাহত হত্যা, গুম এবং লুটতরাজের প্রেক্ষিতে প্রতিবাদস্বরূপ মুসলমানরা ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসকে বর্জন করে। কিন্তু এতে হিন্দুদের তাণ্ডবলীলা মোটেও কমেনি। আর এ সময়ে তাদের সহযোগিতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ভারত সরকার ও পুলিশ।

এগারো.

ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বিশাল দেশের অভ্যন্তরে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনা গোটা দুনিয়ার মানুষকে হতবাক করে দিয়েছে। বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার এ ষড়যন্ত্র ভারতে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার একটি অংশ। এক শিবসেনা যুবক যে বাবরি মসজিদের সর্বশেষ গম্বুজটি ভেঙ্গেছিলো সে তার এক সাক্ষাৎকারে বলেছে, “আমরা মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছি”।

এক শতাব্দীর চেয়েও দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধরে খোদার ঘর মসজিদ ভাঙ্গার কাজ সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছে কট্টরপন্থী হিন্দুরা। আমরা কি পারি না বাবরি মসজিদকে পুনরায় তার অস্তিত্ব ফিরিয়ে দিতে? আমরা কি পারি না শহিদানের বাসনা পূর্ণ করে ইতিহাসের সোনালি অধ্যায় রচনা

করতে? দেড়শ কোটি মুসলমানের প্রতি বাবরি মসজিদের এই আর্তি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

স্বামী-স্ত্রীর ওরাল সেক্সের মাসআলাঃ একটি সাধারণ পর্যালোচনা

ALI HASAN OSAMA·SUNDAY, APRIL 9, 2017
(এ বিষয়ে আলোচনা করাটা তবিয়তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং বলা যায় আমার স্বভাব-প্রকৃতি বিরোধী। কিন্তু অনন্যোপায় হয়েই আজ লিখতে বসা। এ বিষয়ে অনেকেই জানতে চায়। কিন্তু লজ্জাষ্কর বিষয় হওয়ায় প্রায় সবাই এড়িয়ে যান। মাওলানা লুতফুর রহমান ফরায়েজী সাহেব ছাড়া প্রসিদ্ধদের মধ্যে আর কেউ এ বিষয়ে ফতোয়া দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। এক্ষেত্রে তার ফতোয়াটাকেও তেমন একটা ভারি মনে হয়নি। শুধু এ যুগের মুফতিগণই নন, বরং পূর্ববর্তী ফকিহগণের স্বল্প সংখ্যকই এ ব্যাপারে কিছু বলেছেন। সাধারণ মানুষদের কার্যকলাপ দেখলে বোধ হয়, তারা একেকজন এটাকে একেকভাবে বিশ্লেষণ করে নিয়েছেন। কোরআন সুন্নাহ ফিকহের আলোকে এ বিষয়ে কিছু লেখার চেষ্টা করছি। আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা। যাদের মনে আগে থেকেই এ বিষয়ে প্রশ্ন এবং অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত রয়েছে, তারাই শুধু এ পোস্টের উদ্দেশিত পাঠক।)

এখানে ওরাল সেক্স বলতে বোঝানো হচ্ছে— মুখ গহ্বর কিবা জিহ্বা দ্বারা একে অপরের যৌনাঙ্গ চোষা (Suck করা) বা লেহন করা। উল্লেখ্য, যৌনাঙ্গে সাধারণভাবে মুখ ছোঁয়ানো অর্থাৎ চুমু দেয়া আর জিহ্বা দ্বারা স্ত্রীর যৌনাঙ্গের ভেতরাংশ কিবা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর যৌনাঙ্গ মুখের ভেতরে নিয়ে Suck করা এক বিষয় নয়। অনেককে দেখা যায়, খুব স্বাভাবিকভাবেই ফকিহগণের এক জায়গার বক্তব্য অপর জায়গায় প্রয়োগ করে বিধান বর্ণনা করে দেন। অথচ উপরিউক্ত দ্বিতীয় বিষয়টা আরেকটু গভীর এবং জটিল।

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْوَلاَ يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ

مَا رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ رَآهُ مِنِّي

سَأَل أَبُو يُوسُفَ أَبَا حَنِيفَةَ عَنِ الرَّجُل يَمَسُّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَمَسُّ فَرْجَهُ لِيَتَحَرَّكَ عَلَيْهَا هَل تَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا؟ قَال: لاَ، وَأَرْجُو أَنْ يَعْظُمَ الأَجْرُ .

ইমাম আবু ইউসুফ আবু হানিফা রহ. কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, যে তার স্ত্রীর যৌনাঙ্গ স্পর্শ করে এবং স্ত্রী তার যৌনাঙ্গ স্পর্শ করে, যেনো স্ত্রীর ওপর স্বামীর প্রবল আকর্ষণ জাগে— আপনি কি তাতে কোনো সমস্যা দেখেন? ইমাম আবু হানিফা রহ. বললেন, না, বরং আমি আশা করি, তাদের প্রতিদান আরো বেড়ে যাবে। {দেখুন— ফাতাওয়া শামি— ৫/২৩৪; মাওয়াহিবুল জালিল— ৩/৪০৬; আলখিরাশি আলা মুখতাসারিল খালিল — ৩/১৬০; ইআনাতুত তালিবিন— ৩/৩৪০; আলমাওসুআতুল ফিকহিয়্যা আলকুয়েতিয়্যা, ফারজুন শব্দের অধীনে}

হাম্বলি ফকিহগণ আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে লজ্জাস্থানে চুমু দেয়ার বৈধতার কথাও বলেছেন। তবে তা সহবাসের আগে, পরে নয়। {কাশশাফুল কিনা’— ৫/১৬-১৭}। কারণ তো স্পষ্ট। কেননা সহবাসের পরে সে জায়গায় নাপাকি থাকবে। আর নাপাকির ওপর চুমু দেয়ার বৈধতার কথা কেইবা বলবেন!

এবার আমরা মূল আলোচনায় আসি।

কোনো বিষয় হারাম হওয়ার জন্য সুস্পষ্ট নস (কোরআনের আয়াত বা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হাদিস) থাকা জরুরি। লজ্জাস্বানে চুমু দেয়া বা Suck করার নিষিদ্ধতার ব্যাপারে কোরআন হাদিসে কোনো কথাই পাওয়া যায় না। সুতরাং বিষয়টিকে অকাট্য হারাম বলার সুযোগ নেই। হাঁ, বাকি থাকলো মাকরুহে তাহরিমি এবং নাজায়িয বলা যাবে কি? (উল্লেখ্য, মাকরুহ দুই প্রকারঃ ১. মাকরুহে তাহরিমি— যা সম্পূর্ণ নাজায়িয। ২. মাকরুহে তানযিহি— যা থেকে বিরত থাকা উত্তম, তবে কেউ একান্ত লিপ্ত হলে গুনাহগার হবে না।)

ফিকহের স্বীকৃত মূলনীতি হলো—

الأصل في العادات/الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل التحريم

যে কোনো বিষয়ে মূল অবস্থা হলো বৈধতা , যতোক্ষণ না নিষিদ্ধতার দলিল পাওয়া যায়।

সহবাসের ক্ষেত্রে শরিয়ত পায়ুপথে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়াকে হারাম করেছে। রাসুলুল্লাহ সা . বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَلاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.

এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে শরিয়ত নীরব। তাহলে স্বাভাবিক হলো , যে কোনো পন্থায় স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়াই বৈধ হবে। সুরা বাকারার ২৩৩ নাম্বার আয়াত থেকেও এ কথার প্রমাণ মেলে।

এবার আমরা দেখি , ওরাল সেক্সের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে কোনো দলিল রয়েছে কিনা।

মেডিকেল সায়েন্সের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেক বিশেষজ্ঞই এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন , ওরাল সেক্স মানবস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং মানবদেহে অনেক রোগের জীবাণু উৎপত্তির ও সংক্রামণের কারণ। তারা এর ক্ষতির অনেক দিক উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয় দ্রষ্টব্য।

[illegible] — لا ضرر ولا ضرار

[illegible]

[illegible] —

وقد أجاز الفقهاء تقبيل الزوجة فرج زوجها ولو قبَّل الزوج فرج زوجته هذا لا حرج فيه، أما إذا كان القصد منه الإنزال فهذا الذي يمكن أن يكون فيه شيء من الكراهة،ولا أستطيع أن أقول الحرمة لأنه لا يوجد دليل على التحريم القاطع، فهذا ليس موضع قذر مثل الدبر، ولم يجئ فيه نص معين إنما هذا شيء يستقذره الإنسان، إذا كان الإنسان يستمتع عن طريق الفم فهو تصرف غير سوي، إنما لا نستطيع أن نحرمه خصوصاً إذا كان برضا المرأةوتلذذ المرأة (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * الا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) المؤمنون : 5- 7. فهذا هو الأصل

[illegible] —

ويجوز للرجل والمرأة الاستمتاع بكل أنواع التلذذ فيما عدا الإيلاج في الدبر؛ فإنه محرم أما ما ورد في السؤال من المص واللعق والتقبيل وما لم يرد من اللمس والجنس الشفوي عبر الكلام فكله مباح

ইমাম মালিক রহ. সূত্রে এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি বলেন, সহবাসের সময় স্বামী স্ত্রীর লজ্জাস্থান চুষতে পারে। প্রসিদ্ধ মালেকি ফকিহ হাত্তাব রহ. বলেন, স্পর্শের বৈধতার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে এমন বলা হয়েছে। এটা তার বাহ্যিক অর্থে নয়। (অর্থাৎ হাত্তাব রহ. লজ্জাস্থান Suck করাকে বৈধ মনে করেন না।) { মাওয়াহিবুল জালিল— ৩/৪০৬; আলখিরাশি আলা মুখতাসারিল খালিল— ৩/১৬০}

শাফেয়ি ফকিহ ফানানি রহ. বলেন, নিতম্বের বৃত্ত বাদ দিয়ে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে সব উপায়ে ভোগ করা জায়িয, যদিও তার লজ্জাস্থান চুষেও হয়। {ইআনাতুত তালিবিন— ৩/৩৪০} শাফেয়ি মাযহাবের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ফকিহগণ এ বক্তব্যকে বাহ্যিক অর্থে নিয়েছেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আমাদের আকাবিরগণ এই মাসআলার ব্যাপারে অনেক কঠোরতা করেছেন। আহসানুল ফাতাওয়া, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ফাতাওয়া রাহিমিয়া প্রভৃতিতে ওরাল সেক্সকে নাজায়িয বলা হয়েছে, এমনকি এটাকে পশুত্বের নিদর্শন বলেও অভিহিত করা হয়েছে। (উল্লেখ্য, অধুনা জীববিজ্ঞানের সূত্রে অনেক পশুর মধ্যে ওরাল সেক্সের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে। Stacey Grenrock রচিত Do Animals Have Oral Sex বইয়ে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা পাওয়া যাবে।)

ফাতাওয়া হিন্দিয়াতে হানাফি ফকিহগনের দু’ধরনের অভিমতই ব্যক্ত করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, মাকরুহ আর কেউ বলেছেন, মাকরুহ নয়। এছাড়া হানাফি ফিকহের অন্যান্য কিতাবাদিতে এ নিয়ে তেমন একটা আলোচনা চোখে পড়ে না।

ওরাল সেক্সের কদর্যতার আরো কিছু প্রমাণ—

১. লজ্জাস্থান Suck করা হলে স্বাভাবিক হলো, লজ্জাস্থান থেকে নির্গত নাপাক (বীর্য, মযি ইত্যাদি) জিহ্বা, মুখ ইত্যাদিতে লাগবে। আর জরুরত ছাড়া নাপাক স্পর্শ করাকে ফকিহগণ বৈধ মনে করেন না। আর নাপাক চুষে ফেলা বা পান করাকে তো বৈধ বলার প্রশ্নই আসে না।

২. মানুষের শরীরের সবচে সম্মানিত অঙ্গ হলো চেহারা। আর লজ্জাস্থান হলো নাপাকির জায়গা। সুতরাং সম্মানিত জায়গাকে নাপাকির জায়গায় স্পর্শ করানো অবশ্যই নিন্দনীয়।

৩. মুখ দ্বারা আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করা হয়, যিকির করা হয়। এই মুখে নাপাক লাগানো এবং নাপাকির স্থান Suck করা বড় গর্হিত কাজ।

৪. মুখের অনেক জীবাণু লজ্জাস্থানে রোগ সংক্রামণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া লজ্জাস্থানের জীবাণু মুখে এবং মুখের ভায়া হয়ে ভেতরে রোগ সংক্রামণ করার আশংকা থাকে। দুর্ঘটনাবশত ধারালো দাঁতও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সারকথা

মূলনীতির আলোকে দেখা হলে ওরাল সেক্স নাজায়িয প্রমাণিত হয়। ফকিহগণের যারা জায়িয বলেছেন, তাদের বক্তব্য থেকেও সর্বোচ্চ যা অনুমিত হয়, তা হলো, লজ্জাস্থানে চুমু দেয়ার বৈধতা। এই বৈধতার বিষয়টিকেই কেউ অধিক গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে চোষা শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাদের বক্তব্য থেকেও সাধারণত অন্যরা সেই বাহ্যিক অর্থ না নিয়ে শুধু স্পর্শ করা ও চুমু দেয়ার কথাই বুঝেছেন। যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে রোগের জীবাণু সংক্রমণের বিষয়টি প্রমাণিত না হয়, তাহলে যে-সকল ফকিহের থেকে বৈধতার অভিমত বর্ণিত হয়েছে, তাদের বক্তব্যের আলোকে সর্বোচ্চ সহবাসের পূর্বে নাপাক না

[illegible]

[illegible]

ALI HASAN OSAMA·MONDAY, APRIL 10, 2017

[illegible]

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

[illegible]

প্রাণী জানে না , সে আগামীকাল কী অর্জন করবে এবং কোনো প্রাণী এটাও জানে না যে , কোন ভূমিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত , সবকিছু সম্পর্কে পরিপূর্ণ খবর রাখেন। {সুরা লুকমানঃ ৩৪ }

যখন থেকে আবহাওয়াবিদরা ঝড়ের পূর্বাভাস দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করে গর্ভস্থ সন্তানের জেন্ডার কী — তা আগাম বলে দিতে পারে , তখন থেকে উপরিউক্ত আয়াতের প্রতি আধুনিকমনস্ক অনেককে দেখা যায় অভিযোগের তীর্যক বাণ ছুঁড়ে বসেন , ইসলামের দিকে বুড়ো আঙ্গুল তুলে ধরেন। আলকোরআনের সংবাদকে মিথা প্রতিপন্ন করার জন্য এ তো মোক্ষম সুযোগ। এই সুযোগ হাতছাড়া করলে কী আর চলে!

এবার আমরা দেখি , আয়াত আসলে কী বলছে আর তারা কী বুঝে তাকধিনাধিন ধিনধিনতা 'র লয়ে নৃত্য করছে। আলকোরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের তাফসিরস্বরূপ। সুরা আনআমের উনসত্তর নাম্বার আয়াতটি লক্ষ করুন —

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

তাঁরই কাছে গায়বের চাবিকাঠি ; যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। জলে - স্থলে যা কিছু আছে সব তিনি জানেন।

সুরা আনআমের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা . বলেন- চাবিকাঠি হলো পাঁচটি। এরপর তিনি সুরা লুকমানে উল্লিখিত পাঁচটি জিনিস উদ্ধৃত করেন। অর্থাৎ এই বিষয়গুলো এমন , যার ইলম একমাত্র আল্লাহরই কাছে। [দেখুন — তাফসিরে তাবারিঃ ১১ /৪০২]

আচ্ছা , তাহলে কি আল্লাহর বিশেষ জ্ঞান মাত্র এই পাঁচটি মাত্র বিষয়ই ? না , বিষয়টা আসলে তা নয়। উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার

প্রেক্ষাপটের দিকে একবার নজর দিলেই প্রকৃত বিষয়টা ইনশাআল্লাহ দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ওয়ারিস ইবনে আমর নামক এক গেঁয়ো লোক রাসুলুল্লাহ সা. এর কাছে এসে বললো, কেয়ামত কখন আসবে? এরপর জিজ্ঞাসা করলো, আমাদের চাষাবাদের যমিনগুলো অনাবৃষ্টিতে ফেঁটে চৌচির হয়ে গেছে। বৃষ্টি কবে হবে? এরপর তার তৃতীয় প্রশ্ন- বাড়িতে স্ত্রীকে গর্ভবতী অবস্থায় রেখে এসেছি। সে কী সন্তান (ছেলে না মেয়ে) প্রসব করবে? চতুর্থ প্রশ্ন-গতকাল কী করেছি এবং আজ কী করছি তা তো আমার জানা আছে। কিন্তু আগামী দিন আমি কী করবো? এরপর তার সর্বশেষ প্রশ্ন, আমার জন্মস্থান তো আমি চিনি। কিন্তু আমার মৃত্যু কোথায় হবে? ওয়ারিস ইবনে আমর পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলো। তাই তার প্রশ্নের জবাবে আলকোরআনের উপরিউক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। তাতে বলা হয়, এ বিষয়গুলোর জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহর কাছে। অন্য কারো কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা সমীচীন নয়। সুতরাং এই আয়াত থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় না যে, গায়বের ব্যাপ্তি কেবল এই পাঁচটি বিষয়ই। এটা কোনো সূচি বা তালিকা নয়। তার প্রশ্নের উত্তরে বিবৃত একটি মূলনীতি মাত্র। [দেখুন — তাফসিরে ফাতহুল কাদির, শাওকানি- ৪/২৮২]

আল্লাহ তাআলার ইলমের বৈশিষ্ট্য কী? সুরা আনআমের উপরিউক্ত আয়াতটি লক্ষ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার ইলমের অনন্য বৈশিষ্ট্য দুটি —

১. আল্লাহ তাআলা গায়ব সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

২. আল্লাহ তাআলার ইলম পরিপূর্ণ এবং সর্ববিষয়ে পরিব্যাপ্ত।

আয়াতের দুই অংশে দুটো বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।
তাহলে এই আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উপরিউক্ত দুটো

বৈশিষ্ট্য কেবল আল্লাহ তাআলার ইলম এবং জ্ঞানের সঙ্গেই বিশেষত।
কোনো মাখলুকের জ্ঞানের মধ্যে উক্ত বৈশিষ্ট্যদুটি পাওয়া যাবে না।

গায়ব কী? গায়ব হলো এমন বিষয়, যা মানুষের আকল ও পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না। প্রখ্যাত ইসলামিক স্কলার আল্লামা নাসাফি রহ. বলেন, গায়ব হলো এমন বিষয়, যার ওপরে কোনো দলিল প্রতিষ্ঠিত হয় না। [দ্রষ্টব্য — তাফসিরে নাসাফিঃ ২/৬১৭] যেমন জান্নাত জাহান্নাম পরকাল ফেরেশতাÑ এসবই গায়ব। না আকল দ্বারা এ বিষয়গুলোর স্বরূপ উদ্ঘাটন করা সম্ভব আর না পঞ্চইন্দ্রিয়ের দ্বারা। এজন্যই তো মুসলমানরা তাদের মেটাফিজিক্সের ক্ষেত্রে আকলে নয়, নকলে (কোরআন-হাদিসের বর্ণনায়) বিশ্বাসী। বাতিলপন্থীদেরকে বোঝানোর জন্য তারা আকলি যুক্তি উপস্থাপন করে ঠিক, তবে নিজেদের বিশ্বাসের ভিত্তি আকলের ওপর রাখেনি। রেখেছে নকলের ওপর। নকলকে অন্যদের চোখেও শক্তিশালী প্রমাণিত করার জন্য এবং নিজেদের আকিদাগত অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করার জন্য, সর্বপ্রকার সংশয়-সন্দেহ থেকে দূরে থাকার জন্য মূলত আকলি দলিলের ব্যবহার। (এ কথাটাই অনেকের উর্বর মাথায় ধরে না। আকলের সঙ্গে এক গোষ্টীর শত্র“তা আজ থেকে নয়, বরং প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে চলছে সে ধারা। এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীকে মনে করে নির্বোধ ও ভ্রান্ত।)

এবার আমরা মানুষের জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি দেই। এ বিষয়ে তো কেউ দ্বিমত করবে না যে, মানুষের জ্ঞান পরিপূর্ণ নয়, সর্ববিষয়ে পরিব্যাপ্তও নয়। আর জ্ঞানের জন্য মানুষ পঞ্চইন্দ্রিয় এবং আকলের মুখাপেক্ষী। এছাড়া জ্ঞানার্জনের জন্য ভিন্ন কোনো পন্থা বা মাধ্যম তাদের কাছে নেই। ফলে তাদের অর্জিত জ্ঞান অকাট্যও নয়। এজন্যই তো ঝড়ের সংকেত দেয়ার পরও অনেক সময়ই ঝড় হয় না, ভূমিকম্পের পুর্বাভাস দেয়া সত্ত্বেও ভূমি কাঁপে না, পৃথিবীর ধ্বংসের সুনিশ্চিত বার্তা প্রচারের পরও সবকিছু থাকে আগেরই মতো, গর্ভস্থ সন্তানের জেন্ডার একটা নির্ধারণ করে পরিশেষে কখনো জন্মলাভ করে

ভিন্ন জেন্ডারের সন্তান। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার জ্ঞান অকাট্য, পরিপূর্ণ, সর্ববিষয়ে পরিব্যাপ্ত।

গায়বের ইলম একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে। তিনি কাউকে কোনো কিছু জানালেই কেবল সে তা জানে। ভবিষ্যৎ হলো গায়ব। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সা. তো কতো কিছুই বলে গেছেন; কিন্তু কীভাবে? তিনি কি গায়ব জানতেন? না, বরং আল্লাহ তাআলা তাকে জানিয়েছেন বলেই তিনি তা জেনেছেন। আল্লাহ কাউকে ওহির মাধ্যমে জানান, কাউকে ভিন্ন কোনো মাধ্যমেও জানান। যেমন মনে করুন, আমরা তো বিশ্বাস করি, সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা। তাহলে আমরা যে প্রতিদিন নিজেদের হাতে অসংখ্য জিনিস তৈরি করছি, রচনা করছি, সৃষ্টি করছি- এসব আমরা কীভাবে পারছি? আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। এখন এই কোরআন তো আমরাই সিনায় ধারণ করছি। আলকোরআনের শব্দ-অর্থ সবকিছুকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সংরক্ষণ করছি। কোরআনের শব্দ তো দূরের কথা, কেউ তার কোনো অর্থ-পরিভাষা বিকৃতির চেষ্টা করলেও আমরা কঠোরভাবে তার প্রতিরোধ করছি। এমনিভাবে সব জিনিসই। পৃথিবীটা যে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কোনো না কোনো মাধ্যম তো প্রায় সবক্ষেত্রেই কার্যকর। আদতে সব তো আল্লাহ তাআলাই করছেন। কেবল নেযাম-শৃঙ্খলার স্বার্থে প্রায় সবক্ষেত্রে কোনো না কোনো মাধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছে। এখন এই বিষয়গুলো কেউ যদি নিজের বলে দাবি করে! দু- চারটি জিনিস তৈরি করেই কেউ যদি নিজেকে সৃষ্টিকর্তা ভাবতে শুরু করে! তার তো কিছুই না। সে তো কেবল একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সৃষ্টি, রিযিকদান প্রভৃতিÑ এগুলো আল্লাহ তাআলার সিফাত। বাহ্যিক মাধ্যম হিসেবে আল্লাহ তাআলা কিছু ক্ষেত্রে আমাদেরকে ব্যবহার করেন। গায়বের জ্ঞানও একমাত্র আল্লাহর তাআলারই কাছে। (গায়বের ব্যাখ্যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে)। তিনি কাউকে তার কিছুটা জানালে তখনই কেবল সে তা জানে। আদতে সেটা তার অর্জন নয়; আল্লাহর তাআলারই দান। এখানে মাখলুকের সবিশেষ কোনো ক্রেডিট নেই। নবিগণ যে গায়বের বিভিন্ন বিষয় জানিয়ে গেছেন তা এরই পর্যায়ভুক্ত।

মানুষ যেমন গায়ব জানে না, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউও তা জানে না; এমনকি ফেরেশতারাও নয়। আপনি যে মেয়েকে বিয়ে করবেন, তার কি আদৌ কোনো সন্তান হবে কিনা, হলে ছেলে হবে না মেয়ে Ñ এসব বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারো কাছে নেই; জিন-ফেরেশতাদের কাছেও নয়। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ যখন ফেরেশতাদেরকে তা জানান, তখন তারা তা জানে। বৃষ্টি বর্ষণ হওয়ার আগে তিনি যখন মেঘের ফেরেশতাকে নির্দেশনা দেন, তখনই সে কেবল তা জানতে পায়। সহিহ বুখারির নিুবর্ণিত হাদিসটি লক্ষ করুন—

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সা. বলেন, আল্লাহ তাআলা জরায়ুর দায়িত্বে একজন ফেরেশতাকে নিয়োজিত করেছেন। ফেরেশতা বলে, হে প্রভু, বীর্য! হে প্রভু, রক্তপিণ্ড! হে প্রভু, গোশতপিণ্ড! অনন্তর আল্লাহ যখন সন্তান সৃষ্টির ফায়সালা করার ইচ্ছে করেন, তখন বলে দেন, ছেলে হবে না মেয়ে, সৌভাগ্যবান হবে না দুর্ভাগা, রিযিক কী হবে, মৃত্যু কখন কোথায় হবে। সন্তান মায়ের পেটে থাকা অবস্থায়ই এ বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করে ফেলা হয়।

আচ্ছা, পবিত্র কোরআনের আলোচ্য আয়াত তো বলছে, গর্ভে কী আছে তা শুধু আল্লাহ তাআলা জানেন। এখন এই হাদিস থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে, গর্ভে থাকা অবস্থায়ই দায়িত্বরত ফেরেশতাও তা জেনে যায়। এ কি তবে আলকোরআনের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক ও বিরোধপূর্ণ হয়ে গেলো?! সুস্থমস্তিষ্কের কেউই নিশ্চয়ই এমন মন্তব্য করবেন না। কেননা এই জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ তাআলার কাছেই ছিলো। তিনি জানিয়েছেন। ফেরেশতা তার জ্ঞানার্জনের মাধ্যম দ্বারা আল্লাহ তাআলার ফায়সালা জেনেছে। এটা তার নিজস্ব অর্জিত জ্ঞান নয়; আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন বলেই জেনেছে। আচ্ছা, আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এবং তাফসিরে রুহুল

هَذِهِ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ الَّتِي اسْتَأْثَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِعِلْمِهَا، فَلَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ إِلَّا بَعْدَ إِعْلَامِهِ تَعَالَى بِهَا؛...وَكَذَلِكَ إِنْزَالُ الْغَيْثِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَكِنْ إِذَا أَمَرَ بِهِ عَلِمَتْهُ الْمَلَائِكَةُ الْمُوَكَّلُونَ بِذَلِكَ ومَنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ خَلْقِهِ. وَكَذَلِكَ لَا يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مِمَّا يُرِيدُ أَنْ يَخْلُقَهُ اللَّهُ تَعَالَى سِوَاهُ، وَلَكِنْ إِذَا أَمَرَ بِكَوْنِهِ ذِكْرًا أَوْ أُنْثَى، أَوْ شَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا عَلِمَ الْمَلَائِكَةُ الْمُوَكَّلُونَ بِذَلِكَ، ومَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ.

এরপরও কি আয়াতের ব্যাপারে কোনো সংশয় থাকে ? ডাক্তার এবং আবহাওয়াবিদরা যদি জ্ঞানার্জনের কোনো মাধ্যম তথা আকল ও পঞ্চইন্দ্রিয় ব্যবহার করা ছাড়াই এসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে পারতো, তখনই কেবল তা আলকোরআনের বক্তব্যের সাথে বিরোধপূর্ণ হতো। আল্লাহ তাআলা তাকে জানাচ্ছেন , সে তো তার ইন্দ্রিয়শক্তি ব্যবহার করছে মাত্র। ফেরেশতাকেও যেমন জানিয়েছেন , ফেরেশতা নিজ জ্ঞানার্জনের মাধ্যম দ্বারা আল্লাহ তাআলার থেকে তা জেনেছে , তেমনি মানুষও। কোরআনের সাথে এর বিরোধ ও সংঘর্ষটা কোথায় ? মাথাটা একটুও না খাটিয়ে লম্ফঝম্প শুরু করলে তো এমন হবেই। পরিশেষে নিজেকেই লজ্জা পেতে হবে। থাক , এতো লজ্জার কিছু নেই। আঁচল দিয়ে মুখ না ঢেকে ভবিষ্যতে এমন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় না দেয়াটা বরং কল্যাণকর হবে।

স্মতর্ব্য যে , পবিত্র কোরআনে এ স্থলে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে , তা হলো- مَا فِي الْأَرْحَامِ । আরবি ভাষার জ্ঞান যাদের আছে , তাদের জানা থাকার কথা যে , "مَا(মা)" শব্দটি আ 'ম (ব্যাপক)। (আ'মকে তার উমুমের ওপর বাকি রাখা এবং মুতলাককে ইতলাকের ওপর ছেড়ে দেয়া অর্থাৎ ব্যাপক শব্দকে তার ব্যাপকতারব্দোপর এবং শর্তমুক্ত শব্দকে তার নিঃশর্ততার ওপর বাকি রাখাটাই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম।) সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়াচ্ছে গর্ভস্থ সন্তানের সকল বিষয় আল্লাহ তাআলা জানেন। শুধু সন্তানের জেন্ডারই নয় , বরং তার জন্ম -মৃত্যু , তার ভালো-মন্দ , তার আবাস-কর্ম - অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তানের জীবনে যা কিছু ঘটবে সবই আল্লাহ তাআলা জানেন। পাঠক , আপনিই বলুন, এই সব বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কার আছে? আর কার পক্ষেই বা এই ডিটেইলসে -বিশদের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব ? আল্লাহ আপন অনুগ্রহে দুয়েকটা বিষয় যা জানান , এর বাইরে মানুষ আর কীইবা জানে ? মানুষের জানার মাধ্যমগুলোও তো আল্লাহরই দেয়া। এতোকিছুর পরও এই মানুষই চরম ঔদ্ধত্যে মেতে ওঠে , সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে। হায়রে মানুষ ! হায়রে অকৃতজ্ঞ বান্দা !

নমাজঃ প্রখ্যাত মুসলিম সাহিত্যিক এয়াকুব আলী চৌধুরীর কালজয়ী রচনা

ALI HASAN OSAMA·TUESDAY, APRIL 11, 2017

আমার প্রাণের কোণে এ শূণ্যতা কেন? মর্মতলে তপ্ত ব্যথা লুক্কায়িত কেন? আমার হৃদয়ের সকল আনন্দ স্তব্ধ করিয়া রহিয়া রহিয়া এ হাহাকার কেন? আমি জানি না, আমি বুঝি না, এ কী? —কিসের ব্যথা? কেন এ ব্যর্থতা বোধ? কর্মের মধ্যে ডুবিয়া থাকি, হাসির মধ্যে মজিয়া যাই, কিন্তু শূন্যতা তো দূর হয় না, হৃদয়ের কোন এক নিভৃত কোণ শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে, কিছুতেই তাহা পূর্ণ হয় না। কে আমাকে থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া যায়। সুখের সৌধ ভেদিয়া কাহার স্বর শুনা যায়। কাহার মহাধ্বনি সকল ধ্বনি স্তব্ধ করিয়া প্রাণের মধ্যে বাজিয়া উঠে। আমার মন-প্রাণ উদাস আকুল চঞ্চল হইয়া পড়ে।

প্রভাতের মৃদু মলয়ে কে আমার মর্মতলে স্নেহ-স্পর্শ বুলাইয়া দেয়? ঊষার সুরভি-শ্বাসে জীবনের আহ্বান আনে? আকাশ বাতাস নিত্য নবীন জীবন গানে পূর্ণ করিয়া জীবনধারা নবীন বেগে বহাইয়া দেয়? আমি অবাক হইয়া ভাবি, আমি ব্যাকুল হইয়া দেখি, —আঁধারে এ আলোর মেলা, মরণ জীবনে খেলা! আমি মহিমা দেখিয়া চাহিয়া রই। আমার নয়ন ভরিয়া সলিল আসে, হৃদয় আমার নিবেদনের বেগে কম্পিত হয়।

সায়াহ্নে কার শান্ত শোভায় হৃদয় মন ভরিয়া যায়? কে শ্রমের মাঝে শান্তি আনে? ভীষণতায় মধু বহায়? কে আমাকে হিল্লোলে ডাকিয়া যায়? বৃক্ষের পত্রে পত্রে, সোনার ধানে দুলিয়া দুলিয়া খেলিয়া যায়? আমি ছুটিয়া যাই, আবেগে বাহু বাড়াইয়া আমার সমস্ত প্রাণ উদাস আকুল চঞ্চল হইয়া উঠে। থামাও, তোমার কলগান থামাইয়া দাও। তোমার আনন্দ মেলা মিটাইয়া দাও, সন্ধ্যার মৌন অন্ধকারে বিশ্বের বিরাট ব্যথা আমার মনের সঙ্গে মিলাইয়া লই। দিনান্তের ম্লান আভায়, এ ধায়া ও মলিনতায়,

এই মৌন স্বচ্ছ অন্ধকার বিশ্বে বিষণ্ন মুখে কিসের ব্যথা মূর্ত হইয়া প্রকাশ পায়! আমার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হইয়া পড়ে, হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠে, মনে হয় কিছুই বলা হয় নাই, কিছুই বলা হয় নাই। মিথ্যা — আমার দিনের আলো মিথ্যা, আমার কর্মকোলাহল মিথ্যা, আমার উল্লাস আবেগ মিথ্যা। কোথায় আমার পরমাত্মীয় পড়িয়া আছে, জীবনের সর্বস্ব কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহারই সন্ধান চাই, তাহারই মিলন চাই, নহিলে সবই ব্যথা ও ব্যর্থতাময়, আমার সবই শূন্য ও অন্ধকার।

আমি মৌনতার মাঝে মজিতে চাই, আমি অন্ধকারে ডুবিতে চাই, অসীমে আমি মিশিতে চাই, গভীর নিশার অন্ধকারে অসীমের কী প্রকাশ দেখি! বিরাটের কী মহা আভাস বিশ্ব ভরিয়া ভাসিয়া আসে! অন্ধকারে দিগন্ত নাই, বিশ্বব্যোমের বিভেদ নাই, আকাশের অন্ত নাই, শূন্যের সীমা নাই। অসীমের সহিত সীমার সমাহারে এই শূন্যতাময় স্তব্ধ গভীর মহাকালে এমন মৌন মুগ্ধ রুদ্ধ হইয়া বিশ্ব কাহার ধারণা করে? ধ্বনির পর ধ্বনি রুদ্ধ করিয়া বিশ্বময় কাহার চরণোপান্তে উত্থিত হয়? আমি ধ্যানের মধ্যে ডুবিয়া যাইব, আমি ধ্বনির সঙ্গে মিশিয়া যাইব, আমি অনন্তে উত্থিত হইব।

আমার অনন্তের সহিত আত্মীয়তা আছে, মধ্যদিনের রুদ্রালোকে এই কথাই আমি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই। সংসার রূপ-রসের পসরা মেলিয়া প্রকাশ পায়; শব্দ ছন্দের বিচিত্র মন্ত্র পড়িয়া মায়ালোক রচনা করে; এই চঞ্চল জনস্রোত, অপার কর্মস্রোত, কর্মের কোলাহল, শব্দের কলকল, অবিরাম ঝনঝন, দ্বন্দ্ব ও উপার্জন, ইহারই মধ্যে মন উদাস ও বিষণ্ন হইয়া উঠে, বিশ্ব ব্যাপিয়া ক্লান্তি ও শূন্যতা আশ্চর্যরূপে প্রকাশ পায়, আমি মানুষের নয়নে বদনে শ্রান্তির মিলন ছায়া দেখি, রৌদ্র-ঝলসিত আকাশতলে শ্মশানের তপ্ত নিঃশ্বাস দেখি, আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠে, বিপুল ব্যথায় হৃদয় আমার বিচলিত হয়। শূন্য— এ অসীম শূন্য, সমস্তই মায়া ও ছায়া। মিথ্যা— এ আয়োজন, মিথ্যার প্রলোভন। ছায়ার মায়ায় পড়িয়া আছি। একা— আমি নিতান্ত একা, আমার চতুষ্পার্শ্বে

সিন্ধু সলিল অনন্তে উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তাহার মাঝে বিন্দুর মত আমি পড়িয়া আছি। অনন্তে আমার যাত্রা-ভুলিয়া কোথায় বসিয়া আছি। শব্দহীন কোন সীমাহীন অমৃতলোকে আমার ঘর-বিঘোরে কোথায় ভুলিয়া আছি।

দাও, দাও, শব্দ-ছন্দ স্তব্ধ করিয়া দাও, সীমার রেখা অন্ধকারে মিশাইয়া দাও, আমি নমাজ পড়িয়া অনন্তের সন্ধান লই, রূপের অতীতে ধ্বনির অতীতে সীমাহীন গভীর শান্তিলোকে উত্তীর্ণ হই, প্রাণের অনন্ত তৃষ্ণা মিটাইয়া লই।

[‘শান্তিধারা’ প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত]

লেখকঃ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০)

দর্শনের ক খ - ১

ALI HASAN OSAMA·MONDAY, APRIL 24, 2017

দর্শন কী?

অনেকেই ভাবেন, দর্শন হলো এমন কঠিন কোনো বিষয়, যার বোধ-উপলব্ধি বিশেষ কিছু আকল ছাড়া সাধারণ কারো মাথায় ধরে না। এর জন্য বড় বড় আকলের প্রয়োজন; তদুপরি এই দর্শনের আবার কোনো ফলাফল নেই। পুরোটাই অযথা ও গর্হিত। বিশেষত আলিমদের তো উচিত, এর থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলা। অনেকে মন্তব্যও করেন, দার্শনিকরা তাদের মেধাকে অন্য কোনো কাজে ব্যয় করলে তা হয়তো কোনো ভালো ফলাফল বয়ে আনতো।

দর্শন (philosophy) জ্ঞানের অন্যতম প্রাচীন একটি শাখা। ফিলোসফি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন গ্রিক চিন্তাবিদ ও গণিতজ্ঞ পিথাগোরাস। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ অব্দের দিকে শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। পিথাগোরাস নিজেকে প্রাজ্ঞ ভাবতেন না, বরং প্রজ্ঞার অনুরাগী ভাবতেন। তিনিই ফিলোসফি শব্দটি ব্যবহার করেন love of wisdom তথা

প্রজ্ঞার প্রতি অনুরাগ অর্থে। দর্শনের সংজ্ঞা হিসেবে এই বিষয়টিকেই গ্রহণ করা যায়। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে দর্শন জ্ঞানের এমন একটি ধারা, যা মানুষের কীভাবে জীবন নির্বাহ করা উচিত (Ethics-নীতিবিদ্যা); কোন ধরনের বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে এবং তাদের প্রকৃতি কী (Metaphysics-অধিবিদ্যা); প্রকৃত জ্ঞান বলতে কোন জিনিসটিকে বোঝায় এবং কারণ প্রদর্শনের সঠিক নীতিগুলো কি কী (Logic-যুক্তিবিদ্যা); এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে।

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, দর্শনের সাথে মূল সম্পর্ক হচ্ছে প্রজ্ঞার, আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, প্রজ্ঞার প্রতি ভালোবাসার। জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা এক জিনিস নয়। ঘটনা ও তথ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ও নির্ভুল ধারণা থেকে জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু দার্শনিক কেবল তথ্যগত জ্ঞানের উপর নির্ভর করেন না।

(যিনি দর্শন চর্চা করেন তাকেই দার্শনিক বলা হয়, যদিও শাব্দিক অর্থের বিচারে যে-কেউ তার আকলকে কোনো বস্তুর স্বরূপ, মৌলিকতা ও অপরাপর বস্তুর সাথে তার সম্পর্কে কী তা উদঘাটন করার কাজে লাগায়, তাকেই দার্শনিক বলা যায়। শাব্দিক অর্থের বিচারে মধ্যম আকলের অধিকারী প্রায় সব মানুষই দার্শনিক বলে পরিগণিত হবে। শাব্দিক অর্থকে অবলম্বন করে এই নির্বুদ্ধিতায় অবশ্য কেউ আক্রান্ত হবে না, যদিও শরিয়তের পরিভাষা "জিহাদে"র ক্ষেত্রে এই কাজটা করতে সে কী প্রতিযোগিতারে বাবা! আলিম আর জালিম কেউই এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। কঠিন পারফোম্যান্স! কার থেকে কে এগোতে পারে- চলছে এর প্রতিযোগ। এগিয়ে যাওয়ার ধারা হোয়াইট হাউজ-জাতিসংঘ ভেদ করেও এগিয়ে যাচ্ছে। ঠিক নজরুলের ওই পঙ্কতির মতো- "দ্যুলোক ভুলোক গোলক ভেদিয়া, খোদার আসন আরশ ছেদিয়া"। সে ছেদ করতে চেয়েছে খোদার আসন, আর এরা ভেদ করে ডেমোক্র্যাসি এবং ক্যাপিটালিজমের গডদের বাসভবন।)

দর্শনের প্রধান কাম্য বিষয় প্রজ্ঞা। তিনি ছবির ভেতরের ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। প্রজ্ঞার অনুসন্ধান ও চর্চার মাধ্যমেই দর্শন বিকাশ লাভ করে। পিথাগোরাস সারা জীবন প্রজ্ঞার সাধনা করেছেন, কখনও জ্ঞানের গরিমা অনুভব করেননি। এজন্য তিনি দার্শনিক হিসেবে বিদগ্ধ। দর্শনের জন্য যে প্রজ্ঞা কাম্য তার মধ্যে রয়েছে- অন্তর্দৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির অভ্রান্ততা, বিচারের ভারসাম্য ও বিশ্লেষণের সামঞ্জস্য।

এরিস্টটলের বক্তব্য অনুযায়ী কৌতূহল ও অস্থিরতা থেকেই দর্শনের উৎপত্তি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে তিনটি প্রশ্ন মানুষকে তাড়া করে ফিরেছে- কেনো? কোত্থেকে? এবং কোথায়? এর উত্তর সন্ধানেই খুলেছে দর্শনের দুয়ার। ধীরে ধীরে কৌতূহলও বেড়েছে আর একে একে উন্মোচিত হয়েছে জ্ঞানের অসংখ্য পথ।

দর্শনের মৌলিক বিষয়

পৃথিবীর যেকোনো মতাদর্শ পাঁচটি জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে দর্শনের ভিন্নতার কারণে মতাদর্শও বিভিন্ন হয়। ফিলোসোফি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এই মৌলিক পাঁচটি বিষয় নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করতে হয়। এই পাঁচটি মৌলিক বিষয় না বুঝলে কোনো মতাদর্শের আগপাছ বোঝা সম্ভবপর হয় না।

বিষয় পাঁচটি হলো-

১. Metaphysics (মেটাফিজিক্স- অধিবিদ্যা, সত্তার প্রকৃতি ও জ্ঞান সংক্রান্ত দর্শন), ইলমি পরিভাষায় যাকে আমরা "মা বা'দাত তবিয়াত/তবইয়্যাত" নামে চিনি।

২. Epistemology (এপিস্টেমোলোজি- জ্ঞানতত্ত্ব, প্রকৃতি ও পরিধি সংশ্লিষ্ট দর্শনেরশাখা), ইলমি পরিভাষায় যাকে আমরা "ইলমিয়্যাত" নামে চিনি।
৩. Ethics (এথিকস- নীতিবিদ্যা, নৈতিক নীতিমালার পদ্ধতি, জীবন-বিধান), ইলমি পরিভাষায় যাকে আমরা "আখলাকিয়্যাত" নামে চিনি।
৪. Axiology (একজিওলোজি- the study of the nature of value and valuation, and of the kinds of things that are valuable.) ইলমি পরিভাষায় যাকে আমরা "আকদারিয়্যাত" বা "ইলমুল আকদার" নামে চিনি।
৫. Aesthetics (এসথেটিক- নন্দনতত্ত্ব, কান্তবিদ্যা, সৌন্দর্যতত্ত্ব), ইলমি পরিভাষায় যাকে আমরা "জামালিয়্যাত" নামে চিনি।

এই হলো দর্শনের সেই পাঁচটি মৌলিক বিষয়, যার ভিন্নতার কারণে মতাদর্শও বিভিন্ন হয়। দর্শনের ভিন্নতার কারণে কর্মেও ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। এই বিষয়গুলোতেদর্শনের ভিন্নতা থাকলে কাজে-কর্মে বাহ্যত মিল দেখা গেলেও আদতে থাকে প্রচুর ভিন্নতা। যেমন একজন মুসলমান জিহাদ করলে তার মেটাফিজিক্সে থাকে স্রষ্টার স্বীকৃতি, থাকে পরকাল-কেয়ামতের বিশ্বাস, থাকে স্রষ্টার নির্দেশিত বিধানাবলী পালনের চেতনা ইত্যাদি। কিন্তু একই ধরনের কাজ যদি কোনো অমুসলিম করে তবে তার মেটাফিজিক্সে থাকবে ভিন্ন কিছু; যদিও বাহ্যত উভয়টির মাঝে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মেটাফিজিক্স কী? (মা বা'দাত তবিয়াত)

এমন সব বস্তু নিয়ে আলোচনা করা, যার অস্তিত্ব পঞ্চ ইন্দিয় দ্বারা অনুভব করা যায় না। যেমন- রুহ কী? সৃষ্টির স্থায়িত্ব কী? স্রষ্টা

কে? আখিরাত কী? হাকিকতে আ'লা কে? হাকিকতের পারস্পরিক তারতিব কী? হাকিকতের মাকছাদ কী? ইত্যাদি। এসব বিষয়ের আলোচনাকেই মেটাফিজিক্স বা মা বা'দাত তবিয়াতের আলোচনা বলা হয়। ফালসাফার এ এক মৌলিক পরিভাষা (Term)।

((আরেক ভাষায়- الميتافيزيقيا او ما بعد الطبيعة شُعبة من الفلسفة تبحث في ماهيّة الأشياء وعلّة العلل أي القوة المحرِّكة لهذا العالم. فقد تبدَّى للإنسان منذ القِدم أن الكون بمخلوقاته المتعددة وعناصره المادية لم يُوجد بذاته، وأن وراءه قوة مطلقة هي التي أوجدته وهي التي تسيِّره. ومع الأيام أخذ الإنسان يفكِّر في هذه القوة العُلوية تفكيراً فلسفياً، وعن هذا التفكير الفلسفي نشأت الميتافيزيقيا.))

মেটাফিজিক্সের মৌলিক শাখা তিনটি -

১. Cosmology (তারতিবে হাকিকত, বিশ্বতত্ত্ব)
২. Ontology (হাকিকত ফি নাফসিহি, অস্তিত্বের স্বরূপ বিষয়ক সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব)
৩. Teleology (মাকছাদে হাকিকত)

প্রতিটা মানুষই হাকিকতের (স্বরূপ, বাস্তবতা) কোনো না কোনো তারতিব দেয়। এমন হয় না যে, সে সব হাকিকতকে একই শ্রেণীভুক্ত গণ্য করে। অবচেতনে হলেও তার মস্তিষ্কে হাকিকতের এক ধরনের তারতিব বদ্ধমূল থাকে। যেমন মুসলমানের কাছে হাকিকতের তারতিব এমন - প্রথমে আল্লাহ তাআলার সত্তা, এরপর নবিজি সা., এরপর অন্যান্য নবিগণ - এভাবে। কাল মার্কসের দৃষ্টিতে যেমন সব হাকিকতই হলো পদার্থ -মাদ্দাহ। হাকিকতে আ'লাও মাদ্দাহ, হাকিকতে আদনাও মাদ্দাহ। তবে পার্থক্য এই যে, যে মাদ্দাহ ক্রিয়াশীল (যেমন এক মানুষ থেকে সৃষ্টি হয় আরেক মানুষের) তার মর্যাদা বেশি। তো এই হাকিকতের তারতিবকেই পরিভাষায় Cosmology বলা হয়।

কোনো বিধর্মী কমিউনিস্ট যখন ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন সে মুলত তার মস্তিষ্কে প্রোথিত তারতিবকে পরিবর্তন করে নতুন তারতিব দিতে অস্বীকৃতি জানায়। হাকিকতে আ'লা হলেন আল্লাহ। এবার তার স্থলে অন্য কাউকে হাকিকতে আ'লা আখ্যা দেয়াটাই শিরক, যার গুনাহ তওবা ছাড়া আল্লাহ কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

হাকিকতের তারতিবে ভিন্নতার কারণে মানুষের চিন্তা-চেতনা দর্শন-নীতি সব বিভিন্ন হয়। যেমন মুসলমানদের কাছে হাকিকতে আ'লা হলেন আল্লাহ, তাই তারা তাদের সব কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দিবে। কিন্তু পাশ্চাত্যপন্থীদের কাছে হাকিকতে আ"লা হলো ইনসানিয়্যাত তথা মনুষ্যত্ব। এজন্য তারা স্রষ্টার নির্দেশনা থেকে বিমুখ হয়ে মানুষের জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আলোকেই গ্রহণ করবে সব সিদ্ধান্ত। ইসলামি ভাবধারা এবং অনৈসলামিক চিন্তা-চেতনার মাঝে মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করে এই কসমোলোজি।

কোনো জিনিসকে কসমোলোজিক্যাল অর্ডার দেয়ার জন্য জরুরি হলো, প্রথমে আপনাকে এ কথার সাক্ষ্য দিতে হবে যে, আপনি সুনিশ্চিতভাবে জানেন, আপনি যে বিষয়গুলোর মাঝে তারতিব দিচ্ছেন সেগুলোর হাকিকত কী। একটা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বিষয়টা স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি।

আপনি আগুন, পানি, মাটি এবং বাতাস এই চারটি জিনিসের মাঝে তারতিব দিতে চান। অর্থাৎ একটাকে আরেকটার তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করতে চান। এখন আপনাকে প্রথমে এই চারওটি বস্তুর হাকিকত সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে জানতে হবে। আর তা জানার পরেই আপনি এগুলোর মাঝে কোনো তারতিব দিতে পারবেন। বস্তুর হাকিকত সম্পর্কে জানাকে Ontology বলে। কোনো বস্তুর হাকিকত কী তা সুনিশ্চিতভাবে কোনো মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে হাঁ, এটা সম্ভব যে, এক Order অপর Order থেকে আ'লা Superior হবে। যেমন ধরুন, এরিস্টটল উল্লিখিত চারটি বস্তুর মাঝে এভাবে তারতিব দেন-

● ১. আগুন
● ২. বাতাস
● ৩. পানি
● ৪.মাটি

এরিস্টটলের বাস্তবতার ধারণার ভিত্তিমূল ছিলো এই যে, আমাদের এই পৃথিবী চারটি উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত। যদি এদেরকে স্থিতি অবস্থায় থাকার সুযোগ করে দেওয়া হয় তবে এরা চারটি স্তরে নিজেদেরকে বিন্যাস করে নেয়। তিনি যুক্তি দেন যে, পানি বাতাসের মধ্য দিয়ে পতিত হয় (বা বাতাস পানির মধ্য দিয়ে বুদবুদের মাধ্যমে উপরে ভেসে উঠে), মাটি পানি এবং বাতাস দুটোর মধ্য দিয়েই পতিত হয় এবং আগুন সবচেয়ে উঁচু স্তরে অবস্থিত কেননা তা বাতাস ভেদ করে উপরের দিকে উঠে যায়। এই যুক্তি অনুযায়ী, বৃষ্টি নিচের দিকে পড়ে কারণ এটা তার সঠিক অবস্থান বাতাসের নিচে পৌঁছতে চেষ্টা করে। আগুনের শিখা ঊর্ধ্বমুখী হয় তার অন্য তিন উপাদানের উপরে অবস্থানের কারণেই।

এরিস্টটল এভাবে এনালাইসিস করে তার মাঝে তারতিব দিয়েছেন। প্রায় ১৫০০ বছর এভাবেই তা সারা পৃথিবীতে প্রচলিত ছিলো। পরবর্তীতে এর অসারতা প্রমাণিত হয়। হাকিকতের ইলমই যখন নেই, তার মাঝে তারতিব কীভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে!

যে সূত্র থেকে হাকিকতে জ্ঞান অর্জন করা হবে, তারতিবও সেই সূত্রের আলোকেই দিতে হবে। অন্যথায় শেষাবধি নসিবে বিভ্রান্তিই জুটবে। এজন্য আপনি যদি সাইন্স থেকে বস্তুর হাকিকত গ্রহণ করেন, তবে তারতিবও তার আলোকেই দিতে হবে। যদি এরিস্টটল-প্লেটোর দর্শন থেকে নেন, তবে তারতিবও তারই আলোকে। অন্যথায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন এবং আপত্তির পর আপত্তি উত্থাপিত হতেই থাকবে। চূড়ান্ত সমাধানে কিছুতেই পৌঁছতে পারবেন না।

এজন্য কোরআন থেকে বস্তুর হাকিকত গ্রহণ করলে তারতিবও কোরআনের নির্দেশনার আলোকেই দিতে হবে। কোরআন থেকে হাকিকত নিয়ে সাইন্সের আলোকে তারতিব দিলে কিবা সাইন্স থেকে হাকিকত নিয়ে কোরআনের আলোকে তারতিব দিলে বিভ্রান্ত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। একই সূত্র থেকে Cosmology এবং Ontology দুটোই হলে দেখবেন অন্তর কীভাবে প্রশান্ত হয়। কোনো প্রকার বিভ্রান্তিও আর থাকবে না।

অনটোলজির আলোচনা

হাকিকত এনালাইসিস করার পর মূল হাকিকত অনুধাবন করার নাম Ontology (অনটোলজি- অস্তিত্বের স্বরূপবিষয়ক সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব)। এই Ontology র আলোচ্য বিষয় হলো- মানুষের বাস্তবতা কী, রুহের স্বরূপ কী, স্থায়িত্ব কী, স্রষ্টা কী ইত্যাদি। Ontology র জ্ঞান যে আপনার থেকে বেশি রাখে, সে এটাক করে দুই মিনিটের মধ্যে আপনার কসমোলজি (হাকিকতের তারতিব ও বিন্যাস) বদলে দিতে পারবে। অনটোলজি এবং কসমোলজি দুটো বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অনটোলজি যেমন হবে, তার আলোকেই কসমোলজি হবে। এজন্যই আমরা আগের লেখায় বলে এসেছি, অনটোলজি যে সূত্র থেকে আসবে, কসমোলজির জ্ঞানও সেই একই সূত্র থেকে আহরণ করতে হবে। আগের লেখায় উদাহরণ সহ বিষয়টা আলোচনা করা হয়েছে। কসমোলজির জন্য অনটোলজি অপরিহার্য। কেননা যার সামান্য আকল আছে, তারও এ কথা বুঝতে বেগ পেতে হবে না- নফসে হাকিকতের ইলমই যদি অর্জিত না হয়, তবে হাকিকতকে তারতিব দেয়া, তার মাঝে পারস্পরিক বিন্যাস রচনা করা কীভাবে সম্ভব! নফসে হাকিকতের ইলম আপনার থেকে কারো বেশি থাকলে আপনার দেয়া তারতিবকে সে দুই মিনিটেই ভুল প্রমাণিত করে নয়া তারতিব মানতে আপনাকে বাধ্য করতে পারবে।

টেলিয়োলজির আলোচনা

মেটাফিজিক্সের তৃতীয় শাখা হলো (Teleology) টেলিয়োলজি (পরমকারণাবাদ- পৃথিবীর সবকিছু একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে, বিশেষ পরিকল্পনামাফিক সৃষ্টি হয়েছে এমন বিশ্বাস বা মতবাদ)। টেলিয়োলজিতে হাকিকতের মাকছাদ বা Final Cause সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এরিস্টটল মনে করতেন, চারটি ইল্লত (Cause) পাওয়া গেলেই কেবল কোনো হাকিকত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। চারটির কোনো একটি যদি না পাওয়া যায়, তবে কোনো হাকিকত অস্তিত্বলাভ করতে পারে না। ইল্লত চারটি (Four Causes) হলো-

১. ইল্লতে সুরিয়্যাহ (formal cause)- কেউ কোনো বস্তু নির্মাণ বা তৈরি করতে চাইলে প্রথমে মস্তিষ্কে তার একটা চিত্র অঙ্কিত হবে। হাকিকতের এই তাছাওউরের (চিত্রায়নের) নামই ইল্লতে সুরিয়্যাহ।
২. ইল্লতে গাইয়্যাহ (final cause)- কোনো জিনিস তৈরি করতে চাইলে আবশ্যিকভাবেই তার কোনো লক্ষ্য থাকবে। লক্ষ্যহীন হবে না। এটাকেই Final Cause বা মাকছাদে হাকিকত বলে। এই Final Cause নিয়ে আলোচনা করাকেই পরিভাষায় (Teleology) টেলিয়োলজি বা পরমকারণাবাদ বলা হয়।
৩. ইল্লতে ফায়িলিয়্যাহ (efficient or moving cause)- বস্তুটি অস্তিত্বলাভ করার জন্য অবশ্যই কোনো নির্মাতা বা কর্তা লাগবে।
৪. ইল্লতে মাদ্দিয়্যাহ (material cause)- বস্তুর হাকিকত অস্তিত্বলাভ করার জন্য যেসকল মেটারিয়াল বা উপাদানের প্রয়োজন তাও অপরিহার্যভাবে থাকতে হবে।

এই চারওটি বস্তু যদি থাকে- Matter Form Agent এবং End / Purpose, তখনই কেবল কোনো হাকিকত অস্তিত্ব লাভ করতে পারে; অন্যথায় নয়। একটা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। যেমন

ধরুন একটা মোবাইল বাস্তবজগতে আপনার হাতে আছে। এবার আপনি এই মোবাইলটার দিকেই লক্ষ করুন। দেখবেন ওপরের চারওটি জিনিস এর মাঝে বিদ্যমান।
মোবাইলটার ডিজাইন এমন কেনো? কারণ শুরুতে এর যে (Form) নকশা এবং চিত্রায়ণ করা হয়েছে, তা এমন ছিলো।
মোবাইলে এতো এতো পরিষেবা কেনো? কারণ এটাকে স্মার্ট ডিভাইস হিসেবে এই ধরনের ক্রেতাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে? এর তৈরির পেছনে লক্ষ্যই (End / Purpose; Final Cause) ছিলো নির্দিষ্ট ক্রেতাদের প্রয়োজন পূরণ করা।
মোবাইলটা মূল উপাদান থেকে এই আকৃতি কীভাবে ধারণ করলো এবং কেনো করলো? কারণ এক বা একাধিক নির্মাতা (Agent) তাদের কৃত নকশা অনুযায়ী জিনিসটাকে এভাবে নির্মাণ করেছে।
মোবাইলটা কালো/সাদা কেনো? কারণ এটাকে যে (Matter) উপাদান থেকে তৈরি করা হয়েছে, তার রং এমন।

মেটাফিজিক্সে (মা বা'দাত তবিয়াত বা অধিবিদ্যায়) উপরিউক্ত তিনটি বিষয় নিয়েই মৌলিকভাবে আলোচনা করা হয়।

ইসলামের ওপর পাশ্চাত্যপন্থীদের অভিযোগ ও আমাদের নির্বুদ্ধিতাঃ একটি সরল মূল্যায়ন

ইসলামের ওপর প্রাচ্যবিদ ও পাশ্চাত্যপন্থীদের অভিযোগের
তো অন্ত নেই। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি লক্ষ করুন।

১. ইসলামের দণ্ডবিধি বড় ভয়ানক। মধ্যযুগের বর্বরতা। মানবতার অবমূল্যায়ন। মানবাধিকার লঙ্ঘন।

২. ইসলামের পর্দার বিধান সম্পূর্ণ অমানবিক বিধান। নারীর অধিকার খর্ব করা। ইসলাম নারীকে করেছে অবরোধবাসিনী। বেগম রোকেয়ার মতো মহান নারী মুক্তির অগ্রদূতরা না থাকলে ইসলাম নারীদেরকে বাকহীন প্রাণীর মতোই করে রাখতো।

৩. প্রত্যেকের রয়েছে স্ব ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা (যদিও তারাই আবার মুসলমান নামক ''প্রাণীদেরকে'' সেই অধিকারটুকুও দিতে চায় না)। ধর্ম সবার ব্যক্তিগত বিষয়। যার যে ধর্ম ভালো লাগে, সে সেই ধর্ম পালন করবে। ইসলাম দিয়েছে মুরতাদদেরকে হত্যা করার নির্দেশ। এ যে মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

৪. পুরুষ ও নারীর মাঝে ইসলাম রচনা করেছে বৈষম্যের দেয়াল। পদে পদে নারীদেরকে ঠকিয়েছে। তাদের অধিকার খর্ব করেছে। তালাকের অধিকার দিয়েছে শুধু পুরুষকে। নারীকে এই অধিকার থেকে করেছে বঞ্চিত। চার বিয়ের অধিকার দিয়েছে শুধুই পুরুষকে। উত্তরাধিকার সম্পদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের মাঝে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বিরাট বৈষম্যের দেয়াল।

৫. সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি খুব সংকীর্ণ। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের অঙ্গনের যারা পাশ্চাত্যপন্থীদের এ ধরনের অভিযোগ-আপত্তি খণ্ডন করেন, তাদের সবার ধারাটাই মোটামুটি একধরনের। একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন-

ইসলামের ওপর তারা যে আপত্তিগুলো করে, প্রথমে সেই আপত্তিকে আপত্তি হিসেবে মেনে নিয়ে এরপর তার উত্তর প্রদান করা হয়। ইসলাম উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের তুলনায় অর্ধেক সম্পদ প্রাপ্তির অধিকার দিয়েছে।

(উল্লেখ্য, এটা সবক্ষেত্রে নয়, বরং সমস্তরের পুরুষ-নারীর ক্ষেত্রে, যেমন ভাই-বোন। অন্যথায় উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর জন্য সবচে বেশি বরাদ্দ, পুরো সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ। এবং সম্পদের উত্তরাধিকারীদের যে তালিকা কোরআন-সুন্নাহয় উল্লিখিত হয়েছে, তাদের আট শ্রেণীই নারী। মাত্র চার শ্রেণী পুরুষ।

এমন সুরতও আছে, যেখানে নারী সম্পদ পায়, অথচ তার বরাবরের আরেকজন পুরুষ উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে সিকিভাগও পায় না। বিষয়টা কারো কাছে বিস্ময়কর মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা এটাই। ওদের অভিযোগ শুনতে শুনতে ইসলামের নির্দেশনাই ভুলে বসি।)

এবার এর যৌক্তিকতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়, সম্পদ উপার্জনের দায়িত্ব পুরুষের। নারীকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়নি। বিয়ে পর্যন্ত সে বাবা বা বড় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে থাকে। এরপর স্বামীর। তার মৃত্যুর পরও ছেলেদের কাঁধে তার দেখভালের দায়িত্ব অর্পিত হয়। তার খরচের কোনো খাত না থাকা সত্ত্বেও ইসলাম তাকে দিয়েছে মোহরের অধিকার। দিয়েছে উত্তরাধিকার থেকে ছেলের তুলনায় অর্ধেক সম্পদ পাওয়ার অধিকার।
তাহলে বাহ্যত কম দেখা গেলেও ইসলাম নারীকে দিয়েছে বেশি। এখানে বরং কম দিয়েও সমতা রক্ষা হয়নি। বরং ছেলের যে পরিমাণ খরচ, তাকে তো আরো বেশি দরকার ছিলো। সে হিসেবে এটা ইসলামের ইনসাফ।

আপনি যদি ইতিহাস ঘাটেন, তবে দেখবেন, ইসলামের ওপর এ ধরনের আপত্তির

ধারা শুরু হয়েছে সপ্তাদশ শতাব্দীর পরে। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের আগে এ ধরনের আপত্তি খুঁজে পাওয়াটা দুরূহপ্রায়। সপ্তাদশ শতাব্দীর পরে যখন পাশ্চাত্য দর্শন উৎকর্ষ লাভ করে, তখন এ ধরনের নিত্যনতুন আপত্তির ধারা শুরু হয়।

অন্যান্য অধিকাংশ ধর্ম তো আকিদা এবং ইবাদতের বাইরে সাধারণত তার অনুসারীদেরকে বিধান ও নির্দেশনা দেয় না, তাই তাদের ওপর আপত্তির তীরও বর্ষিত হয়নি। দুয়েক ধর্ম, যাদের ধর্মীয় বিধান ও নির্দেশনা উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ ধরনের অভিযোগের শিকার হয়েছে, তারা এ থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজনমাফিক স্ব স্ব ধর্মের সংস্কার করে নিয়েছে।

যেখানে এসে ধর্ম ও দর্শন সংঘাতের রূপ নিয়েছে, সেখান থেকে পরম যতনে ধর্মকেই সরিয়ে দিয়েছে। তাই তো ধর্ম হয়ে গেছে চার্চের আর রাষ্ট্র বেরিয়ে গেছে চার্চের হস্তক্ষেপ থেকে।

রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা করা হয়েছে মূলত সেই চেতনা থেকে। ইসলামের সাথে রাষ্ট্রের সংঘর্ষ ছিলো না ঠিক, কিন্তু আমাদের দেশের এসব অথর্ব আধুনিকমনস্কদের তো মাথায় আলাদা ঘিলু নেই, পাশ্চাত্য থেকে যা পায়, তার বুলি আওড়িয়ে আর নিজ নিজ পরিমণ্ডলে তা বাস্তবয়ন করেই তারা আমোদ-উল্লাসে মেতে ওঠে আর নিজেদেরকে স্বপ্নের ভেলায় চড়িয়ে মেঘের রাজ্যে ভেসে বেড়ায়। পশ্চিম থেকে আসা সব মলমূত্রই এদের নিত্যদিনের আহার।

মানুষ যখন নিজের মেটাফিজিক্সকে ছেড়ে দেয়, তখন তার বিপরীত পক্ষের বিরুদ্ধে লম্বা লম্বা প্রবন্ধ-বক্তৃতা অর্থহীন হয়ে যায়। সে অবিরাম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কার বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং কেনো করছে?! নিজের মেটাফিজিক্স ছেড়ে যখন অভিযোগকারীদের

মেটাফিজিক্স থেকেই তাদের অভিযোগ-আপত্তিগুলোকে দেখা হবে, তখন সেসব অভিযোগের উত্তর প্রদান করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু হবে না।
কারণ সে তখন কিসের পক্ষে লড়াই করছে? সে তো প্রথমে তাদের কসমোলজি (হাকিকতের তারতিব ও বিন্যাস) মেনেই এসেছে। এখন তবে নিজের ধর্মকে বাঁচানোর জন্য হাকিকতের নতিজা অস্বীকার কেনো করছে? এটা তো পাগলামি। নিজের মাঝেই সুস্পষ্ট সংঘাত।

অবস্থাটা এমন, স্বীকার করছে অমুক কুমারী মেয়েকে আমি র্যাপ করেছি কিন্তু এখন তার গর্ভে আসা সন্তানের ব্যাপারে বলছে, না, ঐ বাচ্চা কিছুতেই আমার নয়। মেয়েটার জীবনে একমাত্র পুরুষ হিসেবে যখন সে-ই উপগত হয়েছে, তখন গর্ভে আসা সন্তান তার না হয়ে আর কার হবে?! প্রথম বিষয়টাকে স্বীকার করে, তার নতিজাকে অস্বীকার করাটা নির্বুদ্ধিতা ও পাগলামি নয়তো কী?!

ওপরের সবগুলো অভিযোগের দিকে আরেকবার লক্ষ করুন। দেখবেন অভিযোগের শ্রেণী ভিন্ন হলেও মূলকথা এক। অর্থাৎ মানবাধিকার লঙ্ঘন; আর মানবাধিকার হলো প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং সকলের সমানাধিকার। আচ্ছা, মানুষের অধিকার কী? হাঁ, সিরিজের আগের লেখাগুলো পড়ে থাকলে বিষয়টা আপনার সামনে স্পষ্ট থাকার কথা। মানুষের অধিকার কী এ কথা তো তখনই স্পষ্ট হবে, যখন নিশ্চিতভাবে জানা যাবে, মানুষ আসলে কী? মানুষ কি আবদ (গোলাম) নাকি Human Being?

মুসলমানরা তাদের মেটাফিজিক্স অনুযায়ী মানুষকে আবদ হিসেবে গণ্য করে। তাদের অনটোলজি যেহেতু মানুষ আবদ, তাই কসমোলজিও আবদ হিসেবেই হয়।

আর পাশ্চাত্যপন্থীরা মানুষকে Human Being মনে করে। তাই তারা মানুষের যে অধিকারের কথা বলে, তাও এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, মানুষ Human Being।

আর এ কথা তো সূর্যালোকের মতো পরিষ্কার যে, আবদের বিধান এবং অধিকার আর Human Being এর বিধান এবং অধিকারের মাঝে বিস্তর পার্থক্য থাকবে। (এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী লেখায় আসবে ইনশাআল্লাহ)।

মুসলমান মানুষকে আবদ গণ্য করে তার ওপর একধরনের বিধান আরোপ করে, পাশ্চাত্যপন্থীরা তখন মানুষের হাকিকত Human Being গণ্য করে অভিযোগের বস্তা নিয়ে ছুটে আসে, চিৎকার-চেঁচামেচি করে আকাশবাতাস কাঁপিয়ে তুলে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়ে সবকিছু উষ্ণ করে বসে। আর আমরা মৌলবিরাও এবার তাদের মেটাফিজিক্স মেনেই অভিযোগ খণ্ডনের প্রয়াসে বসে যাই। অথচ ভুলেও একবারও মুলের দিকে তাকাই না। উসুলে ইখতিলাফ থাকলে ফুরুয়ে ভিন্নতা তো থাকবেই। বিপরীত পক্ষের উসুল মেনে নিয়ে ফুরুয়ে মতবিরোধ করা ও তাদেরকে গালমন্দ করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়।

পাশ্চাত্যের অভিযোগ-আপত্তি অনুধাবন করার জন্য আগে গোড়ায় তাকাতে হবে। তাদের মেটাফিজিক্স বুঝতে হবে। তাদের পরিভাষাগুলো বুঝতে হবে। সেগুলোর হাকিকত অনুধাবন করতে হবে। এরপর তাদের আপত্তির জবাব দিতে হবে। তখন তারাও নিশ্চুপ হয়ে সব কথা মেনে নিতে বাধ্য হবে।

পাশ্চাত্যের পরিভাষা-আপত্তিগুলো তাদের মেটাফিজিক্সের আলোকে অনুধাবন না করে নিজ ধর্মের পক্ষ হয়ে সেগুলোর মূল্যায়ন করতে গেলে সে চেতনে বা অবচেতনে ইসলামকে খ্রিস্টবাদের আজকের পরিণতিতে উপনীত করার প্রয়াসে রত। আদতে তার সব চেষ্টাই কোনো সুফল বয়ে আনবে না।

পাশ্চাত্যপন্থীদের অভিযোগের অন্যতম দুটো ভিত্তি হলো, তারা ভালো- মন্দ, ভুল-শুদ্ধ নিরূপণের মাপকাঠি নির্ধারিত করেছে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সকলের সমানাধিকারকে। এবার এই মাপকাঠিতে যা টিকে, তাকে তারা সহিহ বলে মেনে নেয়। যা কিছু এই মাপকাঠিতে টিকে না, তার বিরুদ্ধে একগাদা অভিযোগ ভাইরাল করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়।

নারীদেরকে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ইসলাম তার সমস্তরের পুরুষের তুলনায় অর্ধেক দিয়েছে, এটা সকলের সমানাধিকারের যে মাপকাঠি তারা নির্ধারণ করেছে, এতে টিকেনি। তাই এখন এর বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা। ব্যক্তিস্বাধীনতাও একটা মাপকাঠি। এবার ইসলামের সবগুলো বিধানের দিকে একবার উড়ন্ত দৃষ্টি বুলায়। মুরতাদকে হত্যা করার বিধান এবং এ জাতীয় আরো কিছু বিধানকে ব্যক্তিস্বাধীনতার চরম লঙ্ঘন মনে হয়। এবার এর বিরুদ্ধেও শুরু হয় প্রচারণা। বিদেশীরা শুরু করে। এরপর আমাদের দেশের মোটা মাথার লোকগুলো ইংরেজি থেকে সেসব লুফে নিয়ে বুক ফুলিয়ে মিডিয়ায় লিখতে থাকে, বলতে থাকে। আরবি-উর্দু মাধ্যম থেকে উত্তর সংগ্রহ করে আমাদের বন্ধুরাও সেসবের জবাব রচনা করতে থাকে।
আস্তিক বনাম নাস্তিক নামের ফেসবুক গ্রুপটা ঘুরে আসলেই বিষয়টা আপনার ভালো করে বোধগম্য হয়ে যাবে।

এখানে প্রয়োজন তাদের প্রতিটি অভিযোগ খুঁজে খুঁজে জবাব দেয়া নয়। বরং তাদের মেটাফিজিক্সে আঘাত করা।

ভালো-মন্দ, ভুল-শুদ্ধ নিরূপণের জন্য তারা যে মাপকাঠি তৈরি করেছে- ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সকলের সমানাধিকার প্রথমে এই মাপকাঠির মূল্যায়ন করা (জায়েযা লে'না)। আদতেই কি ঐ দুটো বিষয় ভালো-মন্দ, ভুল-শুদ্ধ নিরূপণের মাপকাঠি হওয়ার যোগ্যতা রাখে?

এর ওপর ভিত্তি করেই তাদের আপত্তির পর আপত্তি করাটা কি সাজে? শাস্ত্রীয়ভাবে এই একটা মূল বিষয়ের সঠিক বিশ্লেষণ ও উত্তর বেরিয়ে এলেই মুহূর্তের মধ্যে তাদের শত অভিযোগের সমাধি রচিত হয়ে যাবে।

(এটা শুধু উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা। বিস্তারিত আলোচনা সামনেও চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। কেউ না বুঝলে সমস্যা নেই। তবে গলদ ফাহমি হলে সেটা আশঙ্কার বিষয়।)

আর উসুল (মূল) ঠিক রেখে, বরং তা নিজে মেনে নিয়ে ফুরু (শাখা) নিয়ে আমরণ মারামারি ও লড়াই করে গেলেও যুদ্ধ শেষ হবে না। আপত্তির পর আপত্তি আসতেই থাকবে। আপনি নিবৃত্ত হলেও তারা নিবৃত্ত হবে না। আর আপনার অবহেলা এবং নিবৃত্ত হয়ে যাওয়া আরো হাজারো মানুষের গোমরাহির কারণ হবে। আজও ইসলামকে যদি যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারেন, তবে মানুষ অবশ্যই তা গ্রহণ করবে। ইসলামের জয় হবেই। জয়তু শাশ্বত ইসলাম।

{চলবে ইনশাআল্লাহ...}

নবিপ্রেমে সহাস্যবদনে জীবনোৎসর্গকারী তরুণ গাজি ইলমুদ্দিন শহিদ রহ. : সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য
ALI HASAN OSAMA·SUNDAY, APRIL 30, 2017

১.

পুরো হিন্দুস্তান উত্তাল। স্বামী পণ্ডিত চিমোপতি লাল রচিত রাসুলুল্লাহর সা. এর পবিত্র বৈবাহিক জীবন নিয়ে বিদ্রূপাত্মক

মন্তব্যে ভরপুর কুখ্যাত বই ‘রঙ্গিলা রাসুল’ প্রকাশের অপরাধে প্রকাশক রাজপালের বিরুদ্ধে চলছে তুখোড় আন্দোলন। ইংরেজ সরকার নীরব। মুসলমানদের ধর্মীয় মূল্যোবোধকে বিনষ্ট করার মানসে হিন্দুদেরকে ধর্মীয় উস্কানিমূলক সকল কাজের বৈধতা দিয়ে রেখেছে ইংরেজ সরকার। মুসলমানরা দগ্ধ হৃদয় নিয়ে প্রকাশক রাজপালের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার লক্ষ্যে বারবার সরকারের কাছে আবেদন করেছে। কিন্তু প্রতিবারই তাদেরকে ব্যর্থ মনোরথে ফিরতে হয়েছে। উল্টো ইংরেজ সরকার প্রকাশক রাজপালের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ নিয়োগ করেছে। মুসলমানরা যেনো আন্দোলন করে রাজপথ উত্তপ্ত করতে না পারে এজন্য ফিরিঙ্গিরা পূর্বেই ১৪৪ ধারা জারি করে রেখেছে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী আলিমদেরকে ধরে ধরে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে আন্দোলনকে নির্বাপিত করতে চেয়েছে। কিন্তু এতে মুসলমানদের ভেতরের জ্বলন আগ্নেয়গিরির তপ্ত লাভার মতো শুধু বেড়েছেই। ভেতরের আগুন ধীরে ধীরে বাইরেও ছড়িয়েছে।

১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করে অগণিত মুসলমান সেদিন দিল্লি দরজার অভ্যন্তরে শাহ মুহাম্মাদ গওস রহ. চত্ত্বরে সমবেত হয়। সমাবেশে নেতৃত্ব দান করেন আশিকে রাসুল আমিরে শরিয়ত সাইয়িদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারি রহ.। শাহজি রহ. সেদিন নবিপ্রেমে ব্যাকুল হয়ে এমন ইমানদীপ্ত অগ্নিঝরা বক্তৃতা করেন, যা শ্রোতাদের হৃদয়ে দাউ দাউ করে ইমানের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে। সেই সমাবেশে মুফতি কিফায়াতুল্লাহ রহ. এবং মাওলানা আহমদ সাইদ দেহলবি রহ.ও উপস্থিত ছিলেন। শাহজি রহ. সেদিন তার ভাষণে বলেন—

“আজ আপনারা জনাবে ফখরে রাসুল মুহাম্মাদে আরাবি সা. এর ইজ্জত এবং মর্যাদা সংরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হয়েছেন। আজ সমগ্র মানবজাতিকে ইজ্জত দানকারী মানুষটির ইজ্জত ঝুঁকির মধ্যে। আজ সেই মহান মানবের ইজ্জত ঝুঁকির মুখে পড়ে আছে, যার দেয়া ইজ্জত নিয়ে সমগ্র সৃষ্টিকুল গর্ব করে। আজ মুফতি কিফায়াতুল্লাহ এবং মাওলানা

আহমদ সাইদের দরজায় উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা, উম্মুল মুমিনিন খাদিজাতুল কুবরা রা. দাঁড়িয়ে সকরুণ কণ্ঠে আওয়াজ দিচ্ছেন, “আমরা তোমাদের মা। তোমরা কি জানো না যে, কুফফার গোষ্ঠী আমাদেরকে গালি দিচ্ছে।” আরে দেখো, কোথাও উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা রা. দরজায় দণ্ডায়মান নয়তো?!”

শাহজি রহ. কথাটি হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে এমনভাবে উচ্চারণ করেন যে, সাথে সাথে সমবেত জনতা সকলে প্রায় দরজার দিকে ঘুরে তাকায়। পুরো মজলিসজুড়ে কান্না ও আর্তনাদের আওয়াজ ভেসে ওঠে। এরপর শাহজি রহ. বলেন—

“তোমাদের মহব্বতের তো এই দশা যে, তোমরা সাধারণ সাধারণ অবস্থায় জীবন উৎসর্গ করে বসো অথচ তোমাদের কি জানা নেই যে, আজ রাসুলুল্লাহ সা. সবুজ গম্বুজের নিচে তড়পাচ্ছেন। আজ খাদিজা এবং আয়িশা রা. পেরেশান। বলো, তোমাদের হৃদয়ে উম্মুল মুমিনিনদের জন্য কোনো জায়গা আছে কি? আজ উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. তোমাদের কাছে হক তলব করে ফিরছেন; সেই আয়িশা, রাসুলুল্লাহ সা. যাকে ভালোবেসে ‘হুমায়রা’ বলে ডাকতেন, সেই আয়িশা, যিনি সাইয়িদে আলম সা. এর তিরোধানের সময় তাকে মিসওয়াক চিবিয়ে দিয়েছেন। স্মরণ রেখো, যদি তোমরা খাদিজা এবং আয়িশা রা. এর জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতে পারো, তাহলে তা কম গর্বের কথা নয়।

যতোক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান জীবিত আছে, রাসুলের ইজ্জতের ওপর হামলাকারীরা কিছুতেই প্রশান্তির সাথে বাঁচতে পারে না। পুলিশ মিথ্যা, সরকার আলসে আর ডিপুটি কমিশনার অযোগ্য। ওরা হিন্দু সংবাদধারার বাচালতা ও বকবক তো বন্ধ করতে পারে না, কিন্তু উলামায়ে কেরামের ভাষণ-বক্তৃতা বন্ধ করে দিতে চায়। সময় এসেছে, আজ এখানে ১৪৪ ধারা টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দেয়া হবে। আমি ১৪৪ ধারাকে আমার জোতার নিচে পিষ্ট করে বলবো—

پڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں

جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں

এক সপ্তাহের মধ্যে যদি আমার নানার এই মালউন গোস্তাখকে কোনো মুসলমান নওজোয়ান হালাক করতে না পারে , তাহলে রাসুলুল্লাহর হুরমতের কসম, এই সাইয়িদজাদা বুড়ো নিজ হাতে এই মহান ফরজ কর্ম সম্পন্ন করবে।”

সেদিনই আঞ্জুমানে খুদ্দামুদদীন শহরের ফটকে ফটকে রাজপালকে হত্যা করা ওয়াজিব মর্মে ফতোয়া টানিয়ে দেয়। আলিমউলামা জনসাধারণ সকলের যবানেই ‘শাতিমে রাসুল ’কে জাহান্নামের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর অপরিহার্যতার কথা চর্চা হতে থাকে।

২.

১০ এপ্রিল ১৮৭৫ তারিখে সনাতন হিন্দুধর্ম থেকে নতুন শাখা উৎসারিত হয়, যার নাম আরিয়া সমাজ। এর প্রবর্তক স্বামী দিয়ানন্দ সরস্বতী ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটে জন্মগ্রহণ করে। স্বামী দিয়ানন্দ সরস্বতী হিন্দুধর্মকে নতুন করে সংস্কার -সংশোধন করে, তার জন্য নয়া সীমারখা নির্ধারণ করে। সে মূর্তিপূজাকে অস্বীকার করে। দেবদেবীকে উপাস্য হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে। জাতপাতকে ধর্মীয় বা প্রকৃতিগত বিভাজন স্বীকার না করে রাজনৈতিক বিভাজন বলে আখ্যায়িত করে। স্বল্প সময়েই তার এই সংস্কার ধারা শিক্ষিত প্রজন্মকে আকর্ষণ করে। দলে দলে তারা আরিয়া সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। আরিয়া সমাজের জন্য আলাদাভাবে আইন প্রণয়ন করা হয়। এই মতবাদকে সমগ্র হিন্দুস্তানে প্রসার করার জন্য শৃঙ্খলিত পদক্ষেপ নেয়া হয়। আরিয়া সমাজের জন্য নির্ধারিত কোঠা ঘোষণা করা হয়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামী দিয়ানন্দ সরস্বতী দুনিয়া ত্যাগ করে।

স্বামী দিয়ানন্দ সরস্বতী শুধু হিন্দুধর্ম সংস্কারের কাজই করেনি, বরং ইসলামের ওপর জ্ঞানগতভাবে আক্রমণ করে। নিজের অপরিপক্ক মাথাকে ব্যবহার করে ইসলাম কোরআন নবি— সবকিছুকেই তার তীর্যক আপত্তির লক্ষ্যস্থল বানায়। ইসলামের ওপর তার প্রসিদ্ধ এগারোটি আপত্তি ছিলো। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতবি রহ. তার আপত্তিগুলোকে ‘ইনতিসারে ইসলাম’, ‘কিবলাহ নুমা’ এবং ‘তুরকি ব তুরকি’ গ্রন্থত্রয়ে খণ্ডন করেন। নরাধম দিয়ানন্দ সরস্বতীর মৃত্যুর সুদীর্ঘকাল পর তার রচিত কোরআনের বিরুদ্ধে শত আপত্তিবিদ্রূপে ভরপুর বই ‘সত্তিয়ারথ পোরকাশ’ উর্দুতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। বইটিকে উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে ‘রঙ্গিলা রাসুলে’র লেখক স্বামী পণ্ডিত চিমোপতি এম এ। রাজপাল নামক এক কট্টর হিন্দু প্রকাশক লাহোরে অবস্থিত তার লাইব্রেরি থেকে এ বই প্রকাশ করে মুসলমানদের হৃদয়কে চরমভাবে আহত করে। মুসলমানরা বইটির প্রকাশনার ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা- পরিশ্রম করে। কিন্তু এই বিশাল জনগোষ্ঠীর চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে বিন্দুমাত্র মূল্যায়ন না করে, তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর চরমভাবে আঘাত করে ফিরিঙ্গিরা সাদা চামড়ার ভেতরে সুপ্ত নিজেদের চরম কুশ্রী মুখোচ্ছবি প্রকাশ করে। রাজপালের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে তার প্রকাশনীর কর্মচারী মুনশি রাম সরকারি সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করে। এই মুনশি রাম কিছুদিনের মধ্যেই রাতারাতি ‘শ্রীমান মহাত্মা সোরাগ বাশী সোয়ামী শ্রীদ্ধানন্দজি’ বনে যায়। এরপর সে অবিরল কোরআন ইসলাম এবং নবিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে লিটারেচার প্রকাশ করতে থাকে। তবে তার এই কুকর্মের ধারা খুব বেশি দীর্ঘায়িত হতে পারে না। এক জানবাজ মুজাহিদ কাজি আব্দুর রশিদ শহিদ রহ. এর হাতে তার জীবননাটিকার যবনিকাপাত হয়। তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নরাধম রাজপাল ‘রঙ্গিলা রাসুল’ প্রকাশ করে।

৩.

আমিরে শরিয়ত আতাউল্লাহ শাহ বুখারি রহ. এর ইমানদীপ্ত অগ্নিঝরা ভাষণে প্রভাবিত হয়ে লাহোরে অবস্থানকারী অত্যন্ত সুশ্রী ও নুরানি চেহারার অধিকারী এক কাশ্মীরি যুবক গাজি খোদাবখশ ইবনে মুহাম্মাদ আকরাম ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ তারিখে জানবাজি রেখে নরাধম রাজপালের ওপর আক্রমণ চালান। কুখ্যাত রাজপাল নিজ লাইব্রেরিতে কাজে ব্যস্ত ছিলো। এমন সময় গাজি খোদাবখশ রহ. এসে ধারালো ছুরি নিয়ে রাজপালের ওপর অতর্কিত হামলা চালান। আকস্মিক এ আঘাতে রাজপাল আহত হয়। তার শরীর থেকে রক্তের ধারা বইতে থাকে। কিন্তু দ্রতবেগে নিজেকে সামলে নিয়ে রাজপাল সেখান থেকে পলায়ন করে। পুলিশ গাজি খোদাবখশ রহ. কে ৩০৭ ধারার অধীনে গ্রেফতার করে। লাহোর ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট কোর্টে মামলার রায়ের শুনানি হয়। গাজি খোদাবখশ রহ. নিজের পক্ষে কোনো ওকিল গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

রাজপাল আদালতে সকরুণ কণ্ঠে আরজ করে, “আমার ওপর এ হামলা মুক্তচিন্তার বই প্রকাশ এবং মুসলমানদের এজিটেশনের কারণে করা হয়েছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, অপরাধী খোদাবখশ আমাকে জানে মেরে ফেলবে।”

জজ জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি আরো কিছু বলবেন?”

রাজপল বললো, “হামলার সময় অপরাধী চিৎকার করে বলছিলো, কাফিরের বাচ্চা, আজ তুই আমার হাতে এসেছিস। আজ আর তোকে জীবিত ছাড়বো না।”

জজ গাজি খোদাবখশ রহ. এর কাছে এর ব্যাখ্যা তলব করলে তিনি গর্জে উঠে বলেন, “আমি মুসলমান। রাসুলের ইজ্জত রক্ষা করা আমার ওপর ফরজ। আমি কিছুতেই আমার ‘আকা’ এবং ‘মাওলা’ মুহাম্মাদ সা. এর অপমান বরদাশত করতে পারি না।” এরপর মালউন রাজপালের দিকে ইশারা করে বলেন, “সে আমার প্রিয় রাসুলের শানে গোস্তাখি করেছে। এজন্য আমি তার ওপর

জীবনবাজি রেখে আক্রমণ করেছি। কিন্তু এই নরাধম সেসময়ে আমার হাত থেকে একটুর জন্য বেঁচে গেছে।”

অপরাধের স্বীকারোক্তি প্রদানের পর আদালত গাজি খোদাবখশ রহ. এর ব্যাপারে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ঘোষণা করে, যার মধ্যে তিনমাস একাকী বাসের শাস্তিও রয়েছে। এবং নির্ধারিত মেয়াদ খতম হওয়ার পরে নিরাপত্তা লাভের জন্য পাঁচ পাঁচ হাজার রুপি মূল্যের তিনটি জামানত দাখিল করার ফায়সালা ঘোষণা করা হয়।

এর কিছুদিন পর ১৯ অক্টোবর ১৯২৭ তারিখে মালউন রাজপালকে জাহান্নামে পৌঁছানোর মানসে আফগানিস্তানের কোহাট থেকে গাজি আব্দুল আজিজ নামের এক ইমানদীপ্ত ব্যবসায়ী যুবক লাহোরে আগমন করে। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে মালউন প্রকাশকের লাইব্রেরিতে পৌঁছে। ঘটনাক্রমে সেসময়ে রাজপাল দোকানে ছিলো না। তার পরিবর্তে দোকানে বসা ছিলো তার দুই বন্ধু জিতান্দর দাস এবং স্বামী সত্যানন্দ। দোকানে বসে তারা মুক্তমনে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছিলো। আলোচনায় অগ্রণী ভূমিকা রাখছিলো স্বামী সত্যানন্দ। গাজি আব্দুল আজিজ কিছু সময় আড়াল থেকে আলোচনা শুনেন। তিনি স্বামী সত্যানন্দকেই রাজপাল ভেবে বসেন। অনন্তর কোষ থেকে তরবারি বের করে এক আঘাতেই স্বামী সত্যানন্দকে জাহান্নামের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন। এরপর তিনি নিজেই সেখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে থাকেন, আমি রাসুলের ইজ্জত হরণকারী নরাধমের ভবলীলা সাঙ্গ করেছি। আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হোক। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে গাজি আব্দুল আজিজ রহ. এ কথাগুলো বলেন—

“আমার নাম আব্দুল আজিজ। আমি (সুলতান মাহমুদ গজনবির স্মৃতি বিজড়িত) গজনিতে থাকি। আমার মাতৃভূমির গর্ব, সে সুলতান মাহমুদ গজনবির মতো মহান মুজাহিদ মুবাল্লিগ ও মূর্তিবিনাশকারী মনীষীকে গর্ভে ধারণ করেছে, যেই মাহমুদ গজনবি এই ভারতবর্ষের ওপর কমবেশি

সতেরোবার হামলা চালিয়ে কুফুর এবং ইলহাদকে বিনাশ করেছেন এবং মূর্তির নগরকে ইসলামের দৌলত দিয়ে গৌরবান্বিত করেছেন। এই সেই মহান মূর্তিবিনাশকারী , যার সামনে সোমনাতের পূজারীরা সম্পদের পাহাড় ঢেলে দিয়ে এই ফরিয়াদ জানিয়েছে যে , মহারাজ , আপনি এই সমস্ত সম্পদ নিয়ে নিন , তবুও আমাদের মূর্তিদের ওপর যেনো কোনো আঘাত না আসে। কিন্তু ইসলামের এই মহান মুজাহিদ নিঃসঙ্কোচে দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন , মুসলমান মূর্তিবিনাশকারী , মূর্তিবিক্রেতা নয়। এই কথা বলে তিনি সোমনাতের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। আল্লামা ইকবাল যার নির্মুখাপেক্ষিতা এবং পূর্ণ ইমানের ওপর গর্ব করে বলেন —

قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی

بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی

তিনি ছিলেন সেই গাজি , যিনি শুনলেন , মুলতানে কারামিতা নামক এক গোষ্ঠী আছে , যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয় , কিন্তু আদতে তারা কাফির এবং মূর্তিপূজারী। তাদের লৌকিকতার চূড়ান্ত হাল এই ছিলো যে , তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে জামাতের সাথে নামাজ পড়তো , কিন্তু সামনে নাউযুবিল্লাহ হযরত রাসুলে কারিম সা . এর কাল্পনিক অবয়ব বানিয়ে রাখতো। মাহমুদ গজনবির কাছে এই ভয়াল রিপোর্ট পৌঁছামাত্রই তিনি ঘূর্ণিবায়ুর মতো দ্রুতবেগে সেখানে হাজির হন এবং মুলতানের হাকিম দাউদ কারামেতির ভবলীলা সাঙ্গ করে সেখানে ইসলামের পতাকা উড্ডিন করেন। আমাকে স্বপ্নে সুলতান মাহমুদ গজনবি আদেশ করেছেন, যাও, সেই মালউনকে জাহান্নামের দোরগোড়ায় পৌঁছিয়ে উভয় জাহানের কামিয়াবি অর্জন করো। আমার আফসোস হচ্ছে যে , মূল শয়তানকে জাহান্নামে পৌঁছাতে পারলাম না। ”

গাজি আব্দুল আজিজের এই সারগর্ভ এবং আলিমসুলভ কথামালা শুনে মুসলিম জনতা সমস্বরে তাকবির দিয়ে আকাশ-বাতাস ভারি করে তুলে। ফিরিঙ্গি হুকুমতের ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট এম বি উগলবি আইনি তাকাজা এবং আরো কিছু বিষয়ের প্রতি লক্ষ করে গাজি আব্দুল আজিজ খানকে শাহাদাতের মর্যাদা দেয়ার পরিবর্তে তার ব্যাপারে চৌদ্দ বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করে।

পরাপর দুইবার অতর্কিত আক্রমণে ভীত হয়ে রাজপাল নিজেকে বিপদগ্রস্ত মনে করে। তাই সে আদালতের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট রাজপালের নিরাপত্তার জন্য দুই হিন্দু সিপাহী এবং এক শিখ হাবিলদার নিয়োগ করে।

রাজপাল পাহারাবেষ্টিত জীবনকে নিরাপদ জীবন ভেবে বসে। সেসময়ে সে লাহোর ছেড়ে কয়েক মাস অন্যান্য শহরনগর ঘুরে আমোদফূর্তি করে আসে। তার ধারণা ছিলো, এই নাতিদীর্ঘ সময়ে ঝামেলা ও বিপদ কেটে যাবে, মুসলমানদের জযবাও নিস্তেজ হয়ে যাবে। লাহোরে ফিরে সে পুনরায় তার কারবার শুরু করে।

৪.

গাজি ইলমুদ্দিন শহিদ লাহোরের এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে ৪ ডিসেম্বর ১৯০৮ তারিখে জন্মগ্রহণ করে। তার বাবার নাম তালেমন্দ। পেশায় কাঠমিস্ত্রি। লাহোরে এবং তার আশপাশে সততা এবং দক্ষতার কারনে তাদের ভালো সুনাম ছিলো। সম্মানের সাথেই দিনাতিপাত করছিলেন। খুব বড় হওয়ার এবং অনেক সম্পদধারী হওয়ার স্বপ্ন ছিলো না। আর দশটি পরিবারের মতো স্বাভাবিকভাবেই জীবনের ধাপগুলো অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষা ছিলো। সেসময়ে শিশুরা মসজিদ থেকেই প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করতো। তালেমন্দ তার ছেলেকেও কোরআন শেখার জন্য মসজিদে পাঠিয়েছিলেন। গাজি ইলমুদ্দিন কিছুদিন সেখানে যাতায়াত করে।

কিন্তু অধিক বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করা আর তার নসিবে জোটে না। কুদরত তাকে হয়তো গতানুগতিকতার বাইরে অন্য কোনো মিশনের জন্য প্রস্তুত করছিলো। ইলমুদ্দিনের ভাই মুহাম্মাদুদ্দিন লেখাপড়া করে সরকারি চাকরি লাভ করে। অপরদিকে ইলমুদ্দিন বাবার হাত ধরে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পেশায় আত্মনিয়োগ করে। বাবার মতো সেও একজন ভালো কাঠমিস্ত্রি হয়। ইলমুদ্দিন বাবার সাথে কাজের প্রয়োজনে লাহোরের বাইরেও বিভিন্ন সময়ে গমন করতো।

ইলমুদ্দিন এবং মুহাম্মাদুদ্দিনের মধ্যে বেশ সখ্যতা ছিলো। ভাই-ভাইয়ের মধ্যে এমন প্রগাঢ় ভালোবাসা খুব কমই নজড়ে পড়ে। একবারের ঘটনা, ইলমুদ্দিন তখন বাবার সাথে শিয়ালকোটে গিয়েছে। এদিকে মুহাম্মাদুদ্দিন ভাইয়ের ব্যাপারে দুঃস্বপ্ন দেখে। দুঃস্বপ্ন দেখে অস্থির হয়ে মুহাম্মাদুদ্দিনও শিয়ালকোটে গিয়ে পৌঁছে। মুহাম্মাদুদ্দিন যখন বাবার ঠিকানায় পৌঁছে, তখন ইলমুদ্দিন খাটে বসা ছিলো। ভাইকে দেখে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে। এভাবে দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়। তালেমন্দ মুহাম্মাদুদ্দিনকে বসতে বলেন। মুহাম্মাদুদ্দিন স্বপ্নে ভাইকে যখম হতে দেখেছিলো। এবার সে লক্ষ করে দেখে, বাস্তবেই ইলমুদ্দিন যখম। হাতে পট্টি বাঁধা। কাজে তখন তো মাত্র হাতেখড়ি হচ্ছে। তাই অসতর্কতায় আঘাত পেয়ে হাত যখম হয়েছে। সেখানে একদিন অবস্থান করে বাবার নির্দেশে পরবর্তী দিন মুহাম্মাদুদ্দিন লাহোরে ফিরে আসে।

ইলমুদ্দিন লেখাপড়া শিখেনি ঠিক, তবে পারিবারিকভাবেই মনুষ্যত্বের দীক্ষা নিয়েছে। সততা সত্যবাদিতা অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার মানসিকতা অনুগ্রহকারীর জন্য জীবনোৎসর্গ করার চেতনা ইত্যাদি বিষয় বাবা-মা’র দৈনন্দিন আচার-রীতি থেকেই তার ভেতরে শেকড় গেঁড়ে নেয়। ইলমুদ্দিন কখনও চিল্লায় যায়নি ঠিক, কখনও হজ-উমরাও করেনি, কখনও খানকাহয়ও যাতায়াত করেনি, আর না কখনও রাযি-কাশশাফ অধ্যয়ন করেছে, মানতিক-ফালসাফা-আসরারে শরিয়ত শিখেছে, না কখনও শায়খের সাথে

সম্পর্ক গড়ে দীর্ঘ আমল করেছে , না কখনও মসজিদে গাশত করেছে। কিছুই সে করেনি। দীনি বিষয়ে বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যই সে অর্জন করেনি। তার তো সম্বল ছিলো শুধু এক কালিমা। যে কালিমা সে পড়তো। যে কালিমাকে সে ভালোবাসতো। যে কালিমা থেকে সে দুই মহান সত্তাকে অনুভব করতো। আল্লাহ এবং তার রাসুলকে ভালোবাসতো। সে হেকমত -মাসলাহাত বুঝতো না। তার ভেতরে জযবা ছিলো। দীনি জযবা। আল্লাহ এবং তার রাসুলকে ভালোবাসার জযবা। এজন্যই তো তার স্মরণে আল্লামা ইকবাল বলেন —

اسی گلاں ای کر د□ ر□ گئ□ ت□ تر خاناں دامنڈابازی ل□ گیا

অপর এক কবিতায় আল্লামা বলেন —

عشق کی اک ہستن□ ط□ کر دیا قص□ تمام

اس زمین و آسماں کو ب□ کرا سمجھا تھا میں ن□

ইলমুদ্দিন এক সাদাসিধে মুসলমান। সে দিনরাত তার পেশায়ই ডুবে থাকতো। জগতের কোনো খোঁজখবরই তার ছিলো না। রাজপালের ঘৃণ্য উদ্যোগে সারা হিন্দুস্তান যে উত্তাল — এর বিন্দুমাত্র খোঁজও ইলমুদ্দিনের ছিলো না। একদিন সন্ধ্যেবেলায় কাজ শেষ করে ইলমুদ্দিন ঘরে ফিরছিলো। দিল্লি দরজার কাছে আসলে সেখানে এক বিশাল সমাবেশ দেখতে পায়। ডায়াস থেকে এক নওজোয়ানের অগ্নিঝরা বক্তৃতার আওয়াজ তার কানে ভেসে আসে। সে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়ায়। কিন্তু তার মাতৃভাষা পাঞ্জাবি হওয়ায় উর্দু ভাষণ সে খুব বেশি বুঝতে পারে না। উর্দু ছিলো প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা। তার তো আর প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করার সুযোগ হয়নি। পাশের এক ব্যক্তিকে অবস্থা জিজ্ঞেস করলে সে তাকে জানায় , রাজপাল নামের এক হিন্দু প্রকাশক রাসুলুল্লাহ সা . এর শানে গোস্তাখিমূলক বই প্রকাশ করেছে। তার প্রতিবাদে আজকের এ সমাবেশ। কথাটা ইলমুদ্দিনের ভেতরে স্পন্দন জাগায়। রাজপালের দুঃসাহসিকতা তার হৃদয়কে চরমভাবে আহত

করে। ইলমুদ্দিন দীর্ঘক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে আলোচনা শুনতে থাকে। কিছুক্ষণ পর স্টেজে আসেন একজন পাঞ্জাবি বক্তা। ইলমুদ্দিন খুব মনোযোগের সাথে তার আলোচনা শোনে। সেখান থেকেই সে জানতে পারে, রাজপাল তার এই দুঃসাহসিক কাজের কারণে ‘ওয়াজিবুল কতল’ তথা তাকে হত্যা করা অপরিহার্য। ইলমুদ্দিনের মানসজগতে বৈপ্লবিক ঝড় ওঠে। তার চিন্তাভাবনা মনমানসিকতা মুহূর্তেই সব বদলে যায়। কালিমায় এতোদিন একশ্বাসে যে দুই মহান সত্তার নাম নিতো, অশিক্ষিত মানুষটি যে দুই সত্তাকে জানপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো, সেই রাসুলের শানে এই চরম গোস্তাখিকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

সমাবেশ শেষ করে মধ্যরাতে ইলমুদ্দিন ঘরে ফিরে। বাবা জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার? আজ হঠাৎ দেরি কেনো? ইলমুদ্দিন সব খুলে বলে। রাজপাল ওয়াজিবুল কতল হওয়ার যে কথা সে শুনে এসেছে তাও বলে। তালেমন্দও একেবারে সাদাসিধে কালিমাপাঠকারী মুসলমান ছিলেন। সব শুনে তিনিও আলোচনার সাথে একাত্মতা পোষণ করেন। তিনিও বলেন, এমন বদমাশকে জাহান্নামেই পৌঁছানো উচিত। কথাটা ইলমুদ্দিনের হৃদয়জগতকে ছুঁয়ে যায়। সে যেনো মৌনভাবে ঘর থেকেও অনুমতি পেয়ে যায়।

সে রাতে ইলমুদ্দিনের আর ঘুম হয় না। পরবর্তী দিন সে তার বন্ধু শেদার সাথে সাক্ষাত করে। শেদাকে সব খুলে বলে। সেই দিনগুলোতে পুরো হিন্দুস্তানজুড়ে মুসলমানদের মূল আলোচনার বিষয় এই একটাই ছিলো। চায়ের দোকান থেকে শুরু করে হাট-বাজার— সর্বত্রই চলছিলো রাজপালের দুঃসাহসিকতা ও আস্পর্ধা নিয়ে আলোচনা। ইলমুদ্দিন নিয়মিত শেদার সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও পরামর্শ করতে থাকলো। কাজকর্ম নাওয়াখাওয়া কোনো কিছুতেই তার আর মন ছিলো না। সারাদিন একই চিন্তা, একই ভাবনা। প্রথমে পরিবারের চোখে বিষয়টা ধরা না পড়লেও আখের তাদের মনেও সন্দেহ জাগে। তারা তো তখনও জানেন না, কী মহান স্বপ্ন-ভাবনা খেলে যাচ্ছে ইলমুদ্দিনের বুকে। তারা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি, তাদের ছেলে তাদের জন্য জান্নাতের সওদা করছে, তাদেরকে ইতিহাসের পাতায়

অমরত্ব দানের উদ্যোগ নিচ্ছে। তালেমন্দের এক বন্ধু শেদার সঙ্গে ইলমুদ্দিনের মেলামেশার বিষয়টা তাকে অবগত করে। শেদা অনেক ভালো ছেলে ছিলো। কিন্তু তালেমন্দের সেই বন্ধু তাকে জানায়, শেদা একটা আওয়ারা-লম্পট ছেলে। তার সাথে মেলামেশা করাটা ইলমুদ্দিনের ঠিক হচ্ছে না। তাকে এখনই ফেরানো উচিত। নইলে দিনদিন সে খারাপ হয়ে যাবে। তালেমন্দ ছেলেকে অনেক করে বোঝায়। কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হয় না।

ইলমুদ্দিন আর শেদা অনেক খুঁজেফিরেও জানতে পারে না যে, কে এই নরাধম রাজপাল আর কোথায়ই বা তার দোকান। সে দেখতেই বা কেমন। পরিশেষে শেদার এক বন্ধুর মাধ্যমে তারা জানতে পারে যে, নরাধম রাজপালের লাইব্রেরি হাসপাতাল রোডে।

এদিকে ইলমুদ্দিনের অনিয়মানুবর্তিতার বিষয়টি তালেমন্দকে অনেক ভাবায়। ছেলে ঠিকমতো কাজে যায় না, নাওয়াখাওয়ারও কোনো খবর নেই। তার কাছে এর একমাত্র কারণ মনে হয় শেদার সঙ্গে মেলামেশা। এদিকে শেদার ব্যাপারে তিনি আরো জানতে পারেন যে, শেদার বাবা একজন জুয়ারি; জুয়ার পয়সা চুখাতে আখের নিজের দোকানটাও যিনি হারিয়েছেন। তালেমন্দ রাগি স্বভাবের মানুষ ছিলেন। একদিন রাতে দেরি করে ঘরে ফিরে ইলমুদ্দিন। তার অপেক্ষায় ঘরের ভেতর পায়চারি করছিলেন তালেমন্দ। ইলমুদ্দিন ঘরে ফিরলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, কোথায় ছিলে আজ সারাদিন? ইলমুদ্দিন জবাব দেয়, শেদার সাথে। উত্তর শুনে তালেমন্দ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছেলেকে গালমন্দ করতে থাকেন। ইলমুদ্দিন মাথা নিচু করে সব শুনে যেতে থাকে। তালেমন্দ রাগের প্রচণ্ডতায় শেষ অবধি বলে বসেন, এই মুহূর্তে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যা। যা, ঐ বদমাশের কাছে চলে যা। তোর মুখ আর আমাকে দেখাবি না।

বড় ভাই মুহাম্মাদুদ্দিন ঘরেই ছিলো। সে এসে বাবাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে। ছোট ভাইকে হাত ধরে তার কামরায় নিয়ে যায়। এরপর দীর্ঘ সময় নিয়ে খুব করে তাকে বোঝায়। খারাপ সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে বলে।

শেদার ব্যাপারে সকলের নেগেটিভ ধারণা দেখে ইলমুদ্দিনও খুব ব্যথিত হয়। কিন্তু সে মনের কথা কাউকেই খুলে বলতে পারে না। কীভাবেই বা বলবে! যেখানে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। সে তো মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে নিয়েছে, যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে তা কারোরই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

এভাবেই দিন যাচ্ছিলো। ছেলের অবস্থার পরিবর্তন না দেখে তালেমন্দ সিদ্ধান্ত নেন, বিশ বছর বয়সী ছেলেকে বিয়ে করিয়ে দেবেন। সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করলে সব ঠিক হয়ে যাবে, অপ্রত্যাশিত অবস্থাও শুধরে যাবে। তারা পাত্রী দেখে ইলমুদ্দিনের বিয়ের কথাবার্তা পাকাপোক্ত করে ফেলেন।

একরাতের কথা, ইলমুদ্দিন স্বপ্নে দেখে, এক বুযুর্গ এসে তাকে বলছেন, “ইলমুদ্দিন, এখনও ঘুমিয়ে আছো?! দুশমন তোমার নবির শানের খেলাফ প্রোপাগান্ডায় লিপ্ত। উঠো। জলদি করো।”

ইলমুদ্দিনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। উত্তেজনায় তার সারা শরীর ঘেমে ভিজে যায়। সে অস্থির হয়ে পড়ে। এরপর ঘুমানোর চেষ্টা করেও আর ঘুমাতে পারে না। অনন্তর উঠে সরাসরি শেদার ঘরে পৌঁছে। শেদাকে নিয়ে ভাটি দরজার কাছে যায়। এরপর তাকে সব খুলে বলে। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, ইলমুদ্দিন রাতে যে স্বপ্ন দেখেছে, হুবহু একই স্বপ্ন শেদাও দেখেছে। স্বপ্নে দেখা বুযুর্গ উভয়কে একই আদেশ দিয়েছেন। তারা উভয়েই পেরেশান। এবার কে তাহলে এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেবে। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। উভয়ই এই গুরুদায়িত্ব নিজ হাতে সম্পন্ন করতে চাচ্ছিলো। আখের আলোচনার মাধ্যমে কোনো ফায়সালা করতে না পেরে তারা লটারি করে। লটারিতে ইলমুদ্দিনের নাম ওঠে। শেদার অনুরোধে পুনরায় লটারি করা হয়। এবারও ইলমুদ্দিনের নাম ওঠে। শেদার পীড়াপীড়িতে তৃতীয়বার লটারি করলে এবারও ইলমুদ্দিনের নাম ওঠে। ইলমুদ্দিন নিশ্চিন্ত হয়ে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে বাড়িতে ফেরে।

আবারও ইলমুদ্দিন স্বপ্ন দেখে, সেই বুযুর্গ এসে তাকে বলছেন, “উঠো! জলদি করো! দেরি করবে তো অন্য কেউ এসে বাজি নিয়ে যাবে!”

ইলমুদ্দিন শেষবারের মতো শেদার সাথে দেখা করে। স্মৃতির নিদর্শনস্বরূপ তাকে একটি ছাতা এবং একটি ঘড়ি উপহার দেয়। এরপর তার কাছ থেকে শেষ বিদায় নেয়। রাতে তার দু’চোখে ঘুম আসে না। ভাবনায় ভাবনায় কোনোমতে রাতটা কাটিয়ে দেয়।

পরবর্তী দিন ৬ এপ্রিল ১৯২৯ তারিখে ইলমুদ্দিন সকালবেলা ঘর থেকে বের হয়। গুমটি বাজারের দিকে যায়। আত্মারাম কামারের দোকানে গিয়ে সেখান থেকে নিজের পছন্দমতো একটি ছুরি কিনে। কাঠমিস্ত্রি হওয়ার সুবাদে ছুড়ি-চাকু সে ভালোমতোই চিনতো। ছুরি কেনার পর সে অনেকটা আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তৎক্ষণাতই হাসপাতাল রোডে পৌঁছে। আনারকলি হাসপাতাল রোডে ইশরত পাবলিশিং হাউজের সামনেই রাজপালের অফিস ছিলো। সেখানে পৌঁছে ইলমুদ্দিন জানতে পারে, রাজপাল এখনও আসেনি। আর যখন সে আসে, তখন তার হেফাজতে পুলিশও এসে হাজির হয়। ইতোমধ্যে রাজপালের অফিসের সামনে এসে একটি কার থামে। ইলমুদ্দিন জানতে পারে, কার থেকে যে লোকটা নামছে, সে-ই রাজপাল। এই নরাধমই রাসুলের শানে গোস্তাখিমূলক বই প্রকাশ করেছে এবং তা নামমাত্র মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করেছে।

রাজপাল গাড়ি থেকে নেমে সাহেবের মতো দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে। অফিসে ঢুকে নিজের চেয়ারে বসে পুলিশকে তার আগমনের কথা জানানোর জন্য টেলিফোন উঠানোর কথা ভাবছে— এমন সময় ইলমুদ্দিন দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে। সেসময়ে অফিসে দু’জন কর্মচারী ছিলো। কুদারনাথ পেছনের কামরায় বইপত্র রাখছিলো আর ভগতরাম রাজপালের পাশেই দাঁড়ানো ছিলো। রাজপাল এক তরুণকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেখে, কিন্তু সে ভাবতেই পারে না যে, মৃত্যু তার এতোই কাছে। ইলমুদ্দিন ভেতরে প্রবেশ করে চোখের পল পড়ার আগেই জামার ভেতর থেকে ছুরি বের করে। তার হাতটা

উঁচুতে উঠে যায় এবং মুহূর্তের মধ্যেই ধারালো ছুরির আঘাত রাজপালের বুকে গিয়ে বিদ্ধ হয়। ছুরির ফলা রাজপালের কলজে ভেদ করে। এক আঘাতেই আহ শব্দ উচ্চারণ করে রাজপালের দেহ মুখ থুবড়ে যমিনে পড়ে। ইলমুদ্দিন দ্রুত পেছনে ফিরে দোকান থেকে পলায়ন করে। দোকানের দুই কর্মচারী বাইরে এসে চিৎকার করতে থাকে, “ধরো! ধরো! ... মেরে ফেলেছে! মেরে ফেলেছে!” কাশ্মীর থেকে রাসকুমারি পর্যন্ত চারিদিকে দাবানলের মতো গাজি ইলমুদ্দিনের বাহাদুরির কথা ছড়িয়ে যায়। সর্বত্র এই ইমানদীপ্ত তরুণের কালজয়ী কারনামার কথা আলোচনা হতে থাকে। গাজি ইলমুদ্দিন নবিপ্রেমের নযরানা পেশ করার অপরাধে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়।

৫.

স্বভাবত আদালতের কার্যক্রম কচ্ছপের থেকে ধীরগতিসম্পন্ন হলেও এক্ষেত্রে আদালত ছিলো বড়ই সোচ্চার। গাজি খোদাবখশ এবং গাজি আব্দুল আজিজের ক্ষেত্রে গ্রেফতারের সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তাদের ফায়সালা শুনিয়ে দেয়া হয়। ফিরিঙ্গিদের আদালতের রঙ্গমঞ্চে তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই তাদের পক্ষে কোনো ওকিলকে দেখা যায় না। গাজি ইলমুদ্দিনের ক্ষেত্রেও প্রথমে এমনই হয়। ১০ এপ্রিল ১৯২৯ তারিখে গাজি ইলমুদ্দিনকে সর্বপ্রথম আদালতে ওঠানো হয়। ইমানের চেতনার দাবিতে অবশেষে গাজি ইলমুদ্দিনের পক্ষে একঝাঁক মুসলিম ওকিল সাড়া দেন। ব্যারিস্টার খাজা ফিরোজ উদ্দিন, ব্যারিস্টার ফারাখ হুসাইন এবং তাদের সহযোগিতায় ডা. এ আর খালেদ, মাস্টার সেলিম এবং আরো কয়েকজন আল্লাহর বান্দা এই মামলার পক্ষে লড়ার সিদ্ধান্ত নেন। ওকিলরা গাজি ইলমুদ্দিনের পক্ষে অসীম সাহসিকতার সাথে লড়াই করেন। অসংখ্য দলিল ও আইনের ধারা পেশ করেন। কিন্তু ফায়সালা তো পূর্বনির্ধারিত। ৯ মে ১৯২৯ তারিখে গাজি ইলমুদ্দিনের ব্যাপারে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়।

ব্যারিস্টার ফারাখ হুসাইন মোম্বাই গিয়ে ওকিল (পরবর্তীতে কায়িদে আজম) মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর সাথে সাক্ষাত করেন। গাজি ইলমুদ্দিনের পক্ষে হাইকোর্টে আপিল দায়ের করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ তার প্রস্তাবে সম্মত হন। লাহোর হাইকোর্টে আপিল করেন। যথাসময়ে শুনানি হয়। মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ আদালতে বলেন, “ইওর অনার! ইসলামের নবি রাসুলুল্লাহ সা. এর শানে গোস্তাখি করা এবং জনসাধারণের মধ্যে দ্রোহের আগুন উসকে দেয়া ১৩৫ ধারার আলোকে দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু এতোদসত্ত্বেও প্রকাশক রাজপালের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। আইনের নিস্তব্ধতাই গাজি ইলমুদ্দিনকে আইন নিজ হাতে তুলে নিতে অনুপ্রাণিত করেছে। এজন্য গাজি ইলমুদ্দিনের অপরাধকে ৩০২ ধারায় মার্ডার গণ্য না করে ৩০৮ ধারায় এজিটেশন কিলিং গণ্য করা উচিত, যার শাস্তি বেশি থেকে বেশি সাত বছর কারাদণ্ড হতে পারে। তাছাড়া গাজি ইলমুদ্দিনের যে বয়স, তাতে সে মৃত্যুদণ্ডের আইনের আওতাভুক্তও নয়।”

লাহোর হাইকোর্টের কট্টর হিন্দু জাস্টিস শাদিলাল কোনো কথায় কর্ণপাত না করে আপিল খারিজ করে দেয়। এরপর ফাঁসির জন্য গাজি ইলমুদ্দিনকে মিয়ানওয়ালি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ৩১ অক্টোবর ১৯২৯ তারিখে গাজি ইলমুদ্দিনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। মাত্র একুশ বছর বয়সী অতি সাধারণ মুসলিম কাঠমিস্ত্রি গাজি ইলমুদ্দিন রাসুলের মহব্বতে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করে সবুজ পাখির ভেতর প্রবিষ্ট হয়ে জান্নাতে বিচরণ করার সৌভাগ্য লাভ করে।

ফাঁসি কার্যকর করার পর সেখানেই জানাযা ছাড়া গাজি ইলমুদ্দিনকে দাফন করা হয়। এদিকে তার শাহাদাতের খবর দাবানলের মতো সারা হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। শহিদের লাশ তার ওসিয়ত মোতাবেক লাহোরে দাফন করার দাবিতে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। মুসলমানরা আল্লামা ইকবালের নেতৃত্বে বরকত আলী মোহামেডান হলে সমাবেশ ঘোষণা করে। ১ নভেম্বর আল্লামা ইকবালের বাসভবনে জলসা সংঘটিত হয়। ২ নভেম্বর

আল্লামা ইকবালের দাবিতে প্রোফেশনাল মুসলিম লীগের কাউন্সিলে ফিরিঙ্গি সরকারের থেকে শহিদের লাশ আদায়ের ব্যাপারে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হয়। ৫ নভেম্বর আল্লামা ইকবাল , স্যার মুহাম্মাদ শফি , মিয়াঁ আব্দুল আজিজ , মাওলানা গোলাম মুহিউদ্দিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গভর্নরের সাথে সাক্ষাত করে সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে শহিদের লাশ সমর্পণের জন্য আবেদন করেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকার শাহাদাতের ১৪ দিন পর মুসলমানদের কাছে শহিদের লাশ অর্পণ করে। শহিদের লাশ কবর থেকে উঠিয়ে ট্রেনে লাহোরে নিয়ে যাওয়া হয়। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুসারে গাজি ইলমুদ্দিনের জানাযায় ছয় লক্ষ মুসলমান অংশগ্রহণ করে। লাহোরের ভাটিচক থেকে শুরু করে সুমনাবাদ পর্যন্ত পুরো এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। জানাযা শেষে আল্লামা ইকবাল এবং সায়্যিদ দিদার আলী শাহ নিজ হাতে শহিদের লাশ কবরে রাখেন। যখন তার লাশ কবরে রাখা হচ্ছিলো , তখন মাওলানা যফর আলী খান চিৎকার করে বলে ওঠেন, “হায় ! আজ এই মর্যাদা যদি আমার নসিবে জোটতো !” ঠিক সেই মুহূর্তেই আল্লামা ইকবালের যবান থেকে উচ্চারিত হয় —

اسی گلاں ای کر د□ ر□ گئ□ ت□ تر خاناں دامنڈابازی ل□ گیا

আমরা পরিকল্পনাই বানাতে থাকি আর এক কাঠমিস্ত্রির ছেলে এসে মর্যাদা লুফে নিয়ে যায়।

১৪ নভেম্বর ১৯২৯ তারিখে গাজি ইলমুদ্দিন শহিদ রহ . এর পবিত্র লাশকে তার ওসিয়ত মোতাবেক লাহোরের ভাওয়ালপুর রোডের নিকটস্থ মিয়ানি সাহেব কবরস্থানে দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ এই নবিপ্রেমিক খুদে শহিদের সমাধির ওপর অজস্র রহমত বর্ষণ করুন। আমিন।

লেখাটির পিডিএফ কপি ডাউনলোড করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন —
https://goo.gl/ixG4ys

একটি পর্যালোচনা - ১ঃ বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ

ALI HASAN OSAMA·FRIDAY, DECEMBER 15, 2017

জীবনের মূল্যবান সময়গুলোকে ব্যয় করে এই বইয়ের পর্যালোচনা লেখার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু বইয়ের অনুবাদক এবং প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদের বরকতে প্রসিদ্ধি লাভকারী প্রকাশক যেভাবে ময়দানে হম্বিতম্বি ছাড়ছিলেন — আমরা নাকি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ফাঁপা বুলি ছাড়ছি, উনাদের প্রতি বিদ্বেষবশত এমন করছি, এই বইকে থার্ডক্লাসের বই বলা নাকি মারাত্মক অন্যায়, এতে নাকি সমস্যাজনক কোনো দিকই নেই, সবই আমাদের স্বার্থে করছি, অন্য কোনো পাঠক পুরো বইয়ে সামান্যতম ত্রুটি খুঁজে পাননি, তাই সকলের দরকার বইটি পড়ে দেখা ইত্যাদি তখন সংক্ষেপে এর কিছু চিত্র তুলে না ধরে আর কী উপায়! তথাপি অনুবাদককে কিছু না বলা সত্ত্বেও, এমনকি তার অনুবাদের প্রশংসা করা সত্ত্বেও তিনি যেভাবে তেড়ে এসেছেন আর অভদ্রদের মতো যে আচরণ করেছেন এবং পাশাপাশি চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন, তাতে এর বোধহয় বিকল্পও ছিলো না। বই সম্পর্কে সার্বিক মূল্যায়ন এর পরবর্তী লেখায় (যদি তার প্রয়োজন হয়) উল্লেখ করা হবে। এখানে শুধু কয়েকটি পয়েন্টকে হাইলাইট করা হয়েছে মাত্র।

পর্যালোচনা : ১

“তাঁর নবুওয়াতি জীবনের তেইশ বছরই কি কেবল অনুসরণীয় মডেল? পৃথিবীর সেরা সেরা মানুষটির জমিনে পা রাখার পর থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত সময়কাল কি ‘উসওয়াতুন হাসানা’ নয়? নিশ্চয়। প্রিয় নবিজির পুরো তেষট্টি বছরের জীবনই পৃথিবীবাসির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।” {— প্রকাশকের কথা}

“বইটিতে তাঁর নবী হওয়ার আগের জীবন বেশি গুরুত্ব পাবে। আমরা দেখব শিশুকাল থেকে কিভাবে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছেন। টিনএজ বয়সের চ্যালেঞ্জগুলো কিভাবে মোকাবিলা করেছেন। তরুণ বয়সেই কিভাবে সমাজে নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। ...ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূল g

এর ব্যাপারে যেসব জীবনী লেখা হয়, সেগুলোর বেশিরভাগে দুটো জিনিস হামেশা পাওয়া যায়ল রাসূল g-এর ৪০ বছরের পরের জীবন আর পাঠকদের মধ্যে তাঁর ব্যাপারে সম্ভ্রম জাগানো। কিন্তু এ ধরনের লেখনীতে তরুণ পাঠকেরা নিজেদের কমই খুঁজে পায়। বইগুলোতে তাঁকে এতটাই নিখুঁত পুরুষ হিসেবে তুলে ধরা হয় যে, অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করতে বেগ পেতে হয়। তরুণরা অনেক সময়ই তাদের জীবন ঘনিষ্ঠ সংকটের সাথে রাসূল g-এর জীবনী মিলিয়ে নিতে পারে না। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খুব স্পষ্ট করে বলেন—‘আল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য আছে ভালো ভালো উদাহরণ’। (৩৩:২১)” {—লেখকের কথা}

পর্যালোচনা:

রাসুলুল্লাহ g-এর জীবনীতে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা রাসুলগণকে পাঠিয়েছেনই শিক্ষকরূপে। তারা আল্লাহ তাআলার বাণীকে মানবজাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। ইসলামি শরিয়াহকে নিজেদের জীবনে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। তাদের হাতে এক কাফেলা গড়ে উঠেছে। যারা তাদের সাহাবি (সঙ্গী) নামে পরিচিত। তাদের জীবন আদতে রাসুলগণের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। মৌলিকভাবে আমাদের জন্য অনুসরণীয় ব্যক্তি হলেন রাসুলুল্লাহ g। আর সাহাবিগণের জীবন যেহেতু তাদের জীবনেরই প্রতিনিধিত্ব করে, তাই সাহাবিগণকেও অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ h বলছেন—“তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কাউকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে চায়, সে যেনো মুহাম্মাদ g-এর সাহাবিদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে।”[1]

রাসুলগণকে আল্লাহ তাআলা যেহেতু পাঠিয়েছেনই মানবতার মুক্তির জন্য, তাই রাসুলগণ এসে হাতে-কলমে উম্মাহকে শরিয়াহর শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে রাসুল হিসেবে না পাঠিয়ে রক্ত-মাংসের মানুষকে রাসুল হিসেবে প্রেরণ করার অন্তর্নিহিত

রহস্য এটাই যে, মানুষ যেনো তাদেরই অনুরূপ একজন ব্যক্তির থেকে সহজেই শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং এই ভেবে প্রতারিত না হয় যে, তিনি তো আমাদের মতো মানুষ নন। তার তো আমাদের মতো জৈবিক চাহিদা-প্রয়োজন নেই। এজন্য আল্লাহ বলছেন—“আপনি বলে দিন, আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। (তবে) আমার প্রতি এই ওহি আসে যে, তোমাদের ইলাহ কেব্ল এক ইলাহ। সুতরাং যে-কেউ নিজ প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে, সে যেনো সৎকর্ম করে এবং নিজ প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।”[2]

আল্লাহ তাআলা শুধু আমাদের নবি মুহাম্মাদে আরাবি g-কেই আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসেবে ঘোষণা করেন নি, বরং অন্যান্য রাসুলগণের ক্ষেত্রেও একই কথা বলেছেন। অর্থাৎ, প্রত্যেক উম্মাহর জন্য তাদের রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। আল্লাহ বলেন— “তোমাদের জন্য তো তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ—প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের আশা রাখে।”[3]

আমাদের রাসুলের ব্যাপারে বলেছেন—“বস্তুত তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ—প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ এবং শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।”[4]

উপরিউক্ত উভয় আয়াত বিশেষ প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রথমটি অবতীর্ণ হয়েছে মিল্লাতে ইবরাহিমের বয়ান প্রসঙ্গে। দ্বিতীয়টি অবতীর্ন হয়েছে খন্দকের যুদ্ধের (গাযওয়াতুল আহযাবে) বয়ান প্রসঙ্গে। এই আয়াতের পূর্বের আয়াতগুলো দেখলে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। যারা যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকতো, অন্যদেরকেও যুদ্ধে যেতে বারণ করতো—সেসকল ভীরু স্বার্থপরদেরকে বলা হচ্ছে—তোমাদের জন্য তো আল্লাহর রাসুলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তিনি কতো কষ্ট করছেন, ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বাঁধছেন,

জঙ্গে নিজের জান-মাল ব্যয় করছেন, আর তোমরা কিনা এর থেকে পিছিয়ে থাকছো? তোমাদের রাসুলের এই আদর্শ নিজেদের মধ্যে আনয়ন করছো না?

আয়াত যদিও বিশেষ প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ, কিন্তু এতে ব্যাপকতা রয়েছে। তাই জীবনের সবক্ষেত্রেই তা প্রয়োগযোগ্য।

আল্লাহর রাসুলের ‘রাসুল-সত্তা’কে উম্মাহর জন্য অনুসরণীয় বলা হয়েছে। এজন্য শব্দচয়নের ক্ষেত্রেও ‘রাসুলুল্লাহ’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ‘মুহাম্মাদ’ শব্দ নয়। এ কারণেই রাসুলুল্লাহর ব্যক্তিগত পছন্দ-অভিরুচিকে উম্মাহর জন্য অনুসরণীয় বলা হয় নি, এমনকি তা অনুসরণের মধ্যে আলাদা সাওয়াবও রাখা হয় নি। রাসুলুল্লাহ g রুটি খেতেন না ভাত, ঝাল খেতেন না মিষ্টি, সর্বকনিষ্ঠ স্ত্রীকে বেশি ভালোবাসতেন নাকি সবচে বয়োজ্যেষ্ঠকে ইত্যাদি বিষয়কে কোথাও অনুসরণীয় বলা হয় নি। ইমাম কারাফি r ‘আলইহকাম’ গ্রন্থে রাসুলুল্লাহ g এর অবস্থাগুলো সবিস্তারে তুলে ধরছেন। কোন অবস্থার কী বিধান, কোনটার কী অবস্থান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠকগণ বিস্তারিত জানতে চাইলে সেখানে দেখে নিতে পারেন।

রাসুলগণকে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেনই আদর্শরূপে; যেনো তাদেরকে দেখে দেখে মানুষ জীবনের সবক্ষেত্রে শরিয়াহ পরিপালন করতে পারে। সারকথা, রাসুলের ‘রাসুল-সত্তা’ই হলো উম্মাহর জন্য একমাত্র অনুসরণীয়। হাঁ, তার ব্যক্তিসত্তার যে বিষয়গুলো রাসুল-সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তারই বাস্তব রূপায়ন মাত্র—তাও অবশ্যই অনুসরণীয়। বিষয়টি অনেকটা এমন—আমাদের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় হলো আলকুরআন, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলো নয়। হাঁ, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোর যেসব বিষয় আলকুরআন দ্বারা সমর্থিত, তাও পালন করা যাবে; কিন্তু তা এজন্য নয় যে, পূর্বের কোনো ধর্মগ্রন্থে তা বিবৃত হয়েছে, বরং এজন্য যে, আলকুরআন তা সমর্থন করেছে। সুতরাং তা আর

পূর্বের শরিয়াহর বিধান রয় নি, বরং আমাদের শরিয়াহর বিধানরূপে সাব্যস্ত হয়েছে, যার অনুরূপ বিধান পূর্ববর্তী শরিয়াহয়ও ছিলো। এর সাধারণ দৃষ্টান্ত হলো, সালাত, সিয়াম এবং কিসাস প্রভৃতি।

সুতরাং রাসুলের ব্যক্তিসত্তা দেখে ‘তিনি কতো বছর বয়সে বিয়ে করেছেন’, ‘নবুওয়াতের পূর্বে ইবাদত করার ক্ষেত্রে কী পন্থা গ্রহণ করেছেন’, ‘ব্যবসা করেছেন নাকি চাকরি করেছেন’, ‘নারীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন নাকি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নারীদের থেকে দূরে থেকেছেন’—এসকল বিষয় বের করে এনে উম্মাহর জন্য তাকে অনুসরণীয় বলা এবং এসকল বিষয় থেকে শিক্ষা বের করে উম্মাহকে সেই কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা কোনো বিচক্ষণ মুসলিমের কাজ হতে পারে না।

নইলে তো কেউ এ কথাও বলে বসবে যে, পঁচিশ বছর হলে বিয়ে করা সুন্নাহ এবং এর পূর্বে নয়, নিজের বয়সের থেকে অধিক বয়সী নারীকে বিয়ে করা সুন্নাহ, গুহায় গিয়ে ইবাদত করা সুন্নাহ, ছাগল চরানো সুন্নাহ। কেউ তো এ কথাও বলতে পারে যে, ফিরাউনরূপী শাসকের মহলে বাস করা ইবাদত, সমকামীদের সমাজে বাস করা ইবাদত, ঝগড়া হলে বিপরীত পক্ষের ব্যক্তিকে আঘাত করা, প্রয়োজনে প্রচণ্ড আঘাত করে মেরে ফেলা ইবাদত। এ ধরনের আরো যতো বিষয় রয়েছে, সবগুলোকেই ইবাদত বানিয়ে ফেলা হবে।

রাসুলগণের নবুওয়াত-প্রাপ্তির পরবর্তী জীবন যে মাসুম তথা নিষ্পাপ ছিলো—এ ব্যাপারে তো গোটা উম্মাহর ঐকমত্য রয়েছে। কিন্তু তাদের নবুওয়াত-প্রাপ্তির পূর্বের জীবন সার্বিকভাবে মাসুম ছিলো কি না— এ নিয়ে কোনো কোনো আলিম ইখতিলাফ করেছেন। মানবজাতির জন্য যেই সত্তাকে আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করা হবে, তা তো আবশ্যকিভাবেই মাসুম হবে, সগিরা এবং কবিরা উভয় প্রকারের গুনাহ থেকে মুক্ত হবে। অন্যথায় কীভাবে তা আদর্শ ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণীয় হবে? এটা তো একটা স্পষ্ট বিষয়। এতোদসত্ত্বেও তাদের নবুওয়াত-প্রাপ্তির পূর্বের জীবনের বিধান নিয়ে কেউ কেউ ভিন্নমত কেনো পোষণ করলেন? এর কারণ এটাই

ছিলো যে, তারা তো আদর্শ পুরুষ হবেন নবুওয়াত-প্রাপ্তির পরে। গোটা উম্মাহকে তাদের সেই ‘নবি-সত্তা’ অনুসরণ করতে বলা হবে। নবুওয়াত-প্রাপ্তির পূর্বের জীবন অনুসরণ করতে বলা হবে না।

আল্লাহর রাসুলকে আল্লাহ তাআলা যেহেতু আদর্শ পুরুষ হিসেবে পাঠিয়েছেন, তাই তার ‘রাসুল-সত্তা’র মধ্যেই প্রত্যেকে নিজের জীবনের সকল সামাধান খুঁজে পাবে। সমস্ত উত্তম বৈশিষ্ট্যের আধার ছিলেন রাসুল। আচ্ছা, তিনি নিজে তো কোনো অপরাধ করেন নি, তাহলে অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে উম্মাহ কীভাবে তার জীবনে আদর্শ খুঁজে পাবে? তিন্নি তো শিশু কিশোর তরুণ যুবক অবস্থায় নবি ছিলেন না। তাহলে জীবনের এসকল সময়ে মানুষ কীভাবে ‘রাসুল-সত্তা’কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে?

হাঁ, এজন্যই আল্লাহ তাআলা সাহাবিদের জামাআতকে প্রস্তুত করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ h-এর ভাষায়—“আল্লাহ তাআলা তার রাসুলের সুহবাতের জন্য এবং তার দ্বীনের প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরকে নির্বাচিত করেছেন।” সাহাবিদের দ্বারা সবকিছুই হয়েছে। তাদের দ্বারা গুনাহও হয়েছে। কিন্তু তারা গুনাহের ওপর স্থির থাকেন নি। তাওবা করেছেন, গুনাহের পথ থেকে ফিরে এসেছেন। কারো ওপর নেমে এসেছে হদ-কিসাস। একটি সমাজ তার ধারা পরিচালনার জন্য যা-কিছুর মুখাপেক্ষী তার সবকিছুই খুঁজে পাবে সাহাবাসমাজে। রাসুল g শিশু অবস্থায় নবি ছিলেন না ঠিক, কিন্তু তার নবুওয়াতের সময়কালে অসংখ্য শিশু এই পৃথিবীতে ছিলো। রাসুলের ঘরে ছিলো, সাহাবিদের ঘরে ছিলো। শিশু সাহাবি, কিশোর সাহাবি, তরুণ সাহাবি, যুবক সাহাবি। তাদের দৈনন্দিন জীবনাচার, তাদের সাথে রাসুলের আচরণ ইত্যাদি বিষয়ের মাঝে রয়েছে আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য উত্তম শিক্ষা। যা নিখুঁত, মহান এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে স্বীকৃত। এমনকি কখনো কোনো ইজতিহাদি ভুল হলেও আল্লাহ তাআলা ওহি মারফত সে ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।

তথাপি রাসুলুল্লাহ g-এর শৈশব-কৈশোরের সবগুলো বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিতও হয় নি। তখন তো তার পাশে তার সাহাবিরা ছিলেন না, যারা তার প্রতিটি আচরণ-উচ্চারণকে সংরক্ষণ করবেন। যার কারণে সেই সময়ের অনেক বিষয়ই অজানা। উম্মাহর সেই বিষয়গুলোর দিকে মুখাপেক্ষী না বিধায়ই আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন নি। যদি উম্মাহর জন্য তা একান্ত প্রয়োজনীয় হতো, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা সংরক্ষণ করতেন।

পর্যালোচনা: ২

“আজকালকার মা’রা অনেক বেশি ব্যস্ত। অনেক দায়িত্ব; ঘর সামলানো, চাকরি, স্বামীসেবা, অন্যান্য বাচ্চাদের দেখভাল ইত্যাদি। মা আমিনার কাঁধে এত বোঝা ছিল না। সংসার খরচের দায়ভার নিয়েছিলেন দাদা। কুঁড়ি বছর বয়সেই বিধবা আমিনাকে এসব নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা করতে হয়নি। মুহাম্মাদ g যে তাঁর একমাত্র সন্তান ছিলো, এটাও বেশ কাজে এসেছে।” {পৃ. ২০}

পর্যালোচনা:

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটা আমাদের মূল আলোচ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। এখানে এটা উল্লেখ করার কারণ হলো এদিকে ইঙ্গিত করা যে, ‘বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদে’র অংশ হিসেবে এখান থেকে এই মেসেজটা তো অবশ্যই পাওয়া যাচ্ছে যে, মা’রা ব্যস্ত না থেকে সন্তানদেরকে সময় দেয়া সন্তানের ‘স্মার্ট’ হয়ে গড়ে ওঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আচ্ছা, বইয়ের সম্বোধিত পাঠক যারা, তারা কি উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত কথা থেকে এই মেসেজও নেয়ার আশঙ্কা থাকে না যে, “মুহাম্মাদ g যে তাঁর একমাত্র সন্তান ছিলো, এটাও বেশ কাজে এসেছে।” তাই আমরাও যদি সন্তান কম নিই, তাহলে তা আমাদের সন্তানদের প্রোফেট মুহাম্মাদের মতো

স্মার্ট হয়ে গড়ে ওঠার পেছনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে? লেখক কি ইচ্ছাকৃতভাবে এই মেসেজ নেয়ার পথ খোলা রেখেছেন, না অনিচ্ছাকৃতভাবে তা হয়েছে? তবে তিনি যে বিচারেই এ কথা লিখে থাকুন, পাঠকের বিভ্রান্তির দায় কিন্তু এড়াতে পারবেন বলে মনে হয় না।

পর্যালোচনা: ৩

“সন্তানের জন্য বাঁচা: মা আমিনার স্বামী মারা যান ৫৭১ সালে। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র বিশ। তারপররো তিনি কিন্তু আর বিয়ে করেননি। তখনকার সমাজ অবশ্য বিধবাদের খাটো চোখে দেখত না। যাদের বংশ ভালো ছিলো, তাদেরকে উঁচু নজরে দেখত। আমিনার রূপ আর কবিতা আবৃত্তির গুণে চাইলেই তিনি আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারতেন। সমাজ যে তাঁকে এ ব্যাপারে পীরাপীড়ি করেনি, তা কী করে বলি? কিন্তু তিনি বিধবাই থেকে গেলেন। সেই সমাজে বড় পরিবারের আলাদা মর্যাদা ছিল। আমিনার মনেও হয়ত অমন বড় পরিবারের স্বপ্ন ছিল। কিনুত তিনি তাঁর ছেলে মুহাম্মাদের জন্য নিজেকে কোরবান করেছিলেন। শিশু মুহাম্মাদের জীবনকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে নিজের জীবনের সাথে আপোষ করেছিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত মোটেও স্বাভাবিক ছিল না। ছিল প্রথাবিরোধী। বিশ বছর বয়সী এক বিধবা তরুণীর জন্য এই সিদ্ধান্ত যে অনেক কষ্টের ছিল, তা বলাই বাহুল্য।” {পৃ. ২১}

পর্যালোচনা:

সন্তানদেরকে প্রোফেট মুহাম্মাদের মতো স্মার্ট করে গড়ে তোলার জন্য তবে কি যুবতী বয়সে বিধবা হলেও বাকিজীবন বিয়ে না করে থাকাটা সঙ্গত? এতে সন্তান স্মার্ট হয়ে গড়ে উঠলেও মা কি নিশ্চিতভাবে পারবে তার চারিত্রিক পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখতে? ইসলাম এমন মা’কে কি নির্দেশনা দেয়? ইসলামের রুচি-প্রকৃতি এবং আদর্শ-ভাবধারা সঙ্গে

কোনটা খাপ খায়? আমরা কি ইসলামের নির্দেশনার ওপর ইসলামপূর্ব যুগের কারো অবস্থাকে প্রাধান্য দেয়ার অধিকার রাখি? উপরন্তু তিনি যে পুনরায় পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন নি—এর প্রকৃত কারণ কি কোনো বইয়ে উল্লিখিত হয়েছে? তাহলে কিসের ভিত্তিতে উম্মাহকে স্মার্ট হওয়ার ডোজ হিসেবে এই বারতা দেয়া হচ্ছে?

পর্যালোচনা: ৪

“খেলাধুলার গুরুত্ব: ছোট বয়সে তাদের খেলার সময়সীমা কেটে দিবেন না। এমন ভাবার দরকার নেই যে, তারা বড় হয়ে গেছে, এখন আর বেশি খেলার দরকার নেই। আবার সে কোন ধরনের খেলা খেলবে, সেটাও চাপিয়ে দিতে যাবেন না। ওকে ওর মতো খেলতে দিন। মনের মতো। শিশু মুহাম্মাদ g যখন অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে খেলছিলেন, তখন বক্ষবিদারণের সেই বিখ্যাত অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কাজেই খেলাধুলার সময়কে অবমূল্যায়ন করবেন না। শিশুদের বেড়ে ওঠা ও শেখার জন্য এটা পারফেক্ট অপরচুনিটি।” {পৃ. ২৭}

পর্যালোচনা:

“আবার সে কোন ধরনের খেলা খেলবে, সেটাও চাপিয়ে দিতে যাবেন না। ওকে ওর মতো খেলতে দিন। মনের মতো।” ইসলাম কি এ কথা বলে? ইসলামে কি সবধরনের খেলাকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে? খোদ রাসুলুল্লাহ g পর্যন্ত কোনো কোনো খেলা থেকে নিষেধ করেছেন। এমনকি নিজ স্ত্রী আয়িশা i-কেও একধরনের খেলা খেলতে দেখে বারণ করেছেন। খেলাধুলা বিষয়ক অন্যান্য হাদিসও বর্ণিত হয়েছে, যাতে বিশেষ ধরনের কতক খেলাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সাহাবিদের থেকে এমন অনেক আসারও বর্ণিত হয়েছে, যাতে এক সাহাবি অপর সাহাবিকে বিশেষ ধরনের খেলা থেকে নিষেধ করেছেন; যেমন উমর h নিজ সন্তানকে একধরনের খেলা খেলতে দেখে নিষেধ করেন।

যদি অবাধে যেকোনো খেলায় মেতে ওঠার সুযোগ থাকতো, তাহলে মুসলিমদের খেলা কী হবে—এ নিয়ে এতো এতো লেখালেখির কি কোনো প্রয়োজন ছিলো? খেলাধুলা যেভাবে শিশুদের সুন্দর মানসিকতা গড়ে তোলে, বর্তমানে প্রচলিত অধিকাংশ খেলা তাদের মানসিকতাকে কালিমালিপ্ত করে। এ বইয়ের সম্বোধিত পাঠক যারা, তারা সাধারণত ডিভাইসের সামনে বা মাঠে- ময়দানে কোন ধরনের খেলায় অভ্যস্ত—তা তো কারো অজানা নয়। এমতাবস্থায় প্রোফেট মুহাম্মাদের মতো সন্তানকে স্মার্ট করে গরে তুলতে হলে কি খেলাধুলার লাগাম অবুঝ শিশুদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে? আচ্ছা, এর পরিণতি কী হবে?

দ্বিতীয় বিষয় হলো, “শিশু মুহাম্মাদ g যখন অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে খেলছিলেন, তখন বক্ষবিদারণের সেই বিখ্যাত অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কাজেই খেলাধুলার সময়কে অবমূল্যায়ন করবেন না।” রাসুলুল্লাহর বক্ষবিদারণের জন্য সেই সময়কে নির্বাচনের দ্বারা যদি অবাধে খেলাধুলার গুরত্ব অনুমিত হয়, তাহলে তো কেউ স্মার্ট হওয়ার জন্য এর থেকে নিজের মা’কে ছেড়ে সুদূরে থেকে অন্য কারো দুধ পান করা, শহর ছেড়ে গ্রামে থাকা ইত্যাদির গুরুত্বও প্রমাণিত করার চেষ্টা চালাতে পারে। বক্ষবিদারণের ঘটনা থেকে খেলাধুলার গুরুত্ব আদৌ অনুমিত হয় কি? পুরো বইয়েই লেখক ধারণা-অনুমানের পথে হেঁটেছেন। একটা বইয়ের বেশিরভাগ কথাই যদি স্রেফ অনুমানভিত্তিক হয়, তখন তার মান এমনিতেই ক্ষুণ্ণ হয়। উদাহরণ হিসেবে তার অনুমাননির্ভর বাক্যের একটি নমুনা উল্লেখ করছি—“সুতরাং রাসূল g-ও যে এসব ঘটনা (আদিপুরুষের কীর্তি) শুনে থাকবেন সেটা আশ্চর্যের না। হয়ত এসব ঘটনা থেকে তিনি অনুপ্রেরণাও নিয়ে থাকবেন।” অথচ প্রায় সকল বিষয়ে রাসুলুল্লাহ g-এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের পন্ডিতদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করলেও অনুসরণীয় সিরাতের উল্লেখযোগ্য কিছু বইয়ে উল্লিখিত হয় নি। যা’হোক, এটা আমাদের মূল প্রসঙ্গ না। তবে বইটির তথাকথিত ‘ক্লাস’ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবশ্যই এটাও একটি প্রসঙ্গ।

এখানে আরেকটি বিষয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, লেখক বইয়ের বিভিন্ন স্থানে যেভাবে আলোচনা করেছেন, তাতে এ কথাই স্পষ্ট হচ্ছে না যে, তিনি আসলে কার জীবনকে আদর্শ মানছেন? রাসুলের ব্যক্তিজীবনকে? তার মা চাচা দাদীর জীবনকে? জাহেলি যুগের এর-ওর জীবনকে? ঘটনা যা-কিছু পেয়েছেন, সবগুলো থেকেই কোনো না কোনো মেসেজ বের করে এনেছেন। এরকম মেসেজ বের করতে তো সেই জাহেলি যুগ পর্যন্ত যাওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না। আমাদের সমাজেও তো ভালো মানুষের সংখ্যা একেবারে কম নয়। সকল ভালো মানুষকে নিয়েই তো তাহলে বই লিখতে হয়। আর তাদের সবার জীবনকে আদর্শ এবং স্মার্ট হওয়ার মাপকাঠি হিসেবে ঘোষণা দিতে হয়।

আরেকটি বিষয় হলো, লেখক তার আলোচনাপ্রসঙ্গে কখনো জাহেলি যুগের বিভিন্ন আচাররীতি তুলে এনেছেন। সেখান থেকে অনেক শিক্ষাও বের করে এনেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি জাহেলি যুগের জাহিলিয়াত চিহ্নিত করার জন্য কোনো শব্দই ব্যবহার করেন নি। ফলে বইয়ের পাঠকরা যে স্তরের, তাতে তারা সেই বিষয়টিকে অন্যায় হিসেবে নাও চিনে থাকতে পারে; বরং আরো দশটি বিষয়ের মতো সেটাকেও একটা সাধারণ বিষয় হিসেবেই নিতে পারে। যেমন একটি উদ্ধৃতি—"তো তার কিছু বন্ধু তাকে বললেন, গণকের কাছে যেতে হবে। সে হয়ত তাকে মানসম্মান বাঁচিয়ে কোনো বিকল্প বলে দেবে। তিনি গেলেন। গণক বলল ছেলের বদলে ১০০ উট কুরবানী দিতে। তিনি তা-ই করলেন।"

আর তাছাড়া ইতিহাস বলে, গণক ১০০ উট কুরবানি দিতে বলেছে—বিষয়টি ঠিক এমন নয়। আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া থেকে ঘটনার এই অংশটি দ্রষ্টব্য—

أشارت قريش على عبد المطلب أن يذهب إلى الحجاز فإن بها عرافة لها تابع، فيسألها عن ذلك، ثم أنت على رأس أمرك إن أمرتك بذبحه فاذبحه، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه مخرج قبلته، فانطلقوا حتى أتوا المدينة فوجدوا العرافة - وهي سجاح - فيما ذكره يونس بن بكير عن ابن إسحاق بخيبر، فركبوا حتى جاؤها فسألوها وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه.

فقالت لهم: ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله، فرجعوا من عندها، فلما خرجوا قام عبد المطلب يدعو الله، ثم غدوا عليها.

فقالت لهم: قد جاءني الخبر، كم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من الإبل، وكانت كذلك.

قالت: فارجعوا إلى بلادكم، ثم قربوا صاحبكم، وقربوا عشرا من الإبل، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم، ونجا صاحبكم، فخرجوا حتى قدموا مكة، فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبد المطلب يدعو الله، ثم قربوا عبد الله وعشرا من الإبل.

ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا، فلم يزالوا يزيدون عشرا عشرا، ويخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الإبل مائة، ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل، فقالت عند ذلك قريش لعبد المطلب وهو قائم عند هبل يدعو الله: قد انتهى رضي ربك يا عبد المطلب.

[illegible]: [illegible]

“[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]”

[illegible], [illegible] g [illegible], “[illegible], [illegible]”[5]

[illegible]: [illegible]

“রাসূল g যে বিশেষ কিছু সেটা শিশু বয়সেই তাঁর মা ঠাহর করেছিলেন। মা’র ধারণা কখনো ভুল হয় না।” {পৃ. ৭২}

নবির ধারণাই যদি ভুল প্রমাণিত হতে পারে, সেখানে মা’র ধারণা কখনো ভুল না হয়ে কী উপায়? তা’বিরুন নাখল এবং বদরযুদ্ধের বন্দিদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ g-এর ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছিলো। মা’র ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ হয়—এটা ঠিক হলেও তার ধারণা কখনো ভুল নয়—এটা বাস্তবসম্মত নয়। এটা হয়তো লেখকের ভুল কিংবা অসতর্কতা। তবে বিষয়টা যেহেতু বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত, তাই অবশ্যই সতর্কতা কাম্য।

পর্যালোচনা: ৭

“রাসূল g একবার বলেন—‘আমি একবার কুরাইশ ছেলেদের সাথে ছিলাম। একটা শিকারের জন্য পাথর বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা সবাই নগ্ন ছিলাম। কারণ, সবাই তাদের কটিবস্ত্র ঘাড়ে করে নিয়ে পাথর বহন করছিল। আমিও তাই করছিলাম। ওভাবে যখন হাঁটছিলাম, তখন কে যেন আমাকে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মেরে বলল, ‘কটিবস্ত্র পরো’। আমি তখন পরে নিলাম। খালি ঘাড়েই পাথর নিয়ে নিলাম। সেই গ্রুপে কেবল আমিই ছিলাম যে কটিবস্ত্র পরেছিল’।” {পৃ. ৭৪}

এমন কিম্ভূতকিমাকার বর্ণনা, যা অনেকগুলো বিষয়কে আক্রান্ত করছে। বইয়ের বিজ্ঞ অনুবাদক এবং প্রকাশকের কাছে এর তথ্যসূত্র ও বিশুদ্ধতা জানার ইচ্ছে হয়। আশা করি, বিষয়টি তারা জানাবেন। আর এই বর্ণনাটিতে কী কী সমস্যা—তা ইন শা আল্লাহ তাদের রিপ্লাইয়ের পরই আলোচনায় আসবে।

পর্যালোচনা : ৮

“নবি g নিজে এ ব্যাপারে বলেন, ‘ইসলামপূর্ব যুগে মানুষরা যেভাবে নারীদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলো, আমি তেমন ছিলাম না। তবে দু’রাত বাদে। সেই দু’রাতে আল্লাহ আমাকে সুরক্ষা করেছিলেন।” {পৃ. ৭৫}

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, রাসুলুল্লাহ g দু’রাতে নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আচ্ছা, প্রথমে বি স্মার্টের লেখক ড. হিশাম আল-আওয়াদির বক্তব্য লক্ষ করুন—“তাঁর ব্যাপারে আমি যেসব কাহিনি উল্লেখ করেছই, সেগুলো অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণিত দলিল থেকে নিয়েছি। অন্যান্য কিছু বইয়েরও সাহায্য নিয়েছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—১. আকরাম উমারী। আস-সীরাহ আন-নাবাউইয়্যাহ আস-সাহীহাহ, ২য় খণ্ড। ...”

উপরিউক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর শায়খ আকরাম উমারী কিন্তু এর ‘যয়িফ’ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তার বক্তব্য দেখুন—

وقد وردت روايات ضعيفة تفيد أن الله تعالى عصمه من سماع ومشاهدة الأعراس فى صباه يوم أن كان يرعى الغنم. (السيرة النبوية الصحيحة (1/114))

অনুবাদক এবং প্রকাশক ভাইরা যাকে মহান ইমাম হিসেবে একবাক্যে স্বীকার করেন, সেই শায়খ আলবানি রহ.ও ফিকহুস সিরাহর তাখরিজে এবং দিফা‘ আনিল হাদিসিন নাবাবিতে বর্ণনাটিকে ‘যয়িফ’ বলেছনে। ইবনু কাসির রহ. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া (১/৭২৫)-এ বলেন—

و هذا حديث غريب جدا و قد يكون عن على نفسه و يكون قوله في آخره مقحما

فما رأيكم ؟

মূল লেখক, অনুবাদক এবং প্রকাশক যে চিন্তাধারার মানুষ এবং বইটি সম্পর্কে মুখেও তারা যে দাবি করেছেন, তাতে এ ধরনের বর্ণনার উল্লেখ যে-কোনো পাঠককে বিস্মিত করবে।

তারচে'ও বড় কথা হলো, এই বর্ণনাটিকে উনারা যেভাবে অনুবাদ করেছেন, তাতে তো আরো বিস্মিত হতে হয়। মূল বর্ণনার সাথে অনুবাদটিকে একবার মিলিয়ে দেখতে পারেন, এরপর সাধুদের কথিত বিজ্ঞতার ব্যাপারে ধারণা নিতে পারেন —

ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به ، إلا مرتين من الدهر ، كلتيهما يعصمني الله منهما

কোথায় নারীর কথা আর কোথায় দু'রাতে সেক্স জাগ্রত হওয়ার কথা?

{প্রয়োজনে চলবে ইন শা আল্লাহ}

[1] জামিউ বায়ানিল ইলম : ১০৯৭

[2] সুরা কাহাফ : ১১০

[3] সুরা মুমতাহিনা : ৬

[4] সুরা আহযাব : ২১

[5] সহিহ বুখারি : ৪৬৬, ৪৬৭, ৩৬৫৪, ৩৬৫৬, ৩৯০৪; সহিহ মুসলিম : ৫৩২, ২৩৮২, ২৩৮৩

একটি পর্যালোচনা - ২ঃ বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ

ALI HASAN OSAMA·SATURDAY, DECEMBER 16, 2017

পর্যালোচনা : ৯

“আমি জানি না এই সফরে সফরকারীরা কীভাবে সময় কাটিয়েছেন। কী কী দর্শনীয় স্থান তারা দেখেছিলেন, তবে নিচের জিনিসগুলো দেখার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে : ......বিভিন্ন সমাজ ও ধর্ম : হিজাজের মূর্তিপূজারি, মদিনার ইহুদি গোষ্ঠী, লাখমিদ, বনু জুদহাম ও গোত্রের খ্রিষ্টান আরব ও সন্ন্যাসীরা, যার মধ্যে একজন ছিল বাহিরা। ......সিরিয়া সফরের মাধ্যমে রাসূল নিজে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থানগুলো দেখেছেন। তাঁর চাচার সাথে বিভিন্ন বাজারে ঘুরে ঘুরে নানান সংস্কৃতি, ভাষা ও প্রথার মুখোমুখী হয়েছেন। বাহিরা সন্ন্যাসীর সাথে দেখা হয়েছে। নিজের থেকে ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের মেশা ও

অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কিশোর-কিশোরীদের উন্মুখ হয়ে থাকা দরকার। যেগুলো তাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করবে সবসময় সেসব খুঁজা উচিত তাদের।” {পৃ. ৭৯-৮০}

বিজ্ঞ লেখক যদিও প্রথমে ধারণামূলক বাক্য ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ বিষয়ে তার সুনিশ্চিত জ্ঞান নেই। ‘আমি জানি না এই সফরে সফরকারীরা কীভাবে সময় কাটিয়েছেন। কী কী দর্শনীয় স্থান তারা দেখেছিলেন, তবে নিচের জিনিসগুলো দেখার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।’ কিন্তু দু-চার ছত্র পরেই কীভাবে যেনো স্বয়ংক্রিয়ভাবে তিনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন, দ্ব্যর্থহীন শব্দে ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং এর থেকে টিনএজদের জন্য শিক্ষা বের করে আনলেন। “সিরিয়া সফরের মাধ্যমে রাসূল নিজে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থানগুলো দেখেছেন। তাঁর চাচার সাথে বিভিন্ন বাজারে ঘুরে ঘুরে নানান সংস্কৃতি, ভাষা ও প্রথার মুখোমুখী হয়েছেন। বাহিরা সন্ন্যাসীর সাথে দেখা হয়েছে। নিজের থেকে ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের মেশা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কিশোর-কিশোরীদের উন্মুখ হয়ে থাকা দরকার। যেগুলো তাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করবে সবসময় সেসব খুঁজা উচিত তাদের।”

রাসুলুল্লাহ -এর নবুওয়াতপূর্ব এ বিষয়টি উল্লেখ করার দ্বারা তিনি আমাদের উঠতি প্রজন্মকে বিভিন্ন ধর্ম-সংস্কৃতির মানুষদের সাথে মেশার জন্য এবং তাদের সান্নিধ্য থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য দাওয়াত দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে শরিয়াহর ভিন্ন কোনো শিক্ষা আছে কি না—এ বিষয়টি দেখার কোনো প্রয়োজনীয়তা আদৌ তিনি অনুভব করলেন না। মুক্তমনা মুসলিম অনুবাদক হয়তো এর জন্য রেডিমেড অজুহাত দেবেন—“এটা ফিকহের বই নয়। এটাকে ফিকহ থেকে বেরিয়ে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পড়তে হবে।” আমরা আমাদের জীবনকে কীভাবে গড়বো, কোন কোন জিনিস করবো আর কোন কোন জিনিস ছাড়বো—তাও ফিকহ ছাড়া আলাদা কিছু থেকে আমাদেরকে জানতে হবে বুঝি! আচ্ছা, সেই জিনিসটা কী? পাশ্চাত্যনীতি? হায়রে উর্বর মস্তিষ্ক! কাকে বলে ফিকহ আর ফিকহুস সিরাহ, কী তার

[illegible]

[illegible]

“[illegible]” {[illegible]}

[illegible]

وأما مخالطته للكفار ، فليست العلة في منع مخالطة الكفار هي الخوف من الوقوع في الكفر فقط ، بل مِنْ أظهرِ عِلَلِ هذا الحكم : عداوتُهم لله ورسوله والمؤمنين ، وقد أشار الله تعالى إلى هذه العلة بقوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ) الممتحنة/1 .

فكيف يليق بمسلم أن يصاحب عدو الله وعدوه ويصادقه ؟!

ثم مِنْ أين يأمَنُ هذا مِنِ استحسانِ طريقتهم ومذهبهم ؟ وقد وقع كثير من المسلمين في الكفر والإلحاد وارتدوا عن الإسلام بسبب مصاحبتهم للكفار ، وإقامتهم في بلدانهم . فبعضهم تَهَوَّدَ ، وبعضهم تَنَصَّر ، وبعضهم اعتنق مذاهب فلسفية ملحدة .

“কাফিরদের সঙ্গে মেলামেশা নিষিদ্ধ করার কারণ এ নয় যে, কুফরে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা; বরং এই বিধানের অন্যতম সুস্পষ্ট কারণ হলো, আল্লাহ, তার রাসুল এবং মুমিনদের জন্য তাদের শত্রুতা। আল্লাহ তাআলা নিজেই এই কারণের দিকে এ আয়াতের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন—

“হে মুমিনরা, তোমরা আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধু বানিও না যে, তাদের কাছে ভালোবাসার বার্তা পৌঁছাতে শুরু করবে, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তারা তা এমনই প্রত্যাখ্যান করেছে যে, রাসুলকে এবং তোমাদেরকেও কেবল এই কারণেই বের করে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছো।” (সুরা মুমতাহিনা : ১)

সুতরাং কোনো মুসলিমের জন্য কীভাবে সঙ্গত হবে আল্লাহ এবং তার শত্রুর সঙ্গ গ্রহণ করা এবং তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়া?

এরপর কথা হলো, সে কীভাবে এ ব্যাপারে নির্ভয় হবে যে, সে তাদের মতাদর্শ এবং ধর্মকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে না? অনেক মুসলমান কাফিরদের সঙ্গ গ্রহণ করার কারণে এবং তাদের দেশে অবস্থানের কারণে কুফর এবং নাস্তিকতায় পতিত হয়েছে এবং ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে। তাদের কেউ ইহুদি হয়েছে, কেউ খ্রিষ্টান হয়েছে আর কেউ নাস্তিকতামূলক দার্শনিক মতাদর্শ গ্রহণ করেছে।”[1]

বি স্মার্টের লেখকের উদ্দেশ্য আরো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তার পরবর্তী পৃষ্ঠার ‘টেবিলের’ বক্তব্য থেকে—

“রাসুল ﷺ সিরিয়ায় সফর করেছিলেন। সেই কাফেলায় তিনি ছিলেন সবচেয়ে কমবয়স্ক। —নিজেকে নতুন রোমাঞ্চের সামনে উন্মোচিত করুন যা দেখেন তা দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলিকে সমৃদ্ধ করুন।” {পৃ. ৮১}

রাসুলুল্লাহ -এর সিরিয়া সফর থেকে বিজ্ঞ লেখক যে শিক্ষা বের করলেন, তা অনেক মুসলিমের বিপথগামিতার পথ খুলে দিচ্ছে—তার জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে। আর প্রত্যেক মুসলিমই ভালো-মন্দ গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীন নয়। প্রত্যেকের বিবেকও তাকে সৎ এবং উপযুক্ত নির্দেশনা দেয় না। এর জন্য প্রয়োজন ইলম এবং ফিকহের। প্রয়োজন আরো অনেক কিছু। লেখক বলেন—

"আপনার অভ্যন্তরীন ভয়েস ও বিবেক আপনাকে বলে দিক কোনটা খারাপ কোনটা ভালো। আস্থাভাজন থাকুন। এমনকি যদি বাবা-মা বা অন্য জ্ঞানী কারও তত্ত্বাবধান থেকে দূরে থাকুন তবুও।" {পৃ. ৮১} হাঁ, এই আভ্যন্তরীণ ভয়েসই অনেককে বিভ্রান্ত করতে পারে সহজেই।

পর্যালোচনা : ১০

"বন্ধুবান্ধব : খুব সতর্কতার সাথে রাসূল g তাঁর বন্ধুদের বাছাই করেছেন। সুশিক্ষিত শ্রদ্ধাবান লোকদের বন্ধু হয়েছেন। আমরা এখন রাসূল g-এর কিছু বন্ধুবান্ধবদের নিচে তুলে ধরব—

......জাব্রা আর-রুমি : সুশিক্ষিত, বহুভাষী খ্রিষ্টান, ধর্মগ্রন্থের প্রতি জ্ঞানের ব্যাপারে যিনি জ্ঞানী ছিলেন। আগেই বলেছি, আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারে বলেন, 'তারা বলে, নবিকে তো কেবল একটা লোক এসব শেখায়'। আন নাহল : ১০৩। রাসূল g আরব, বিদেশি, মূর্তিপূজারি ও খ্রিষ্টানদের সাথে মিশেছেন। বিভিন্ন বয়সী বন্ধু ছিল তাঁর।" {পৃ. ৯১}

আয়িশা i বলেন, 'রাসুল -এর চরিত্র ছিলো আল-কুরআন'। আল-কুরআন তো 'মিল্লাতে ইবরাহিমে'র শিক্ষা দেয়, 'আলওয়ালা ওয়াল বারা'র শিক্ষা দেয়; আল-কুরআন তো কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার শিক্ষা দেয়

না। তাহলে কি রাসুলুল্লাহ -এর সিরাত এবং আল-কুরআনের মাঝে বৈপরীত্য বিদ্যমান? এমনই যদি হয়, তাহলে আল্লাহ কেনো তার জীবনকে উম্মাহর জন্য আদর্শ তথা মডেল হিসেবে ঘোষণা করলেন?

বিজ্ঞ লেখক কতোটা সুকৌশলে ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকিদা ‘আলওয়ালা ওয়াল বারা’র গলায় ছুড়ি চালিয়েছেন এবং প্রিয় রাসুলুল্লাহ g-এর ওপর মিথ্যাচার করেছেন? যে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য একটা বইয়ে বারবার রাসুলুল্লাহ g-এর ওপর মিথ্যাচার করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না, তার বই পড়ে উম্মাহকে স্মার্ট হতে হবে? হায়, এসব উর্বর মস্তিষ্কের জন্য একরাশ সমবেদনা জ্ঞাপন ছাড়া আর কীইবা করার আছে?

এই পয়েন্টটা নিয়ে ইলমিভাবে পর্যালোচনা করা হলে তা-ই স্বতন্ত্র পুস্তকে পরিণত হবে। কিন্তু এরপরও দেখা যাবে, যে মানার সেই মানবে, আর যে অহংবোধে আক্রান্ত হয়ে সত্যকে নেভাতে তেড়ে আসার সে তখনও আসবে।

পর্যালোচনা : ১১

“আসলে, তাঁর ধর্মবিশ্বাস সেসব সংখ্যালঘু ধার্মিকদের কাছাকাছি ছিল যারা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করত। আবার এটাও কিন্তু অন্ধনুকরণের কারণে না। যেমন কিছু মানুষ কৌতূহলবশে অন্যান্য ধর্ম পরখ করে দেখে; বরং কিশোর বয়সে বাহিরা সন্ন্যাসীর সাথে তাঁর সেই কথোপকথন থেকে বুঝা যায়, তখনকার সেই বিশ্বাস বাড়তে বাড়তে এই অবস্থায় এসেছে।

ধর্মচর্চা: নবি হওয়ার আগে রাসুল g কোনো ধরনের ইবাদত করতেন কিনা সে ব্যাপারে তেমন জানা যায় না। মক্কার একেশ্বারবাদী ও বহুঈশ্বরবাদীরা যেসব উপাসনা করত, তার মধ্যে কিছু ছিল এক। যুগ যুগ

ধরে নবি ইবরাহীম (আ) যেসব উপাসনা করতেন সেগুলোরই কিছু রূপ অবশিষ্ট ছিল। এগুলোর মধ্যে ছিল—

প্রার্থনা: হাঁটুগেড়ে বসা এবং সিজদা করা যাইদ ইব্ন্ আমর এ ধরনের সিজদা করতেন বলে জানা যায়। সিজদায় তিনি বলতেন, ‘ইবরাহীম যার কাছে আশ্রয় চাইতেন, আমিও তাঁর কাছে আশ্রয় চাই’।

উপবাস: কুরাইশরা মুহাররাম মাসের দশ তারিখ উপবাস থাকত।

হজ্জ: রাসূল g কাবা তাওয়াফ করেছেন। সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে হেঁটেছেন। আরাফাতের ময়দানে দাঁড়িয়েছেন। এগুলো সবই হজ্জের অংশ। তবে যেসব ধর্মীয় রীতিগুলো স্পষ্টভাবে কুরাইশদের ছিল, তিনি সেগুলো করেননি।

নির্জন সময় কাটানো: কুরাইশরা কখনো কখনো নির্জনতায় যেত প্রার্থনা করার জন্য। ইসলামে আসার আগে ওমর ইবনুল খাত্তাব কাবায় যেয়ে নির্জনে সময় কাটাতেন।

যেগুলোকে তিনি ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের অংশ দেখেছেন, সেগুলো নিয়েছেন। এগুলো পরে ইসলামে নিয়ে নেওয়া হয়।” {পৃ. ৯৬}

বিজ্ঞ লেখক প্রথমে বললেন, “নবি হওয়ার আগে রাসূল g কোনো ধরনের ইবাদত করতেন কিনা সে ব্যাপারে তেমন জানা যায় না।” ভালো কথা। কিন্তু তিনিই কীভাবে দু’লাইন পরেই এ ব্যাপারে জেনে ফেললেন, যে ব্যাপারে মাত্রই বললেন যে, কোনো ধরনের ইবাদত আদৌ করতেন কিনা তা-ই নাকি জানা যায় না। তিনি নিজেই বলছেন, রাসূল g হজ্জ করতেন, নির্জনে সময় কাটাতেন। আর পূর্বেই বলে এসেছেন, এগুলো ছিলো ইবরাহিম n-এর শরিয়াহর অবশিষ্ট রূপ। জানি না, এ লাইনগুলো লেখার সময় তার মতিভ্রম হয়েছিলো কি না।

লেখক বলছেন, “কিশোর বয়সে বাহিরা সন্ন্যাসীর সাথে তাঁর সেই কথোপকথন থেকে বুঝা যায়, তখনকার সেই বিশ্বাস বাড়তে বাড়তে এই অবস্থায় এসেছে।” কিশোর বয়সের মুহাম্মাদের যে বিশ্বাস ছিলো, তা-ই নাকি বাড়তে বাড়তে ইসলামে পরিণত হলো। বিধর্মীরা তো এমনটাই দাবি করে থাকে। তারা অলৌকিকতায় বিশ্বাস করতে চায় না। তারা সবকিছুকে বাহ্যিকভাবে ব্যাখ্যা করে। মু‘জিযাকে বিশ্বাস করে কি করে না তা অবশ্য তাদের অনেকেই পরিষ্কার করে না। তারা রাসুলুল্লাহ g-এর যুদ্ধজয়ের বিষয়গুলোর পেছনেও আল্লাহ তাআলার নুসরত ও মদদকে হাইলাইট না করে কারণ হিসেবে বাহ্যিক বিভিন্ন প্রস্তুতি ও কৌশলকে চিহ্নিত করে থাকে। এক্ষেত্রে পুরো লেখায় অলৌকিকতার কথা ভুলেও মুখে আনে না। এটা প্রাচ্যবিদদের পুরোনো কৌশল। সূক্ষ্ম বিষ। যুদ্ধজয়ের কারণ বর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের এই লেখকও অনেকটা একই পথে হেঁটেছেন। জানি না, বুঝে করেছেন নাকি না বুঝেই এতে লিপ্ত হয়েছেন।

যেগুলোকে তিনি ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের অংশ দেখেছেন, সেগুলো নিয়েছেন। এগুলো পরে ইসলামে নিয়ে নেওয়া হয়। এ তো এমন এক জঘন্য কথা, যে ব্যাপারে কিছু লিখতেও প্রবৃত্তি হয় না। তিনি কি স্মার্ট পাঠকদের কাছে এই মেসেজ দিতে চাচ্ছেন যে, সে যুগের কতক সত্যপন্থীদের মতো কিশোর মুহাম্মাদের সরল বিশ্বাস উন্নতি লাভ করে ধীরে ধীরে চল্লিশোর্ধ্ব মুহাম্মাদের বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয় এবং ইসলামি বিশ্বাস মূলত সেই বিশ্বাসেরই নাম। আর শরিয়াহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রোফেট মুহাম্মাদ সেসময়ে মক্কায় প্রচলিত এবং ইবরাহিম n-এর শরিয়াহর অংশ হিসেবে পরিচিত বিধানগুলোকে নিয়ে এগুলোকে ইসলামি বিধান বলে অভিহিত করেন। হাঁ, এর সাথে আরো কিছু যুক্ত করেছেন—তা তো স্পষ্ট।

প্রাচ্যবিদদের ধারাও এমন। এজন্যই প্রাচ্যবিদদের ব্যাপারে উম্মাহর বিদগ্ধগণ কুফফার গোষ্ঠীর থেকেও অধিক সতর্ক করেন। কারণ,

সূক্ষ্ম বিষগুলোকে ধরতে না পেরে অনেক সরলমনা পাঠকই অজান্তে হারিয়ে যায় এবং তার আদর্শ মুমিন -সত্তা মরে যায়।

পর্যালোচনা : ১২

শান্তি : মুসলিম -অমুসলিমদের লেখা কিছু জীবনীতে রাসূল g-এর জীবনের জিহাদগুলোতে বেশি নজর দেওয়া হয়। কিন্তু রাসূল g-এর গোটা জীবনে খুব কম অংশ জুড়েই ছিল জিহাদ। তিনি সন্তানসন্ততি আর নাতিদের নিয়ে স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন কাটিয়েছেন। তার সরল -সিধা জীবন ও আড়ম্বরহীনতার কারণে সবাই তাকে ভালোবাসতেন। জিহাদ ছিল তাঁর সর্বশেষ পন্থা। যখন কোনো উপায় ছিল না , তখন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যুদ্ধে নামতেন। {পৃ . ১৩০}

বিজ্ঞ লেখক তো রাসূলুল্লাহ g-এর জন্মদিন থেকে শুরু করে মৃত্যুদিবস পর্যন্ত গোটা সময়কে আদর্শ হিসেবে বিশ্বাস করেনে এবং প্রচার করেন , বক্ষ্যমাণ বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ও সেই জীবন থেকে শিক্ষা বের করে বর্তমান প্রজন্মকে স্মার্ট করে গড়ে তোলা , রাসুলুল্লাহ -এর নবুওয়াতপূর্ব জীবন থেকে এমন সব ভয়াবহ বিধান সাব্যস্ত করেন , যা কিনা খোদ কুরআনের সঙ্গেই সাংঘর্ষিক , তাই তিনি রাসুলুল্লাহ -এর অনুসরণীয় জীবনের বড় অংশেই জিহাদ খুঁজে পান না। অথচ ন্যায়নিষ্ঠ যে -কোনো সিরাতপাঠক রাসুলুল্লাহ -এর অনুকরণীয় জীবনের বড় অংশেই জিহাদ খুঁজে পাবেন। কারণ , রাসুলুল্লাহ -এর নবুওয়াতি জীবনের সময়কাল হলো তেইশ বছর। প্রথম তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরই তিনি নবি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে রাসুল হন এবং প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে শুরু করেন। মক্কায় রাসুলুল্লাহ -এর দশ বছরের জীবনে জিহাদ ছিলো না ঠিক , কিন্তু মদিনার পুরো সময়টিই তো জিহাদপূর্ণ ছিলো; যার সময়সীমা হলো দশ বছর। রিসালাহর বিশ বছরের দশটা বছরই যদি কেউ জিহাদের মহান খেদমত আঞ্জাম দেয়ার কাজে রত থাকেন , এমনকি তার

তিরোধানের সময়ও এক বাহিনী যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন , এরপরও কি কেউ তার জীবনের বড় অংশ জিহাদশূন্য দেখতে পায় ? “মুসলিম - অমুসলিমদের লেখা কিছু জীবনীতে রাসূল -এর জীবনের জিহাদগুলোতে বেশি নজর দেওয়া হয়। কিন্তু রাসূল -এর গোটা জীবনে খুব কম অংশ জুড়েই ছিল জিহাদ। তিনি সন্তানসন্ততি আর নাতিদের নিয়ে স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন কাটিয়েছেন। ” হায় !

“জিহাদ ছিল তাঁর সর্বশেষ পন্থা। যখন কোনো উপায় ছিল না , তখন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যুদ্ধে নামতেন। ” প্রতিরোধমূলক জিহাদের ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রযোজ্য হলেও আক্রমণাত্মক জিহাদের ক্ষেত্রে তা কি আদৌ বাস্তব ? কে তাদেরকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র এবং গোত্রগুলোর ওপর আক্রমণ করতে বাধ্য করেছিলো যে , এ কথা বলা হবে , তাদের এছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

ফিকহুল জিহাদ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে নীরব থাকাটাই সঙ্গত। কিন্তু এভাবে ভুল ব্যাখ্যা দেয়ার তো কোনো অর্থ নেই। জিহাদ অবশ্যই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু বিষয়টাকে তিনি যে আঙ্গিকে চিত্রিত করেছেন , তা তো শুধু তাদের পক্ষেই মানা সম্ভব , যারা ইসলামের আক্রমণাত্মক জিহাদকে অস্বীকার করে।

প্রয়োজনে চলবে ইন শা আল্লাহ ...

[1] https://islamqa.info/ar/59879

‘হালাল বিনোদন ’ : মর্মরে বাজে ভিন্ন কিছুর প্রতিধ্বনি

ALI HASAN OSAMA·FRIDAY, DECEMBER 22, 2017

কিছু ভাই এ বইটার ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। তাদের উদ্দেশেই মূলত এ লেখা। পুরো লেখার সারকথা হলো , বইটির কিছু বিষয়

আমার খটকা লেগেছে। যার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করেছি। এ বিষয়গুলো বাদ দিলে বইটি অসুন্দর নয়। এটা কোনো দালিলিক পর্যালোচনা নয়। ব্যক্তিগত অনুভূতি মাত্র।

কয়েকটি খটকা:

আমরা এখানে বইয়ের কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করবো, যেগুলো আমার কাছে খটকা লেগেছে—

1. লেখক বই লিখেছেন হালাল বিনোদন প্রসঙ্গে। তিনি জায়গায় জায়গায় সেসকল স্কলারদেরকে ঝেড়েছেন, যারা ইসলামকে বিনোদনকে থেকে আলাদা করে উপস্থাপন করেছেন। তার বক্তব্য—“বিনোদনের ব্যাপারে চরম অবস্থানের আরেক প্রান্তে রয়েছেন ধর্মনিষ্ঠ মুসলিমেরা। তারা আল্লাহকে ভয় করেন ঠিকই, তবে বিনোদনের মাধ্যমগুলোর ব্যাপারে সঠিকভাবে জানা না-থাকার কারণে কিংবা কোনো নির্দিষ্ট মাজহাব বা আলেমকে অন্ধ অনুসরণের ফলে বিনোদনের পুরো ধারণাটাকেই তারা নাকচ করে দেন।” {পৃ. ১১} অন্যত্র তিনি বলেন, “ বিনোদনের বৈধতা প্রমাণে আমি এখন কিছু সাধারণ প্রমাণ উল্লেখ করছি। অজ্ঞতাবশত যাঁরা বিনোদনের প্রায় সব মাধ্যমকেই হারাম বলে ঘোষণা করেছেন, এই প্রমাণগুলো তাঁদেরকে ভাবনার খোরাক দেবে বিনোদনের ব্যাপারে। বিনোদনের সকল মাধ্যমকে হারাম ঘোষণার মাধ্যমে তাঁরা ইসলামকে যেমন নিজেদের জন্য কঠিন বানিয়ে ফেলেছেন তেমনি কঠিন বানিয়ে ফেলেছেন অন্যান্যদের জন্যও।” {পৃ. ২৫}

এই কথাটা পড়ার পর একটু কেমন যেনো লাগলো। এমন আলিমও কি আছেন, যিনি বিনোদনের সকল প্রকারকে হারাম ঘোষণা করতে পারেন! আচ্ছা, তাহলে বিনোদন কী জিনিস? কেনোইবা একদল আলিম বিনোদনমাত্রকেই হারাম বলছেন, আর লেখক সেই বিনোদনের বড় অংশকেই হালাল প্রমাণের চেষ্টায় বই

লিখেছেন। অবশেষে বিনোদনের সংজ্ঞা লেখকের যবানিতেই পেয়ে গেলাম — “যা-কিছু মানুষকে একটু আনন্দ করার, অবসর সময় কাটানোর সুযোগ দেয় সেটাকেই বিনোদন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।” হালাল বিনোদনের দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি যা যা এনেছেন এবং যেগুলোর ব্যাপারে বিস্তর আলোচনা করেছেন, তার কয়েকটি এই—‘বই পড়া, পরিবারের সাথে সময় কাটানো, আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, শরীর চর্চা, সাঁতার কাটা, বিশ্রাম নেওয়া, স্ত্রী-সহবাস ইত্যাদি’। আচ্ছা পৃথিবীর কোন স্কলার এসকল বিনোদনকে হারাম বলেছেন? জানতে বড় ইচ্ছা করে। যদি তারা ঢালাওভাবেই বিনোদনকে হারাম বলে থাকেন, তাহলে তাদের বিনোদনের সংজ্ঞা আর লেখকের সংজ্ঞা কি একই? যদি তা না হয়, তাহলে তিনি কেনো এভাবে সকলের ওপর মিথ্যাচার করলেন? এমন একজন আলিমও কি দেখানো সম্ভব, যিনি ‘বই পড়া, পরিবারের সাথে সময় কাটানো, আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, শরীর চর্চা, সাঁতার কাটা, বিশ্রাম নেওয়া, স্ত্রী-সহবাস ইত্যাদি’কে হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন? মিথ্যাচার করে ক্রেডিট নেয়ার কী প্রয়োজন?

2. “ শো দেখা কিংবা র্যাম্প মডেলদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা এগুলোও একইভাবে বাতিল ক্যাটাগরিভুক্ত। মোদ্দাকথা বিনোদনের যেসব মাধ্যমের সাথে বিপরীত লিঙ্গের দিকে কামনার দৃষ্টি জড়িয়ে আছে, সেগুলো সবই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।” {পৃ. ৩৩} বিনোদনের যেসব মাধ্যমের সাথে বিপরীত লিঙ্গের দিকে কামনার দৃষ্টি জড়িয়ে আছে, সেগুলো সবই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ আর যেগুলোতে কামনামুক্ত দৃষ্টি জড়িয়ে আছে সেগুলোর কী বিধান? বইয়ে তিনি হারাম বিনোদনের লম্বা তালিকা দিয়ে বলেছেন, এর বাইরে সবই হালাল। সেই তালিকায় ভিন্ন লিঙ্গের দিকে কামনামুক্ত দৃষ্টির কথা নেই। তাহলে কি ধরে নেবো যে, কামনা ছাড়া ভিন্ন লিঙ্গের কাউকে দেখা যাবে? হাঁ, এটা হয়তো লেখক মহোদয়ের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এ থেকে কেউ ভিন্ন মেসেজ নেয়ার পথ হয়তো খোলা রয়েছে।

3. বাদ্যযন্ত্র ও অসাধু গান শিরোনামে লেখক আলোচনা করেন, বাদ্যযন্ত্র অনুমোদিত কি না এটা নিয়ে আজ তুমুল তর্ক বাধে। অবিশ্বাসী কাফেররা যেসব সঙ্গীত চর্চা করে, তাদের গানে যেসব বিষয়বস্তু ও কথা তুলে ধরে, সেগুলোর কারণে সাধারণভাবে এগুলো হারাম। কিন্তু বাদ্যযন্ত্র যদি অনুমোদিত কথার সাথে ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে সেটা হালাল কি না এটা নিয়েই মূল দ্বন্দ্ব। এরপর তিনি এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে এবং এতে হারাম-ফতোয়াপ্রদানকারীদের ঐকমত্যের দাবিকে খণ্ডন করেন। পরিশেষে এ বলে ইতি টানেন—“উপরোক্ত সবগুলো মত বিবেচনায় নিলে মুসলিমদের জন্য মিউজিকের ব্যাপারে সবচেয়ে নিরাপদ দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের অনুসরণ করা। যেসব মিউজিকে তারযুক্ত ও বায়ুচালিত বাদ্যযন্ত্রের সংশ্লিষ্টতা আছে সেগুলো পরিহার করা। একইসাথে মনে রাখতে হবে যে, ইস্যুটিতে মতভেদ আছে। কাজেই যারা আন্তরিকভাবে বাদ্যযন্ত্রের অনুমোদনে বিশ্বাস করেন, তাদের অবিশ্বাসী-কাফের বা পথভ্রষ্ট হিসেবে অভিহিত করা ঠিক হবে না; বরং এরা আমাদেরই মুসলিম ভাই ও বোন যারা সংখ্যালঘু আলেমদের মত অনুসরণ করছেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহই ভালো জানেন কোন অভিমতটি সঠিক।” {পৃ. ৪০-৪৪} কথা হলো, ইখতিলাফের ক্ষেত্রে তো ভিন্ন ভিন্ন মতকে অনুসরণের অবকাশ আছে। কিন্তু যাল্লাত-স্খলন বা বিচ্ছিন্ন মতের ক্ষেত্রে কি সেই অবকাশ আছে? তাহলে তো আওযায়ি রহ.-এর মতো মতো বিয়ের পূর্বে পাত্রীর শরীরের সব মাংসল অঙ্গ দেখা কিংবা ইবনু হাযম যাহেরি রহ.-এর মতো লজ্জাস্থান ছাড়া গোটা দেহ দেখাকে জায়িয বলাও দোষণীয় হবে না, যারা মুতআ (সাময়িক বিবাহ) করে তাদেরকেকেও ভাই মনে করতে হবে, হস্তমৈথুনের ব্যাপারে শিথিল আচরণ করতে হবে। এমন আরো বহু কিছু। আচ্ছা, এসব ক্ষেত্রে এই নীতি তারা প্রচার করে থাকলে, দেশের বড় একজন আলিমের জর্দার ব্যাপার নিয়ে এতো কেনো ট্রল করা হয়?

4. দাবা খেলা প্রসঙ্গেও লেখক ইখতিলাফ বয়ান করেছেন। একপর্যায়ে তিনি বলেন, “দাবা খেলা নিষিদ্ধ প্রমাণে যেসব হাদিস ব্যবহার করা হয়

সেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এগুলোর কোনোটিই সহীহ নয়। আর তাই যেমন ইবনে হায্ম মনে করেন দাবা খেলা হারাম নয়; এতে কিছু কল্যাণও আছে। শাইখ ইউসুফ আল-কারদাউই এ ব্যাপারে বলেছেন, ‘দাবা খেলায় মানসিক ব্যায়াম হয়, কারণ এতে চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন। সেদিক থেকে এটা পাশা খেলার চেয়ে আলাদা। কারণ পাশা খেলায় ভাগ্যের ওপর নির্ভর করা হয়। আর একে তুলনা করা যায় তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য নির্ণয়ের খেলার মতোই। অন্যদিকে দাবা খেলায় প্রয়োজন হয় দক্ষতা ও কৌশলের। একে তুলনা করা যায় তীরন্দাজি খেলার সাথে’।” এরপর তিনি উপসংহার টানেন এই বলে—“তবে দাবা খেলার সাথে যদি জুয়ার সংস্পর্শ থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই হারাম হবে। কিংবা পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখকৃত সাধারণভাবে যেগুলো হারাম এমন কিছুও যদি এ খেলার সাথে জড়িত করে, তাহলেও সেটা হারাম হবে।” {পৃ. ৪৭}

5. “এখন আসি পেশাদার খেলাধুলা দেখার ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান কী হবে। পেশাদার খেলা দেখার ক্ষেত্রে বিধান আলাদা। যদিও এ ধরনের খেলায় অংশগ্রহণ করা কিংবা দেখা অনুমোদিত। নিচের হাদিসে এর প্রমাণ রয়েছে। আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, ‘আমার মনে আছে একবার আমি আবিসিনিয়ানদের খেলা দেখছিলাম। রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর উপরের কোট দিয়ে আমাকে আড়াল করে রেখেছিলেন। আমি তখন ছিলাম এক কিশোরী বালিকা। তো এই বয়সের ছেলেমেয়েরা খেলা দেখতে কী পছন্দ করে তা আপনারা জানেন নিশ্চয়’।” {মুসলিম} {পৃ. ৫৫}

6. অনেক আলেমের মতে, খেলনা হিসেবে প্রাণী কিংবা মানুষের আদলে তৈরি পুতুল নিষিদ্ধ। কারণ সাধারণভাবে মানুষ কিংবা প্রাণীর ছবি আঁকা, ভাস্কর্য নির্মাণ করা হারাম।...তবে বাচ্চাদের খেলনা এই নিয়মের ব্যতিক্রম। আয়েশা রা. এরই অন্য একটি হাদিস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি উভয় কথার পরে হাদিস উল্লেখ করে তা থেকে এই বক্তব্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এরপর তিনি লেখেন—“শিশুদের জন্য যেসব এনিমেশন মুভি, কার্টুন বানানো হয় উপরোক্ত ব্যতিক্রমের মধ্যে

এগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যদি-না এর মধ্যে কোনো হারাম কিছু থাকে। শিক্ষণীয় বিষয় আছে এমন সবধরনের এনিমেশনকেই কতিপয় আলেম এই ব্যতিক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ছবিসহ শিশুদের বই।” {পৃ. ৬০-৬১} এরপর তিনি আলবানি রহ.-এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করেন। এরই আলোকে হয়তো আমাদের গার্ডিয়ানের ভাইয়েরা সিরাতের বইও তাদেরই মতো শার্টপ্যান্ট পরা এবং ক্লিনশেভড ব্যক্তির ছবিসহ প্রকাশ করেন।

7. টেলিভিশন সম্পর্কে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তার বক্তব্যের সারকথা হলো, “প্রাথমিকভাবে মুসলিম আলেমগণ টেলিভিশনকে বাতিল বলেছিলেন।...তবে পরবর্তীকালে বিশেষজ্ঞগণ তাদের সিদ্ধান্তের ভুল ধরতে পেরেছেন। তারা বুঝছেন, টেলিভিশন নয়; বরং কিভাবে এটা ব্যবহৃত হচ্ছে সেটাই নির্ধারণ করে এটা ভালো কি মন্দ। টেলিভিশন যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে মানুষকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য এটা হতে পারে একটা অসাধারণ মাধ্যম। এটা বিবেচনা করে অনেক বিশেষজ্ঞই টেলিভিশনের ব্যাপারে তাদের পূর্বের মত বদল করেছেন।” {পৃ. ৬৪}

8. “তাছাড়া সব মুসলিমই জান্নাতে যাবেন এমন কোনো নিশ্চয়তা কেউ দেয় নি। আমাদের কাজের মাধ্যমেই আমাদের প্রকৃত বিশ্বাস ফুটে ওঠে। সেই কাজ অনুযায়ীই আমাদের বিচার করা হবে।” {পৃ. ৬৯}

9. চেয়ারে বসা, খাবার টেবিলে খাওয়া কিংবা পার্থিব কাজে মাইক্রোফোন ব্যবহার করা। এগুলো ফুটবল খেলা, ভিডিও গেমস কিংবা গান গাওয়ার মতোই পার্থিব জিনিস। কাজেই স্পষ্টভাবে হারাম প্রমাণিত না হলে এগুলো সবই হালাল। {পৃ. ৭০}

10. ধর্মীয় ক্ষেত্রে কুফফারের অনুকরণ নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, “ ক্ষেত্রে অনুকরণের মধ্যে আছে যিক্র করার

জন্য জপমালা ব্যবহার করা, চলতি বাংলায় যাকে আমরা তাসবিহ বলি। এটাও একটা খ্রিষ্টীয় প্রথার অনুকরণ।” {পৃ. ৭১}

11. রাসূলুল্লাহ সা. পানাহার করেছেন, বিয়ে করেছেন। তিনি দৌড়াতেন ... সাহাবীদের সাথে কুস্তি লড়তেন। {পৃ. ৭৩}

12. কুফফার-অবিশ্বাসীদের সব কাজই যদি হারাম হিসেবে গণ্য করা হয়, তাহলে পরিস্থিতি খুবই অবাস্তবিক হয়ে দাঁড়াবে। জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়বে। ইসলাম মোটেও প্রযুক্তি, সামাজিক কিংবা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বিরুদ্ধে নয়। কাজেই হালাল কাজে অবিশ্বাসী-কুফফারের অনুরূপ কোনো কাজ করা নাজায়েয নয়। {পৃ. ৭২}

13. বিধর্মীদের ধর্মীয় উৎসব পালনের ক্ষেত্রে এটাই বিধান (অর্থাৎ নাজায়েয)। যে উৎসবগুলো ধর্মীয় প্রকৃতির নয়, সেগুলো পালন করা যাবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে এসব অনুষ্ঠানে হারাম কিছুর অনুপ্রবেশ যাতে না ঘটে। {পৃ. ৪৬} বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, পহেলা বৈশাখ থেকে শুরু করে এ ধরনের সকল দিবস পালনকে যারা বৈধ বলে, তারা সাধারণত এ কথাই বলে থাকে।

14. বুখারির একটা হাদিসের অনুবাদের ধরন দেখে খুব অবাক হলাম। “...কাজেই আপনারা বাড়াবাড়ি করবেন না। যতটা সম্ভব নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করুন। নিশ্চিত থাকুন আপনারা সওয়াব পাবেন আর দিনে ও রাতে ইবাদতের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করুন।” {পৃ. ২৬}

15. বেশি বেশি কমেডি শো ও সিটকম অনুষ্ঠান দেখার যে প্রবণতা আজকাল দেখা যায় সেটা অগ্রহণযোগ্য। সারাদিন হাস্যরসে মশগুল কেউ ইসলামকে গুরুত্বের সাথে নেবে, এমনটা দেখা যায় না। {পৃ. ৩৯}

16. আপনি যদি গেমস খেলতে পছন্দ করেন এবং দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে পারেন, তাহলে গেমস খেলায় কোনো আপত্তি নেই। তবে সাবধান! গেমস খেলার প্রতি আসক্ত হয়ে যাবেন না। আর খেললেও হালাল গেম খেওলবেন। মুভি ও অন্যান্য ভিডিওর ক্ষেত্রেও একই কথা। {পৃ. ৭৬}

17. কথিত আছে, ওমর রা. বলেছেন, ‘গান সফরকারীর সঙ্গী’। বর্ণনাটি কতটুকু সহীহ জানি না, তবে ইমাম মালিক বলেছেন যে, ভ্রমণের সময় গান গাওয়ায় কোনো দোষ নেই, তো আপনার গাড়িতে আজই জেইন বিখা ও দাউদ ওয়ার্নসবির সিডি দিয়ে ভরে তুলুন। ছুঁড়ে ফেলে দিন সব হারাম মিউজিক। কাজে যেতে, কাজ থেকে ফিরতে উপভোগ করুন হালাল গান-নাশীদ। {পৃ. ৭৭}

বইয়ের একটি প্যারা অবশ্য বেশ ভালোও লেগেছে। আপনি যদি বিবাহিত না হন, তাহলে শিগগিরই বিয়ে করে ফেলুন, অনেকগুলো বাচ্চা নিন। যাতে করে একসাথে সবাই মিলে বিনোদন... উপভোগ করতে পারেন। {পৃ. ৭৯}

যারা বইটির খেদমতে নিয়োজিত হয়েছেন, আমরা সর্বোপরি তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করি। পাশাপাশি বইটা যদি খটকামুক্ত হতো, তাহলে কতোই না ভালো হতো—এই শূন্যতা অনুভব করি।

প্রসঙ্গ-কথা: ১

“ শরিয়ত ও ফিক্হকে এক মনে করেন তাই শুরুতেই শরীয়ত ও ফিক্হ-এর মধ্যে পার্থক্য জানাটা জরুরি। দুটো শব্দকেই সাধারণভাবে ‘ইসলামী আইন’ হিসেবে অনুবাদ করা হয়। কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধিবিধানের ওপর ভিত্তি করে ইসলামী আইনের যে-মূল কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে সেটাই শরীয়ত। এটা সুনির্দিষ্ট। সবাই এর সাথে একমত। এই বিধানগুলো অপরিবর্তনীয়।

কারণ, আবহমনকাল থেকে মানব-প্রকৃতি সবসময় অপরিবর্তনীয়। কাজেই মানুষের মূল করণীয় কাজগুলো কখনোই বদলাবে না। এ ধরনের বিধানগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ সঠিকভাবে নিয়মিত পালন করা। অনৈতিক, অসামাজিক কাজ থেকে বিরত থাকা। যেমন, অবিবাহিত নারী-
পুরুষের মধ্যে শারিরিক সম্পর্ক, বিবাহিতদের ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য কারও সাথে শারীরিক সম্পর্ক এবং সমকামিতা।

হলো ইসলামী আইনের দ্বিতীয় পর্যায়ের বিধিবিধান। আল্লাহ তাঁর অসীম দয়াগুণে অনেক ব্যাপারে কেবল একটা সাধারণ দিক-নির্দেশনা দিয়ে
রেখেছেন। বিধানগুলো নির্দিষ্ট করে দেন নি। আইন বিশেষজ্ঞগণ এসব বিধিবিধানের ক্ষেত্রে মতভেদ করতে পারেন। এই বিধিবিধানগুলো পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী বদলে যায়। ফিক্হকে এমন সাধারণ রাখার পেছনে কারণ
হচ্ছে, এর মাধ্যমে সকল যুগে যেকোনো স্থানে ইসলামের সহজসাধ্যতা ও প্রায়োগিকতা নিশ্চিত করা। মানব-প্রকৃতি না-বদলালেও মানুষের
সংস্কৃতি, পরিবেশ, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ স্থানভেদে বদলায়। এসব
চিন্তা করেই ইসলাম ফিক্হের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। আল্লাহ যেসব সাধারণ দিয়ে রেখেছেন ইসলামী আইনবিশেষজ্ঞগণ সেগুলোকে ফিক্হের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।” {পৃ. ১৬}

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে বিশেষভাবে কয়েকটি পয়েন্ট বেরিয়ে আসছে, যে পয়েন্টগুলোতে আমাদের জেনারেল ভাইদের অনেকেই হোঁচট খান—

1. “কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধিবিধানের ওপর ভিত্তি করে ইসলামী আইনের যে-মূল কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে সেটাই শরীয়ত”। অর্থাৎ শরিয়াহ দাঁড়িয়ে আছে কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধিবিধানের ওপর ভিত্তি করে। আর যেহেতু এখানে শরিয়াহ এবং ফিকহের মধ্যকার পার্থক্য বয়ান করা হচ্ছে, তাই এর অর্থ দাঁড়ায়, ফিকহ দাঁড়িয়ে আছে কুরআন ও সুন্নাহর অস্পষ্ট বিধিবিধানের ওপর ভিত্তি করে। আর তাই “শরিয়াহ সুনির্দিষ্ট। সবাই এর সাথে একমত। এই বিধানগুলো অপরিবর্তনীয়”।

এরপর তিনি কিছু বিধানের কথা উল্লেখ করেন, যেগুলো শরিয়াহর বিধান, ফিকহের নয়। “এ ধরনের বিধানগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ সঠিকভাবে নিয়মিত পালন করা। অনৈতিক, অসামাজিক কাজ থেকে বিরত থাকা। যেমন, অবিবাহিত নারী-পুরুষের মধ্যে শারিরিক সম্পর্ক, বিবাহিতদের ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য কারও সাথে শারীরিক সম্পর্ক এবং সমকামিতা”।

2. ফিকহের বিধানগুলো নির্দিষ্ট নয়, অনির্দিষ্ট। মহান শরিয়াহপ্রণেতা এর “বিধানগুলো নির্দিষ্ট করে দেন নি। তাই আইন
বিশেষজ্ঞগণ এসব বিধিবিধানের ক্ষেত্রে মতভেদ করতে পারেন”। আর
যেহেতু মহান শরিয়াহপ্রণেতা ফিকহের বিধানগুলোকে নির্দিষ্ট করে
দেননি, তাই “এই বিধিবিধানগুলো পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অনুযায়ী বদলে যায়”। একেক কালে একেক রূপ ধারণ করে। বৈধতা-অবৈধতার
চক্রে ক্রমান্বয়ে ঘুরপাক খায়। অর্থাৎ ফিকহ শাস্ত্রটাই হলো
কাদামাটির ওপর গড়ে ওঠা সুউচ্চ প্রাসাদ। তরঙ্গের দোলাও যার পতনের কারণ হতে “ফিক্হকে এমন সাধারণ রাখার পেছনে কারণ হচ্ছে, এর মাধ্যমে সকল
যুগে যেকোনো স্থানে ইসলামের সহজসাধ্যতা ও প্রায়োগিকতা নিশ্চিত
করা”। কারণ, “মানব-প্রকৃতি না-বদলালেও মানুষের সংস্কৃতি, পরিবেশ, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ স্থানভেদে বদলায়”। তাই মানব-প্রকৃতির সঙ্গে
তাল মেলাতে গিয়ে ফিকহকেও অনিবার্যভাবে বহুরূপী হতে হয়।

শাইখ মুস্তাফা আহমাদ যারকা রহ. তার ‘আলমাদখালুল ফিকহিয়্যুল আম’ গ্রন্থে লেখেন—

“এখানে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে, যেখানে অনেকেরই বিভ্রান্তি ঘটে। বিষয়টি স্পষ্ট করা এবং পাঠককে এ সম্পর্কে অবগত করা উচিত। বিষয়টি এই যে, ইসলামি ফিকহ দু’ধরনের বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা সম্পূর্ণভাবে একটি অপরটির থেকে ভিন্ন।

প্রথম প্রকার হলো, এমন সব বিধিবিধান, যা প্রামাণিকতা এবং নির্দেশনার ক্ষেত্রে অকাট্য নুসুস দ্বারা সাব্যস্ত; যেগুলো ইসলামের শরিয়াহপ্রণেতার সুস্পষ্ট ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে, তিনি মুকাল্লাফদের (যাদের ওপর শরিয়াহ পালন করা অপরিহার্য) ইসলামের জীবনবব্যবস্থারূপে যা তাদের ওপর আবশ্যক এবং অনিবার্য করে দিয়েছেন। যেক্ষেত্রে তিনি তাদের ব্যাখ্যা, উপলব্ধি কিংবা ভিন্ন ফলাফল বের করার কোনো পথই খোলা রাখেন নি। যেমন, নামাজ, যাকাত, রমজানের রোজা, চুক্তি পূর্ণ করা এবং প্রয়োজন ও শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে জিহাদ করা প্রভৃতি, অর্থাৎ এ ধরনের যতো বিধান কুরআন এবং মুতাওয়াতির সুন্নাহয় বিবৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার হলো, এমন সব বিধিবিধান, যে ব্যাপারে কিতাব এবং সুন্নাহ নীরব থেকেছে এবং শরিয়াহর আলিমগণের জন্য ইজতিহাদ এবং ইসতিমবাতের সুযোগ রেখেছে, অথবা সে ব্যাপারে প্রামাণিকতা কিংবা নির্দেশনার ক্ষেত্রে অকাট্য নয় এমন নুসুস বর্ণিত হয়েছে, যা তার প্রামাণিকতা কিংবা অর্থের প্রতি নির্দেশনার ব্যাপারে আলিমগণের বিভিন্ন মতের সম্ভাবনা রাখে। এসকল নুসুস তার উপলব্ধি এবং তা থেকে বিধান উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে আলিমগণের ইজতিহাদের ক্ষেত্র।

ইসলামি ফিকহ এবং ফিকহি গ্রন্থাদি উপরিউক্ত উভয় প্রকার বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে।” {আলমাদখালুল ফিকহিয়্যুল আম: ১/১৫৪}

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, ফিকহকে প্রধানত দু’ভাগে ভাগ করা যায়, যার একভাগের সঙ্গে শরিয়াহর অমিল দাঁড় করানো গেলেও প্রথমভাগের সঙ্গে তার অমিল খঁজে পাওয়া যাওয়া নিশ্চয়ই দায়!

আচ্ছা, ফিকহের দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্গে তাহলে শরিয়াহর কী পার্থক্য দাঁড়াচ্ছে?

শায়খ রহ. লেখেন—

“শরিয়াহ হলো কুরআনের নুসুস, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রাসুল মুহাম্মাদ সা.-এর ওপর অবতীর্ণ, এবং নববি সুন্নাহ, অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সা.-এর কথা এবং কাজ, যা কুরআনে যা-কিছু সংক্ষিপ্তরূপে রয়েছে তারই ব্যাখ্যা এবং বিস্তারিত রূপ, কুরআনের আদেশ নিষেধ এবং বৈধতার প্রায়োগিক রূপ।

... আর ফিকহ হলো, আলিমগণ শরিয়াহর নুসুস থেকে যা-কিছু বুঝেছেন, সে-সকল নুসুস থেকে যেসব বিধান উদ্ঘাটন করেছেন এবং তার আলোকে যেসব মূলনীতি বের করেছেন ইত্যাদির নাম।

... তো শরিয়াহ হলো মাসুম (যা ভুলের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে)। ইসলামি আকিদা অনুসারে যার পুরোটাই সঠিক যথার্থ এবং কল্যাণকর, যা মানবজীবনকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করে।

আর ফিকহ হলো শরিয়াহ অনুধাবন এবং শরিয়াহপ্রণেতার উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে মৌলিক মূলনীতির আলোকে তা থেকে বিধান-উদ্ঘাটনের নিমিত্তে শরিয়াহর নুসুসকে বাস্তবিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফকিহগণের একটি কর্ম।...সুতরাং ফিকহ হলো ফকিহের অনুধাবন এবং সিদ্ধান্ত, যদিও তা শরয়ি নুসুসের ওপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে।” {প্রাগুক্ত: ১৫৩-১৫৪}

তো ফিকহ শাস্ত্র নামে আমরা যা-কে চিনি, তা মূলত ফিকহের উভয়প্রকার বিধানকেই ধারণ করে। সুতরাং ফিকহ মানেই এমন কিছু নয়, যার বিধানগুলো অনির্দিষ্ট। যুগ-যুগান্তে যা শুধু পরিবর্তিত হতেই থাকে। বরং ফিকহের দ্বিতীয় প্রকারের দু-চারটি বিধান বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে স্থান-কাল-পাত্রের দাবিতে শরিয়াহর উসুলের আলোকে বিবেচ্য কোনো কারণে পরিবর্তিত হলেও এর সংখ্যা খুবই সীমিত। প্রসঙ্গক্রমে

উল্লেখ্য , সেক্যুলাররা শরিয়াহ এবং ফিকহের মধ্যে এক ধরনের পার্থক্য ফেরি করে বেড়ায় , যা জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করে। ইসলামওয়েবের এক ফাতাওয়ায় বলা হয়েছে —

وأما من أراد من التفريق أن يقول بأن الشريعة هي: ما ينظم علاقة العبد بالله، وهي منزلة من عند الله. والفقه هو: استنباط الفقهاء، فلهم أن يستنبطوا من الأحكام، ويُعملوا عقولهم دون التقيد بنصوص الشريعة والمصادر التي اعتمدتها، فهذه دعوى العلمانيين الذين يريدون زحزحة الدين عن مجالات الحياة المختلفة، وحصره في جانب العقائد والعبادات.

ثم يتولى الناس التشريع لأنفسهم، فيشرعون ما شاءوا، وهذا كفر بالله تعالى مخرج من ملة الإسلام.

نسأل الله العافية.

“শরিয়াহ এবং ফিকহের মধ্যে যারা এভাবে পার্থক্য দেখাতে চায় যে , শরিয়াহ আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক সুসংহত করে। আর তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আর ফিকহ হলো ফকিহদের উদ্ভাবন। ফকিহরা যেকোনো বিধান উদঘাটন করতে পারে , তারা নিজেদের আকলকে ব্যবহার করে এসব করে, শরিয়াহর নুসুস এবং শরিয়াহ যেসকল তথ্যসূত্রের ওপর নির্ভর করেছে তার ধার ধারে না। এটা তো সেক্যুলারদের দাওয়া , যারা দ্বীনকে জীবনের বিভিন্নমুখী ক্ষেত্র থেকে আলাদা করতে চায় এবং দ্বীনকে আকিদা এবং ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চায়। (এই বাতিল চিন্তাধারায় যে ইসলামপন্থী অনেক লেখকও আক্রান্ত তার প্রমাণ মেলবে ‘বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ ’ বইয়ে নজর বুলালে) এরপর লোকেরাই নিজেদের জন্য বিধান প্রণয়নের দায় কাঁধে নিয়ে নেয়। অনন্তর তারা যা চায় , তা উদ্ভাবন করতে থাকে। এটা আল্লাহ তাআলার সাথে কুফরের নামান্তর , যা আক্রান্ত ব্যক্তিকে ইসলাম -ধর্ম থেকে বের করে দেয়। আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। ” {লিংক: https://goo.gl/qSqSEB }

‘হালাল বিনোদনে’র লেখক যদিও পুরোপুরি সেক্যুলারদের মতো দাওয়া করেন নি, তবে তিনি ফিকহের যে পরিচয় দিয়েছেন, তা একটু কেমন যেনো লাগছে, হতে পারে এ থেকে অনেকেই ভুল বুঝবেন। তিনি ইচ্ছাকৃত এমনটা করেছেন, আমরা তা বলছি না। তবে অনিচ্ছাকৃত হলেও এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তার বক্তব্য থেকে কিংবা অনুবাদকের অনুবাদ থেকে ফিকহ খুবই হালকা একটি শাস্ত্র হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে, বাতাসের দোলায়ও যা রীতিমতো কম্পমান হয়।

প্রসঙ্গ-কথা: ২

“একজন লোক তখনই পাপের ভাগিদার হয়, যখন তার ফরজ কোনো ইবাদত ছুটে যায় অথবা যখন সে কোনো হারাম কাজ করে বসে।” {পৃ. ১৭} শরিয়াহর বিধিবিধানের প্রকারগুলো উল্লেখ করার পর তিনি এ কথা বলেছেন। এজন্যই মূলত খটকা জেগেছে।

অথচ মাকরুহে তাহরিমিতে লিপ্ত হলেও ব্যক্তি পাপের ভাগিদার হয়, শুধু ভাগিদারই নয়, বরং কর্মগত বিচারে তার মধ্যে এবং হারামের মধ্যে পার্থক্য দাঁড় করানো দুষ্কর। হারাম সাব্যস্ত হওয়ার জন্য একেবারে অকাট্য দলিলের প্রয়োজন হয়, পক্ষান্তরে যন্নি দলিল দ্বারা মাকরুহে তাহরিমি সাব্যস্ত হয়। এই বিষয়টিকে না মানলে নিশ্চিত জুলমে পতিত হবে। কারণ তখন মাকরুহে তাহরিমিকেও গুনাহ মনে না করে এতে লিপ্ত হওয়ার পথ খুলবে। কিংবা তাকে হারাম বলে চালিয়ে দেয়া হবে। উভয়টিই প্রান্তিকতা। মাসিক আলকাউসার তার ফতোয়ার ক্ষেত্রে বর্তমানে সাধারণত ‘মাকরুহে তাহরিমি’ শব্দের স্থলে ‘নাজায়িয’ শব্দ ব্যবহার করে। আর মাকরুহে তাহরিমি যে সম্পূর্ণ নাজায়িয—এতে তো সন্দেহের অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে হারামের ক্ষেত্রে সরাসরি ‘হারাম’ শব্দই লেখা হয়।

[illegible]?

ALI HASAN OSAMA·WEDNESDAY, DECEMBER 27, 2017

[illegible]—

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ، وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا

[illegible] {[illegible], [illegible]-[illegible]}

[illegible] —

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ تَأْتِي امْرَأَةٌ تُبَادِرُنِي فَأَقُولُ لَهَا: مَا لَكِ؟ وَمَا أَنْتِ؟ فَتَقُولُ: أَنَا امْرَأَةٌ قَعَدْتُ عَلَى أَيْتَامٍ لِي

[illegible]

বাচ্চার লালন পালনের জন্য নিজেকে আটকে রেখেছে [বিবাহ করা থেকে]। {মুসনাদে আবী ইয়ালা , হাদীস নং -৬৬৫১}

উপরিউক্ত হাদিসদুটি এবং তার অনুবাদ গার্ডিয়ান প্রকাশনীর বারোজন অংশীদারের একজন জনাব কমরেড মাহমুদের পোস্ট থেকে গৃহীত। ‘বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ ’ বইয়ের একটি আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এই বর্ণনাদুটি উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ আল -মাসুদ ভাই তার পোস্টে বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদের এই অংশটা উদ্ধৃত করেছিলেন —

“৪৪ পৃষ্ঠায় লেখক মা আমেনার মৃত্যু বিষয়ে বলছেন , ‘স্বামী মারা যাবার সময় তার বয়স হবে বড়জোর বিশের কোঠায়। চাইলে তিনি আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারতেন। সেটা না করে তিনি বিশেষ গুণের পরিচয় দিয়েছিলেন। এটা অনেকের জন্যই অনেক বড় অনুপ্রেরণা হতে পারে ’।”

পোস্টদাতা ব্যক্তি আব্দুল্লাহ আল -মাসুদ ভাইয়ের উদ্ধৃতি উল্লেখ করার পরে বলেন—“প্রিয় ভাই মাসুদ , এই কথাটি যদি অনুপ্রেরণা হিসাবে ধরেই নিই তাহলে সেই অনুপ্রেরণার কথা এই বইয়ের লেখক শুধু না , বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা .) নিজেই বলেছেন। কেন খালি খালি মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন ?” এরপর বর্ণনাদুটি উল্লেখ করেন এবং সবশেষে বলেন—“আমরা কওমীদের ইসলামের খেদমতে দেখতে চাই , বিভ্রান্ত করার কাজে দেখতে চাইনা জনাব ...”

এটা হলো আমাদের এই লেখা তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপট। এবার আসি মূল প্রসঙ্গে।

আল্লাহ তাআলা বলেন —

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

[illegible]

الْأَيَامَى: جَمْعُ أيِّم، وَيُقَالُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا، وَلِلرَّجُلِ الَّذِي لَا زَوْجَةَ لَهُ. وَسَوَاءٌ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ثُمَّ فَارَقَ، أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، يُقَالُ: رَجُلٌ أَيِّمٌ وَامْرَأَةٌ أَيِّمٌ أَيْضًا.

[illegible]

[illegible]

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা যে অবিবাহিত কুমারী এবং বিধবা নারীদেরকে বিয়ে দিয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন, মুফাসসিরগণের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে, এটা নির্দেশনামূলক বক্তব্য; ফরজ বা ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ যদি এর অন্যথা করা হয়, তাহলে এ কথা বলা যাবে না যে, সে ফরজ তরককারী এবং এর পরিণামে সে জাহান্নামের উপযুক্ত।

আচ্ছা, তবে কি আমাদের আলোচনা একেবারে প্রথমে উল্লিখিত হাদিসদুটির সঙ্গে বিরোধপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে?

না, বিষয়টি আসলে তা নয়। শরিয়াহ বিধবা নারীর ওপর শুধু একটি জিনিসকে অপরিহার্য করেছে, আর তা হলো ‘ইহদাদ’ তথা শোকপালন। স্বামী মৃত্যুবরণ করার পর থেকে লাগাতার চার মাস দশ দিন একজন নারীকে বাধ্যতামূলকভাবে ‘ইহদাদ’ পালন করতে হয়। তবে যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে তাকে গর্ভপাত করা পর্যন্ত এই ‘ইহদাদ’ চালিয়ে যেতে হয়। এসময়ে তাকে সাজসজ্জা পরিহার করতে হয়, অন্য কোথাও বিয়ে করা নিষিদ্ধ থাকে, এছাড়াও ‘ইহদাদে’র রয়েছে আরো কিছু বিধান। ‘ইহদাদে’র মেয়াদ তথা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বিধবা নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যায়। এরপর চাইলে অন্য কোথাও বিয়ে করতে পারে, আর চাইলে বিয়ে না করেও থাকতে পারে। কুমারী নারীর ক্ষেত্রে যে কথা, তার ক্ষেত্রেও একই কথা। হাঁ, যদি তার ফিতনা বা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, অল্প বয়সে বিধবা হলে স্বাভাবিকভাবেই এই আশঙ্কা থাকে আর নফস এবং শয়তানের প্ররোচনা তো রয়েছেই, তাহলে তার জন্য বিয়ে করে নেয়াই উচিত এবং এটাই শরিয়াহর নির্দেশনা। রাসুলুল্লাহ সা. তো অসংখ্য হাদিসে ফিতনা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আর জিহ্বা এবং লজ্জাস্থানই হলো ফিতনার সবচে বড় উপকরণ। তাই হাদিসে বলা হয়েছে, কেউ যদি এই দুটি অঙ্গকে হেফাজত করে, তাহলে রাসুলুল্লাহ সা. তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হয়ে যাবেন।

একজন বিধবা নারীর বিশেষ কিছু অবস্থা থাকতে পারে। যেমন, হতে পারে তার ছোট ছোট সন্তান রয়েছে আর এমতাবস্থায় সে যৌক্তিকভাবে আশঙ্কা করছে যে, যদি আমি অন্যত্র বিয়ে করি, তাহলে আমার নতুন স্বামীর ঘরে এই এতিম সন্তানরা অবহেলিত থাকবে, আর তার এই আশঙ্কার পেছনে মজবুত দলিলও থাকে, কারণ অনেক সময় এমন হয় যে, অনেক সংসারে এ ধরনের সন্তানরা আরো বরং ভালো ও নিরাপদ থাকে; কিংবা যদি এমন হয় যে, মৃত স্বামীর সাথে তার কোনো অঙ্গীকার ছিলো যে, সে তাকে হারানোর পর পুনরায় অন্য কোথাও বিয়ে করবে না, কারণ তাবারানি এবং অন্যান্য গ্রন্থে সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক নারী জান্নাতে তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে থাকবে, তাই সে দুনিয়ার বিচ্ছেদ মেনে নিলেও আখিরাতের বিচ্ছেদ কামনা করে নি। আর উপরিউক্ত উভয় ক্ষেত্রে যদি সে নিজের ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কামুক্ত হয় আর তার বয়সও মোটামুটি বেশি হয়, তাহলে তার জন্য বিয়ে না করে থাকার সুযোগ রয়েছে। হাঁ, কেউ যদি বাতিল আকিদার কারণে এমনটা করে থাকে, যেমনটা হিন্দুদের সমাজে এককালে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো, জাহেলি যুগেও অনেকে এই আকিদা লালন করতো, তাদের ধারণা, স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অবৈধ, কেউ যদি এ ধরনের বাতিল আকিদার কারণে বা পুরোনো জাহিলিয়াত বা নব্য জাহেলি সমাজের রীতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ লালন করে এমনটা করে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত এবং চরম নিন্দনীয়।

এ পর্যায়ে আমরা এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি—

১. প্রখ্যাত কবি ইমরাউল কাইসের কন্যা এবং হুসাইন ইবনু আলি রা.-এর স্ত্রী রাবাব বলেছিলেন, ‘আল্লাহর কসম, আমি রাসুলুল্লাহ সা.-এর পর আর কাউকে শ্বশুর হিসেবে গ্রহণ করবো না’। {হুসাইন ইবনু আলি, পৃ. ৫৪}

২. উসমান ইবনু আফফান রা.-এর স্ত্রী নায়িলা রা .-কে মুআবিয়া রা . বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লিখিত হয়েছে , তিনি উসমান রা .-এর শাহাদাতের পর তিনি বলেছিলেন ,

إني رأيت الحُب يَبْلَى كما يبلى الثوب، وقد خشيت أن يَبْلَى حزن عثمان من قلبي، فكسرت بعض أسنانها بحجر وقالت: والله لا قعد أحد مني مقعد عثمان أبدًا

{আলইকদুল ফারিদ: ৩/১৯৪}

৩. আবু তালিবের কন্যা উম্মু হানি রা .-কে রাসুলুল্লাহ সা . বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি বলেন , 'হে আল্লাহর রাসুল , আমি বয়স্ক হয়ে গেছি। তাছাড়া আমার এতিম বাচ্চাকাচ্চা আছে। এখন আমি যদি আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই , তাহলে তাদের দেখভালে ত্রুটি হতে পারে। আর তাদের দেখভালের হক আদায় করলে আপনার হক আদায়ে অপূর্নতা রয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। {সহিহ মুসলিম ইমাম নাবাবির শরাহসহ : ১৬/৮০; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ৭৬৫০}

৪. রাসুলুল্লাহ সা . তার সাওদা নামের এক বিধবাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। পূর্বের স্বামীর ঘরে তার ছিলো পাঁচটি বা ছয়টি বাচ্চা। সে রাসুলুল্লাহ সা .-এর প্রস্তাবে অসম্মতি জানালে তিনি বললেন , 'কোন জিনিস তোমাকে আমার থেকে ফেরাচ্ছে '? তখন সে বললো, 'হে আল্লাহর নবি , আল্লাহর কসম , আমাকে তো আপনার থেকে এ জিনিস ফেরাচ্ছে না যে , আপনি আমার কাছে গোটা সৃষ্টজীবের মধ্যে সর্বোত্তম নন ; কিন্তু আমি আপনার প্রতি সম্মানার্থে জানাচ্ছি , আমি আশঙ্কা করছি যে , এই বাচ্চারা সকাল-সন্ধ্যা আপনার মাথার ওপর চিৎকার -চেচামেচি করবে। রাসুলুল্লাহ সা . বললেন, 'এ ছাড়া আর অন্য কিছু কি তোমাকে ফেরাচ্ছে '? সে বললো, 'না '। তখন রাসুলুল্লাহ সা . বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। উষ্ট্রারোহী মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ বংশীয়া মহিলারা

সর্বোত্তম। তারা শিশু সন্তানদের প্রতি স্নেহশীল এবং স্বামীর মর্যাদার উত্তম রক্ষাকারিনী ’। {আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ২৯২৩}

৫. হুদবাহ ইবনুল খাশরাম তার স্ত্রীকে বলেছিলেন ,

فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا ** أغم القفا والوجه ليس بأنزعا

এরপর যখন হুদবাহ ইবনুল খাশরামকে কতল করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় , তখন তার স্ত্রী সকলের থেকে পালিয়ে দূরে চলে যায়। সেখানে গিয়ে সে তার নাক কেটে ফেলে এবং ঠোঁট চিড়ে ফেলে। এরপর স্বামীর উদ্দেশে চিৎকার করে বলে, ‘তুমি কি মনে করো , তোমার পর আমি কাউকে বিয়ে করবো’? {মুহাযারাতুল উদাবা : ২/৯৮; আলমুসতাতরাফ: ১/১৬৫}

৬. উম্মুদ দারদা (সুগরা) হুজাইমা বিনতু হুওয়াইকে মুআবিয়া রা . বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা প্রত্যাখ্যান করে এবং জানায় , আমি আবুদ দারদা রা .-কে বলতে শুনেছি , ‘নারী তার সর্বশেষ স্বামীর জন্য। আর আমি আবুদ দারদার কোনো বিকল্প চাই না ’। উল্লেখ্য , তাবারানি এবং আবু ইয়া ‘লার এই সহিহ হাদিসটি অন্য শব্দেও বর্ণিত হয়েছে ,

أيُّما امرأة تُوفي عنها زوجها فتزوجت فهي لآخر أزواجها

সারকথা হলো, শরিয়াহর স্বাভাবিক নির্দেশনা হচ্ছে , বিধবা নারীরা স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দতের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ করবে এবং এ সময়ে ইহদাদ পালন করবে এবং এরপর তারা অন্যত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে। হাঁ , যদি বিবাহ এড়িয়ে একাকী বাস করার মধ্যে শরিয়াহর দৃষ্টিতে বিবেচ্য বিশেষ কোনো কারণ থাকে , যেমনটি ওপরে উল্লিখিত হলো , আর সেও নিজের ব্যাপারে গুনাহ বা ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা করে না , তাহলে ভিন্ন কথা।

এক্ষেত্রে যদি সে সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে বিবাহ থেকে বিরত থাকে, এর পেছনে যৌক্তিক কারণও থাকে আর সে নিজেকে ফিতনা থেকে মুক্তও মনে করে, তাহলে এক্ষেত্রে পোস্টের শুরুতে উল্লিখিত হাদিসদুটি প্রযোজ্য হবে, অর্থাৎ এই অসামান্য আত্মত্যাগের জন্য সে আল্লাহর কাছে প্রতিদানপ্রাপ্ত হবে। আর এমনিও তো এতিমের খেদমতের জন্য নুসুসে বিরাট বিরাট প্রতিদানের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যেখানে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেই চুলের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যায়, সেখানে তার জন্য এই বিরাট কুরবানি করলে তার সাওয়াব যে কতো বড় হবে — তা তো সহজেই অনুমেয়।

বাকি থাকলো স্বামীর সাথে অঙ্গীকার প্রসঙ্গ। এক্ষেত্রে মাসআলা হচ্ছে, স্ত্রী যদি স্বামীকে এ ধরনের অঙ্গীকার দেয়, আর স্বামীর মৃত্যুর পর সেও নিজের ব্যাপারে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা না করে, তাহলে তার জন্য অঙ্গীকার পূরণ করার সুযোগ রয়েছে। আর যদি সে নিজেকে আশঙ্কামুক্ত মনে না করে, তাহলে সে অঙ্গীকার ভেঙে ফেলবে এবং এর জন্য কসমের কাফফারা দেবে। কারণ এসকল ক্ষেত্রে অঙ্গীকার কসমের হুকুম ধারণ করে।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সা. উম্মু মুবাশশির রা.-কে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি জানালেন, ‘আমি আমার স্বামীকে শর্ত দিয়েছি যে, তার পরে আমি আর বিয়ে করবো না’। তখন রাসুলুল্লাহ সা. তাকে বললেন, ‘এটা ঠিক হবে না’। {যাদুল মাআদ: ৪/২০৯; আততারগিব: ৩/১৪৪}। এর কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কারণ এটা এমন শর্ত, যা কিতাবুল্লাহতে নেই। তাছাড়া এতে আরো সমস্যাজনক দিক রয়েছে।

তেমনি মহান খলিফা উমর ইবনু আবদিল আযিয রহ. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.- এর কন্যা উম্মু হিশামকে বিয়ে করে নিয়েছিলেন, অথচ উম্মু হিশাম তার প্রাক্তন স্বামী আবদুর রহমানব ইবনু সুহাইল ইবনি আমরকে তার ওসিয়ত

অনুযায়ী কসম দিয়েছিলো যে, তার পরে আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। {আলামুন নিসা, উমর কাহালাহ}

অনেক সময় এমন হয় যে, কোনো কোনো বিধবা নারীর পূর্বের স্বামির প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসার ভিত্তিতে ধারণা থাকে, পূর্বের স্বামীর থেকে আর ভালো কাউকে বোধহয় সে খুঁজে পাবে না। এজন্য সে একাকী থাকাকেই সঙ্গত মনে করে। আবু সালামা রা. মৃত্যুর পূর্বে তার স্ত্রীকে বিয়ে করার জন্য ওসিয়ত করেছিলেন। কিন্তু উম্মু সালামা রা.-এর ধারণা ছিলো, তার স্বামীর থেকে উত্তম কাউকে তিনি পাবেন না। এজন্য তিনি বিয়ে না করার মনস্থির করেছিলেন। অথচ পরে দেখা গেলো, তার স্বামী হিসেবে রাসুলুল্লাহ সা. আবির্ভূত হলেন।

সুতরাং এ ধরনের দু-একটি হাদিস দেখে এর ভিত্তিতে কুরআন এবং সুন্নাহর ব্যাপক এবং সুস্পষ্ট বিধানের খেলাফ বলার কোনোই অনুমতি নেই। কারণ সাধারণ তালিবুল ইলমও জানে, ‘খাবারুল ওয়াহিদে’র মাধ্যমে কিতাবুল্লাহর বিধানের সাথে কোনো কিছু সংযোজন করা অথবা তার ব্যাপক বিধানকে সীমিত করা জায়িয নয়।

আপত্তিকারীর আপত্তিকে শক্তিশালী গণ্য করে আমরা উপরিউক্ত আলোচনা করলাম। ইলমি পরিভাষায় এটাকে বলা হয় ‘তাসলিমি জবাব’। আর ‘ইলযামি জবাবে’ গেলে তো সর্বপ্রথম কথা আসবে, তার উল্লিখিত হাদিসের মান কী? তা কি এ ধরনের ফিকহি বিধান-উদঘাটনের উপযুক্ত? যেমন প্রথম হাদিসটির ব্যাপারে ইমামগণের বক্তব্য লক্ষ করুন—

ইমাম মুনযিরি বলেন, ‘হাদিসটি ‘হাসান’ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না’ (অর্থাৎ যায়িফ)। {আততারগিব: ৩/৩১৪}

হাইসামি বলেন, ‘এই হাদিসের বর্ণনাসূত্রে আলি ইবনু ইয়াযিদ রয়েছে। সে একজন যায়িফ বর্ণনাকারী। তার মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করা যায় না। কেউবা তার তাওসিকও করেছে’। {মাজমাউয যাওয়ায়িদ: ৪/৩১৭}

ইরাকি বলেন, ‘এই হাদিসের সনদ দুর্বল’। {তাখরিজুল ইহইয়া: ২/৭৬}

মুনাবি বলেন, ‘এর সনদে নাহহাস রয়েছে। আর তাকে হুজ্জত হিসেবে পেশ করা যায় না। {তাখরিজুল মাসাবিহ: ৪/৩০৩}

দিময়াতি বলেন, ‘এর সনদ দুর্বল’। {আলমাতজারুর রাবিহ: ২৫৮}

ইমাম বাইহাকিও এর দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। {শুআবুল ইমান: ৪/১৮২০}

শাইখ আলবানি তো অসংখ্য জায়গায় এটাকে যায়িফ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। {দেখুন—নাকদুন নুসুস: ২৩; যায়িফুল আদাবিল মুফরাদ: ২৮; যায়িফুত তারগিব: ১৫১১; যায়িফু আবি দাউদ: ৫১৪৭, ৫১৪৯; যায়িফুল জামি‘: ১৩২৩; সিলসিলা যায়িফা: ১১২২}

দ্বিতীয় হাদিসটির সনদ তুলনামূলক ভালো। কিন্তু তাও খুব শক্তিশালী নয়। এমনকি বুসিরি বলেন, ‘এর সনদ যায়িফ’। {ইতহাফুল খিয়ারাহ: ৫/৪৮৭}

শাইখ আলবানি তো পুরোই যায়িফ বলেছেন। {দেখুন—যায়িফুত তারগিব: ১৫১২; সিলসিলা যায়িফা: ৫৩৪৭}

তথাপি যদি এগুলো সহিহও হতো, তবুও এতে আমাদের দাবির পক্ষে কোনো দুর্বলতা দেখা দিতো না। পোস্টদাতা জীবনে উসুলুল ফিকহের কিতাব উল্টিয়ে দেখেছে কি না আল্লাহই ভালো জানেন। ফিকহের ব্যাপারে কথা বলতে গেলে যে উসুলের আলোকে বলতে হয়—এই বোধটা হয়তো তার নেই। অথবা ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং দলান্ধতা তার দৃষ্টির ওপর আবরণ ফেলে

রেখেছে। যা’হোক, আমরা সকল মুসলমানের জন্য আল্লাহর কাছে হিদায়াত এবং কল্যাণ প্রার্থনা করে আজকের লেখার ইতি টানছি।

উল্লেখ্য, বিধবা নারীকে বিয়ে করা এবং এতিমদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা অনেক বড় পুণ্যের কাজ। তাই রাসুলুল্লাহ সা. এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। “বিধবা ও অসহায়দের জন্য চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মতো অথবা রাতে সালাতে দণ্ডায়মান ও দিনে সিয়াম-পালনকারীর মতো।” {সহিহ বুখারি: ৫৩৫৩} তাদের সহযোগিতার এই চেষ্টা বিয়ে না করেও সম্ভব। তবে বিয়ের মাধ্যমে যে ব্যাপারটি পূর্ণতা লাভ করে—এ কথা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

জাতীয়তাবাদের মূর্তি-১

ALI HASAN OSAMA·FRIDAY, JANUARY 5, 2018

প্রারম্ভিকা

আমাদের সংবিধানের চারটি মূল ধারার মধ্যে অন্যতম হলো জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে লেখা হয়েছে, ‘আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।’ সংবিধানের নয় নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।’

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মূল ভিত্তি ও চেতনা ছিল জাতিসত্তাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ। তদানীন্তন পূর্ব

পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠীটি নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্খা থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদের এ লড়াই শুরু হয়েছিল বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের আগে অসহযোগ আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলা জুড়ে ধ্বনিত হয়েছিল, “বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।”

জাতীয়তাবাদ বলা হয় এমন আদর্শকে, যেখানে জাতিকে মানবসমাজের কেন্দ্রীয় অবস্থানে স্থাপন করা হয় এবং অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শকে জাতিগত আদর্শের পরে স্থান দেয়া হয়।[1] অন্যভাবে বললে, ‘জাতীয়তাবাদ (nationalism) হচ্ছে কোন জাতির জোরালো জাতীয়তাবোধ, যা তাদের স্বাধিকার বা স্বায়ত্বশাসন অর্জনে, এমনকি নিজেদের জন্য স্বাধীন, সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র গঠনে ঐক্যবদ্ধ করে। উনিশ ও বিশ শতকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের ফলে বড় বড় সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ ভেঙে বহু জাতিরাষ্ট্রের জন্ম হয়। জাতীয়তাবাদ ধারণাটি একদিকে যেমন একটি জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র জাতিসত্তাবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে (জাতিসত্তাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বা ethnic nationalism), অন্যদিকে তেমনি একটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অধিবাসীদের রাষ্ট্রভিত্তিক সম্মিলিত মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে (উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদ বা liberal nationalism)। যে কোন ধরণের জাতীয়তাবাদই অন্য জাতি কিংবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন জাতি কিংবা রাষ্ট্রের প্রাধান্য এবং এমনকি আগ্রাসন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করে থাকে।’

এখানে প্রসঙ্গক্রমে আরও তিনটি পরিভাষা জেনে রাখা যেতে পারে।

1. জাতিসত্তা (ethnicity) হচ্ছে জাতি বা গোষ্ঠীগত পরিচয়, জাতীয়তা নয়। এটি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই

রাষ্ট্রের সীমানা দ্বারা সীমাবদ্ধও নয়। একাধিক জাতিসত্তার মানুষ যেমন একই রাষ্ট্রে বসবাস করে থাকে, একই জাতিসত্তার মানুষ তেমনি একাধিক রাষ্ট্রে ছড়িয়ে থাকতে পারে। ঢাকা, লন্ডন, নিউইয়র্ক কিংবা দুনিয়ার অন্য যে কোন স্থানে বসবাসকারী বাঙালিদের জাতিসত্তাগত পরিচয় তাই এক ও অভিন্ন। বিশ্বে কুর্দী কিংবা তামিলদের মত নিজস্ব জাতি রাষ্ট্রবিহীন অনেক জনগোষ্ঠী রয়েছে, যাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা আছে, কিন্তু সার্বভৌম জাতীয়তা নেই।

2. জাতীয়তা (nationality) হচ্ছে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় পরিচয়, জাতিসত্তা নয়। এটি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং বলা যায়, রাষ্ট্রই জাতীয়তা নির্ধারণ করে। সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিবাসীদের একক রাষ্ট্রীয় পরিচিতির ক্ষেত্রে তাই আন্তর্জাতিকভাবে পাসপোর্ট, ভিসা, জাতীয়তা-সনদ, পরিচয়পত্র, ইত্যদিতে ‘জাতীয়তা’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় এবং সেটি জাতিসত্তা নয়, বরং নাগরিকত্ব বোঝায়। ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও আরব দেশগুলোর দৃষ্টান্ত এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ভারতে বহু জাতিসত্তার মানুষের বসবাস হলেও তাদের সবার রাষ্ট্রীয় পরিচয় বা জাতীয়তা হচ্ছে ভারতীয়।

3. নাগরিকত্ব (citizenship) হচ্ছে আইনের ভিত্তিতে নির্ধারিত রাষ্ট্র ও ব্যক্তির পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্ক। নাগরিকত্বের মাধ্যমে একদিকে যেমন ব্যক্তি তার রাষ্ট্র থেকে নির্দিষ্ট কিছু অধিকার লাভ করে, অন্যদিকে তেমনি তার ওপর রাষ্ট্রের প্রতি নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব বর্তায়। নাগরিকত্বের সাথে জাতীয়তার মূল পার্থক্য হচ্ছে, জাতীয়তা থাকলেই বা রাষ্ট্রের সদস্য হলেই সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন নাগরিক অধিকার, যেমন, ভোটাধিকার অর্জিত হয় না। তবে সাধারণভাবে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত চিত্র উঠে এসেছে ড. মখদুম মাশরাফীর কলমে—

‘একটা সময় গেছে যখন জাতীয়তাবাদ গণমুক্তির উদ্দীপনার একটি তাৎপর্যপূর্ণ রূপক হয়ে উঠেছিল যখন মধ্যযুগীয় ইউরোপে চার্চের অত্যাচারে সমাজ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। চার্চের নৈরাজ্যকর ফতোয়া জীবনকে বিপর্যস্ত করেছিল সে সময়। মানুষের মুক্তির অন্বীষ্ট হয়েছিল তখন জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ তখন আবির্ভূত হয়েছিল একটি সেক্যুলার ইউনিট হিসেবে। জাতীয়তাবাদ ছিলো নৈরাজ্যকর ফতোয়াবাজির বিরুদ্ধে একটি প্রায়োগিক সমাধান যা জীবনকে জীবনযোগ্য করে তুলতে পারে। জাতীয়তাবাদ সেদিন একটি দর্শনকে ধারণ করেছিল। সেটি ছিল এই যে মানুষের জীবন মানুষী সিদ্ধান্তের বিষয়। প্রাত্যহিকের যা কিছু তা মানুষ তার প্রসঙ্গে নিজেরাই যেমন বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করবে তেমনি স্থির করবে কোনটা কখন কেন করণীয়। পার্থিব জীবন এবং অপার্থিব বোধের মধ্যে একটি নির্দিষ্টতার রেখাচিহ্ন সর্বোতভাবে অঙ্কিত ও গৃহীত হয়েছিল। এইভাবে জাতীয়তাবাদ হয়ে উঠেছিল একান্তভাবেই মানুষী মুক্তির বিষয়। জাতীয়তাবাদ তখন এক বিবেচনায় ছিলো ইতিবাচক ও গণউত্তরণমুখী। গণউত্তরণমুখী এই জন্যে যে তা গণজীবনে মানুষী প্রশাসনের সুযোগ করে দিয়েছিল। কিন্তু তখনও গণতন্ত্রের ভোর ফোটেনি। মানুষের প্রশাসন-প্রতিনিধি হয়েছিল রাজা। যেহেতু, মানুষ তিনি, তাকে গ্রহণ করা হয়েছিল শাসক হিসেবে। দৈবের বিপরীতে রাজাকে গ্রহণ করা হয়েছিল সাধারণ্যে। এটি ছিল পরিপ্রেক্ষিত ও পরিস্থিতিগত সাধারণ বাধ্যতা। কারণ, তখন সামাজিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক কোন এলাকায় গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের দ্বৈত স্পষ্ট ছিল না। এ দ্বৈত স্পষ্ট হবার জন্য পৃথিবীকে ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

যাই হোক, ঐ ইতিবাচক গণউদ্ধার ধারার পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী সেক্যুলার রাষ্ট্রের জন্যে বিধাতার বিকল্প একটি শক্তির সন্ধান চলেছে কয়েক শতক ধরে যার নাম সার্বভৌমত্ব। একটি কল্পিত সর্বেসর্বা। একটি প্রশ্নাতীত কর্তৃপক্ষ যা অদৃশ্য হয়েও প্রায়োগিক বলে স্বীকৃত। দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতক অবধি চলেছে এর

সন্ধান। দার্শনিক হবস থেকে জিন বডিন পর্যন্ত চলেছে এর তাত্ত্বিক নির্মাণ প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে। এটি ছিল রাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদের আদর্শায়নের একটি কাল। এই ব্যস্ততায় ও নিবেদিতপ্রাণতায় এমনটা ভাবার অবসরই হয়নি যে এর বাইরে বিস্তৃততর আরো কোন আয়তন ও আয়োজন মানুষের পক্ষে অর্জন ও নির্মাণ করা সম্ভব। ভাবনার ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের এই সর্বৈবতা গণমানুষকে তথা মানুষকে জাতীয়তাবাদ সর্বস্ব ও সার্বভৌমত্ব সর্বস্ব মাত্রায় অবরুদ্ধ করেছে। মানুষের আত্মআবিষ্কার এর বাইরে বিস্তৃত হতে পারেনি। এ সময়টায় সমষ্টি মানুষের মুক্তির সমস্ত আয়োজন ও সংগ্রামে জাতীয়তাবাদের পতাকাই হয়েছে ঐ আয়োজন ও সংগ্রামের একক রূপক। মোক্ষ রূপক। সেই সঙ্গে ভাবা হয়েছে মানুষের জন্যে শেষ এবং একান্ত আশ্রয় জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার জন্যে জীবন বাজি রাখার সংকল্প। তার রক্ষা ও প্রতিরক্ষার জন্যে নির্মিত হয়েছে সেনাবাহিনী। যেন অন্যেরা বন্য। যেন আমার জাতিই প্রথম এবং আমার জাতিই শেষ কথা। যেন অন্যেরা অবান্তর। ত্যাগযোগ্য। পরিত্যাজ্য। দমনযোগ্য। এলিয়েন। এভাবে এক সময় জাতীয়তাবাদ ভুল হাতে পড়ে হয়ে উঠেছে ফ্যাসিবাদ। মুসোলিনীদের উত্থান হয়েছে। মানুষ তার আত্মআবিষ্কারের প্রসঙ্গকে ঘিরে বিপর্যস্ত ও নিগৃহীত হয়েছে জাতীয়তাবাদের ঘূর্ণচক্রে। জাতিতে জাতিতে সংঘাত হয়েছে ঘুরে ফিরে বার বার। বোঝাই যায়নি এর ভেতরে ভুল কিছু আছে কি না। এর বাইরে বিকল্প কিছু আছে কি না। অস্ত্র প্রতিযোগিতার অজস্রতার সমাহার এনেছে দেশে দেশে। রাষ্ট্রকে ঘিরে শক্তি ও মর্যাদা সমার্থক বিবেচিত হয়েছে। যে মুক্তিঅর্চনা থেকে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শায়ন হয়েছে এক দিন তাই হয়ে উঠেছে শক্তি ও মর্যাদার অহঙ্কারের উজ্জ্বলতম মঞ্চ। তাই হয়ে উঠেছে মানুষ দমনের ও মানুষ নিপীড়নের হাতিয়ার। বর্তমানের আমেরিকান রিপাবলিকানরা তা জোরেশোরে বলছেও। তারা বলছে আমেরিকার মর্যাদা তার যুদ্ধ ক্ষমতায়। যুদ্ধক্ষমতা ছাড়া আমেরিকার রাষ্ট্র অস্তিত্ব অর্থহীন। এভাবে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে যুদ্ধ বিষয়ক বাস্তব। সংঘাত

বিষয়ক বাস্তব। অন্যকে দমন বিষয়ক বাস্তব। ভয় দেখানোর ও ভয় পাবার বাস্তব। একটি ভয়ঙ্কর বাস্তব।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বেও উপনিবেশে উপনিবেশে জাতীয়তাবাদই হয়েছে স্বাধীনতার রূপক। সাম্রাজ্যবাদের বিপরীত বাস্তব যার ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতা পেয়ে উপনিবেশগুলো হয়েছে একেকটি জাতি রাষ্ট্র। ভাবা হয়েছে এই-ই স্বাধীনতা। সাম্রাজ্যবাদীরাও নতুন প্রেক্ষিতে ইন্ধন জুগিয়েছে জাতীয়তাবাদী ধারণার সমর্থনে। পুঁজিবাদী/সাম্রাজ্যবাদী বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে লিখিয়েছে অনেক তত্ত্ব কথা। তারা জওহর লাল নেহেরুকে দিয়ে তৈরি করেছে ন্যাম-ননএলাইন মুভমেন্টের মত আন্দোলন যা জাতীয়তাবাদকে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মত বিশ্বমুখী আন্দোলনকে প্রতিহত করবে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনই প্রথম যা বিশ্বে জাতীয়তাবাদ উত্তর একটি স্বপ্ন দেখিয়েছিল পৃথিবীকে। এটি অতিকাল্পনিক হয়েছিল যদিও-বা। তার কারণ এটি সমাজের সাংস্কৃতিক প্রস্তুতির আগেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিল। মানুষের চেতনার দুয়ার দিয়ে প্রবেশ না করে এটি রাজনীতির দুয়ার দিয়ে আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজেছিল। সমাজতন্ত্রীরা বুঝতে পারেনি যে সাংস্কৃতিক প্রস্তুতির বাইরে সমাজ পরিবর্তনের কোন শর্টকার্ট নেই। যাই হোক, বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে ধারণা রাজনীতিরও স্বীকার হয়েছে জাতীয়তাবাদ। এই ধারণা রাজনীতির ইন্ধন এসেছে পুঁজিবাদীদের কাছ থেকে। একটি বড়মাপের রাজনৈতিক সাহিত্য সম্ভার এসেছে এর মাধ্যমে যার প্রভাব দেশে দেশে এখনো গভীরভাবে বিরাজিত।

তারপর এসেছে ইতিহাসের আর এক অনন্য সাধারণ ঘটনা—আরব বসন্ত যা প্রথমবারের মত রাষ্ট্রকে প্রতিপন্ন করেছে গণকারাগারে। রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ যার দায় গণমানুষের পাশে দাঁড়ানো সেই কর্তৃপক্ষ গণমানুষের ওপরে বোমাবর্ষণ করেছে। লিবিয়ায়, মিশরে এমন ঘটনা ঘটেছে। রাষ্ট্রের গণকারাগার হবার সবচেয়ে শেষ এবং সবচেয়ে বর্বর উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে সিরিয়ায় আল আসাদের নিষ্ঠুর নেতৃত্বে যেখানে

রাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ নাগরিকের মৃত্যু ঘটছে সরকারের নৃশংস আঘাতে। একই পৃথিবীতে একই সঙ্গে মুক্তির রূপক হয়ে আছে জাতীয়তাবাদ। যেমন ফিলিস্তিনে। যেমন কাশ্মীরে। জাতীয়তাবাদের এ পাশ ব্যাপী, জাতীয়তাবাদের ভেতর-বাহিরব্যাপী কেবল রক্তক্ষরণের ইতিহাস প্রবাহিত হয়ে চলেছে। জাতীয়তাবাদকে ঘিরে ঘটমান রয়েছে অন্তর যুদ্ধ ও বহির্যুদ্ধ। পৃথিবীর ইতিহাসে জাতীয়তাবাদেও সবচেয়ে ভয়াবহ, বিস্তৃত ও বিশ্ব নাড়ানো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে ইউরোপকে কেন্দ্র করে যা বিশ্বযুদ্ধ বলে পরিচিত হয়ে আছে আজও। আজ এটি স্পষ্টভাবে বিদিত যে দুটো বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কার্যকারণ ছিল জাতীয়তাবাদ এর অর্থনৈতিক বা দার্শনিক ব্যাখ্যা যাই থাক। যুদ্ধের প্রায় সর্বৈব ও বিশাল ক্ষতির রূপ ইউরোপে এই জাগৃতি সৃষ্টি করেছিল যে জাতীয়তাবাদের অন্য নাম যুদ্ধ ও শেষ বিশ্লেষণে ধ্বংস। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে বর্তমান ইউরোপই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তির অধিষ্ঠান ক্ষেত্র মহাদেশ। ইউরোপই প্রথম উপলদ্ধি করেছিল যুদ্ধ নয় আলোচনাই কেবল মানুষী জীবনের সকল সঙ্কট উৎরানো যায়। অষ্টাদশ শতকে ওয়েস্ট ফালিয়া চুক্তির ভেতর দিয়েই ইউরোপীয় এই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছিল। অথচ বিস্ময়কর যে ইউরোপই দুটো বিশ্বযুদ্ধ করেছে ওয়েস্ট ফালিয়া চুক্তির কাল পেরিয়ে আর একটি নতুন কালে।

আরো একটি বড় বিস্ময় যে বিশ্বের জন্যে অপেক্ষা করবে তা ভাবা যায়নি। সেও এই জাতীয়তাবাদ নিয়ে। বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে ইউরোপে এই উপলব্ধি বিস্তার লাভ করেছিল যে জাতীয়তাবাদ মানে যুদ্ধ অথবা যুদ্ধের সম্ভাব্যতা। ১৯৫২ সালে ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইউরোপে জাতীয়তাবাদের সমাধি রচনা করে পুরো ইউরোপজুড়ে একটি প্রস্তাব সারা ইউরোপে ফেরি করেছিলেন আর একই উপলব্ধিতে আলোড়িত সারা ইউরোপ সে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল গভীর উদ্দীপনার সাথে। তাদের সবার কাছে এটি প্রতিপন্ন হয়েছিল যে জাতীয়তাবাদ শেষ বিশ্লেষণে যুদ্ধ বৈ কিছু নয়। আর যুদ্ধ মানে ধ্বংস। কোন মুক্তি ও উত্তরণের সম্ভাবনা যুদ্ধে

থাকে না। এই উপলব্ধির ফলশ্রুতি হয়েছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন উত্তরোত্তর বিকশিত হয়েছে। পৌঁছে গেছে ইউরোর মত ইউরোপের জন্যে একটি মুদ্রা প্রচলন পর্যন্ত। এমনকি নোবেল কমিটি এই উপমহাদেশীয় সংগঠনের সংহতি রূপকে আদৃত ও পুরস্কৃত করেছে নোবেল পুরস্কার দিয়ে। ’ (সংক্ষেপিত ও ঈষৎ পরিমার্জিত)

[1] Nairn, Tom; James, Paul (২০০৫)। Global Matrix: Nationalism, Globalism and State-Terrorism। London and New York: Pluto Press।; and James, Paul (২০০৬)। Globalism, Nationalism, Tribalism: Bringing Theory Back In – Volume 2 of Towards a Theory of Abstract Community। London: Sage Publications।

العناصر الأساسية في تكوين القومية هي وحدة اللغة ووحدة التاريخ، وما ينتج عن ذلك من مشاركة في المشاعر والمنازع، وفي الآلام والآمال... (الفكر القومي العربي)

ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ : একটি পর্যালোচনা - ১

ALI HASAN OSAMA·TUESDAY, JULY 24, 2018

ইসলামি শরিয়তে জিহাদ ও তার পূর্বশর্ত

পর্যালোচনা মানেই কিন্তু ভুল ধরা নয়। আমাদের এ পর্যালোচনা একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনা। আমরা এখানে ধারাবাহিকভাবে শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ বইয়ের পর্যালোচনা করব। এ ক্ষেত্রে আমরা তার অস্পষ্ট বক্তব্যগুলোকে স্পষ্ট করব , গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যগুলোকে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র থেকে

বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করব এবং বইয়ের কোথাও কোনো পদস্খলন বা ত্রুটি নজরে পড়লে পাঠককে সে বিষয়েও সতর্ক করব। আমাদের এ পর্যালোচনা মূলত ‘আদ-দীন আন-নাসিহাহ’ তথা দীন হলো হিতকামনা’রই অংশ। পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আমরাও নিজেদের ভুলের ঊর্ধ্বে মনে করি না। তাই সচেতন পাঠক আমাদের যেকোনো ভুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এবং দালিলিকভাবে কোনো বিষয়ের ভুল হওয়াকে প্রমাণিত করলে আমরা নির্দ্বিধায় তা মেনে নেব। আমাদের এ আলোচনা চূড়ান্ত ধাপ নয়; বরং এটা হলো এ বিষয়ের প্রাথমিক ধাপ মাত্র। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সচেতন মহলে পর্যাপ্ত আলোচনা-পর্যালোচনার পরই এ সিরিজ চূড়ান্ত হবে ইন শা আল্লাহ। খসড়া পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আমরা বইয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করব না। বরং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলোকেই প্রথমে করার চেষ্টা করব। পর্যালোচনার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ হওয়ার পূর্বে আমরা পুরো আলোচনাকে আবার নতুন করে ঢেলে সাজাব ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ তাআলাই উত্তম তাওফিকদাতা।

শাইখ খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

জিহাদ অর্থ প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, পরিশ্রম ইত্যাদি। আল্লাহর বিধান পালনে ও প্রচারের সকল শ্রম ও প্রচেষ্টাকেই কুরআন ও হাদিসে কখনো ‘জিহাদ’ বলা হয়েছে। যেমন: কাফির-মুনাফিকদের দাওয়াত দেওয়া ও তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদকে জিহাদ বলা হয়েছে। জালিম শাসকের সামনে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে। হজকে জিহাদ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে। আল্লাহর আনুগত্যমূলক বা আত্মশুদ্ধিমূলক যেকোনো কর্মের চেষ্টাকে জিহাদ বলা হয়েছে। তবে ইসলামি পরিভাষায় ও ফিকহে জিহাদ বলতে ‘কিতাল’ বা মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকেই বোঝানো হয়। ফিকহের পরিভাষায় সর্বদা জিহাদ অর্থ কিতাল বলা হয়েছে। {পৃ. ১০৫}

পর্যালোচনা

১. শাইখ রহ. এখানে প্রথমে জিহাদের শাব্দিক এবং পারিভাষিক অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার এই আলোচনার সঙ্গে আমাদের দ্বিমত নেই। তবে তিনি যেহেতু বিষয়টা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন, অপরদিকে

বইয়ের আলোচ্যবিষয়ের সঙ্গে এর রয়েছে সুগভীর সম্পর্ক, তাই কিছুটা বিস্তর পরিসরে আমরা তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা তুলে ধরব। জিহাদের বিভিন্ন অর্থের প্রতি নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্রের আলোকে আলোকপাত করব।

জিহাদের অর্থ

কোনো শব্দের সাধারণত দু-ধরনের অর্থ থাকে: মূল অর্থ এবং রূপক অর্থ। মূল অর্থ বলা হয় সেই অর্থকে, শব্দকে যার জন্য গঠন করা হয়েছে। শব্দের মূল অর্থ আবার চার ধরনের হয়। শাব্দিক অর্থ, শরয়ি অর্থ, প্রচলিত অর্থ এবং পারিভাষিক অর্থ।[1] কোনো শব্দ যখন এই চার অর্থের কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন শব্দ তার মূল অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আর যখন এই চার অর্থ অতিক্রম করে ভিন্ন কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তা হয় শব্দের রূপক অর্থ। ঠিক তেমনি চারটি অর্থের প্রতিটি যদিও শব্দের মূল অর্থ, কিন্তু প্রয়োগক্ষেত্রের ভিন্নতার কারণে এক প্রকারের মূল অর্থ অন্য প্রকারে গিয়ে পরিণত হয় রূপক অর্থে। যেমন, কোনো শব্দের শাব্দিক অর্থকে তার মূল অর্থ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। কিন্তু শরিয়াহ যখন সেই শব্দটিকে নিজস্ব অর্থে ব্যবহার করে, তখন শাব্দিক অর্থটিই আবার শরিয়াহর দর্পণে হয়ে যায় রূপক অর্থ। যেমন, ‘সালাত’ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো দুয়া। কিন্তু শরিয়াহর দৃষ্টিতে সালাতের অর্থ হলো নামাজ। এখন শরিয়াহ যদি কখনো ‘সালাত’কে দুয়া অর্থে ব্যবহার করে, তবে তা হবে তার রূপক অর্থ। কারণ, ‘সালাত’ শব্দের শরয়ি অর্থ একটাই, আর তা হলো নামাজ। তাই যখন শরিয়াহ শব্দটিকে নামাজ ছাড়া অন্য কোনো অর্থে ব্যবহার করবে, তখন তা রূপক অর্থ হিসেবেই বিবেচিত হবে, যদিও আদতে তা শব্দের শাব্দিক অর্থই।[2] আবার ভাষাবিদরা যখন ‘সালাত’কে দুয়া অর্থে ব্যবহার না করে নামাজ অর্থে ব্যবহার করবে, তখন তাদের সমাজে তা বিবেচিত হবে শব্দের রূপক অর্থ হিসেবে, যদিও আদতে তা শব্দের শরয়ি অর্থই।[3]

এবার আমরা জিহাদ শব্দের চারও ধরনের অর্থ নিয়ে আলোচনা করবো। যদিও এখানে আমাদের শরয়ি অর্থটিই শুধু প্রয়োজন, এরপরও আমরা সব ধরনের অর্থের ওপরই সামান্য আলোকপাত করবো, যাতে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

জিহাদের শাব্দিক অর্থ

দু-পক্ষের মাঝে প্রতিরোধ গড়ার স্বার্থে শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করাকে জিহাদ বলা হয়, তা প্রত্যক্ষভাবে হোক কিংবা পরোক্ষভাবে হোক। [4] পরোক্ষ যেমন নফসের সঙ্গে জিহাদ। এক্ষেত্রে মানুষের ভেতর দুটি বিপরীতমুখী আগ্রহ জেগে উঠে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং প্রবল হওয়ার উদ্দেশ্যে একটি অপরটির সঙ্গে জিহাদ করে।

ব্যয়িত শক্তি-সামর্থ্য আবার অনেক ধরনের হতে পারে, হতে পারে তা অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে কিংবা হতে পারে অস্ত্র ছাড়া; হতে পারে তা সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে কিংবা হতে পারে সম্পদ ছাড়া; হতে পারে কথার মাধ্যমে কিংবা হতে পারে কাজের মাধ্যমে; তেমনি কোনো কথা বা কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমেও তা হতে পারে, যেমন: কারও বাবা-মা তাকে স্রষ্টার অবাধ্যতার নির্দেশ দিলো এবং সেই অপরাধে লিপ্ত হওয়ার জন্য তার ওপর চাপ প্রয়োগ করলো, আর সে তাদের নির্দেশ পালন করা থেকে কষ্ট করে বিরত থাকলো এবং তাদের চাপের মুখে ধৈর্যধারণ করলো; ঠিক তেমনি কারও নফস তাকে হারাম কাজে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করলো আর সে নফসের সঙ্গে লড়াই করে তা থেকে বিরত থাকলো—শাব্দিক অর্থের বিচারে এ সবকিছুর ওপরই জিহাদ শব্দ প্রযোজ্য হবে।[5]

হাশিয়াতুল জামালে এসেছে, ‘জিহাদ হলো প্রচণ্ডতার ওপর ধৈর্যধারণ করার নাম—কখনো তা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে আর কখনো হয় নফসে।’[6] সুতরাং

এই জিহাদের ক্ষেত্রে মুমিনের প্রতিপক্ষ হতে পারে তার নফস, শয়তান, পাপাচারী কিংবা কুফফার গোষ্ঠী।

আল্লামা নিশাপুরি তার তাফসিরগ্রন্থে বলেন, ‘জিহাদ হলো লক্ষ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা-পরিশ্রম ব্যয় করার নাম।’[7] এ সংজ্ঞার বিচারে আল্লাহর পথে কুফফার গোষ্ঠীর বিপক্ষে পরিচালিত যুদ্ধে ব্যয়িত চেষ্টা-পরিশ্রমকেও যেমনি জিহাদ বলা হবে, তেমনি শয়তানের পথে কুফফার গোষ্ঠীর পারস্পরিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়িত চেষ্টা- পরিশ্রমকেও জিহাদ বলা হবে। কারণ, শাব্দিক অর্থের বিচারে যেকোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যয়িত চেষ্টা-পরিশ্রমকেই জিহাদ বলা হচ্ছে। লক্ষ্যের স্বভাব-প্রকৃতি এবং গুণ-মান এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়। আর তাই আল-কুরআনও কাফির বাবা-মা কর্তৃক সন্তানদের ইমান থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগকে জিহাদ শব্দে ব্যক্ত করেছে।[8]

জিহাদের শরয়ি অর্থ

শরিয়াহ কুরআন এবং সুন্নাহয় জিহাদ শব্দটিকে তার শাব্দিক ব্যাপক অর্থ থেকে স্থানান্তরিত করে এক বিশেষ অর্থের মাঝে সীমাবদ্ধ করেছে। আর তা হলো, ‘আল্লাহর পথে পরিচালিত লড়াইয়ে শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করা—হোক তা প্রত্যক্ষ উপস্থিতি কিংবা আর্থিক সহযোগিতা; উত্তম পরামর্শ প্রদান কিংবা সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা প্রভৃতি।’[9] চারও মাযহাবে স্বীকৃত মত এটি।[10] উল্লেখ্য, যেহেতু ইসলামে জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে রাসুলুল্লাহ সা.-এর মাদানি জীবনে, তাই মাক্কি জীবনে অবতীর্ণ আয়াতগুলোতে[11] ব্যবহৃত জিহাদ শব্দ তার শাব্দিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, শরয়ি অর্থে নয়, যেহেতু তখন পর্যন্ত শরিয়াহর এই বিধানটি অবতীর্ণই হয়নি।

রাসুলুল্লাহ সা .-এর পবিত্র মুখ থেকেও আমরা জিহাদের শরয়ি অর্থ জেনে নিতে পারি।

قَالَ : فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " الْجِهَادُ " ، قَالَ : وَمَا الْجِهَادُ ؟ قَالَ : أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ ثُمَّ لا تَغُلَّ وَلا تَجْبُنْ

এক সাহাবি রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন , কোন হিজরত উত্তম ? তিনি বললেন , জিহাদ। সাহাবি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন , জিহাদ কী ? তিনি বললেন , কাফিরদের মুখোমুখি হলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। আর এ ক্ষেত্রে তুমি খেয়ানত করবে না এবং ভীরুতা প্রদর্শন করবে না। [22]

وما الجهاد؟ قال : أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم . قال : فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عُقر جواده، وأهريق دمه

রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো , জিহাদ কী ? তিনি উত্তর দিলেন , কাফিরদের মুখোমুখি হলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। জিজ্ঞেস করা হলো , কোন জিহাদ উত্তম ? তিনি ﷺ বললেন, ওই ব্যক্তির জিহাদ , যার ঘোড়া নিহত হয় এবং তার নিজের রক্ত প্রবাহিত হয় (অর্থাৎ সে নিজেও শহিদ হয়)। [23]

রাসুল ﷺ বলেন,

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

যে আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে , সে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে। [24]

জিহাদের প্রচলিত অর্থ

ইসলামের সূচনাকালেই জনসমাজে জিহাদ শব্দটি তার শাব্দিক অর্থ থেকে পরিবর্তিত হয়ে শরয়ি অর্থে ব্যবহারের প্রচলন শুরু হয়েছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, জিহাদ শব্দ ব্যবহার করা হলে কিতাল (লড়াই) ছাড়া অন্য কোনো অর্থ কেউ ধারণা করে না।[12]

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ চার শাস্ত্র ফিকহ, হাদিস, তাফসির এবং সিরাতের বিদগ্ধ আলিমগণ জিহাদ শব্দের জন্য ভিন্ন কোনো পারিভাষিক অর্থ গঠন করেননি, বরং তারা শব্দটিকে তার শরয়ি অর্থেই ব্যবহার করেছেন। এর ভিত্তিতেই আল্লামা কাসতাল্লানি r তার সহিহ বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থে জিহাদের সংজ্ঞা এভাবে উল্লেখ করেছেন, ‘পরিভাষায় জিহাদ হলো, ইসলামের সাহায্যের জন্য এবং আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য কাফিরদের সঙ্গে লড়াই করা।’[13]

সারকথা

মৌলিকভাবে জিহাদের দুটি অর্থ। এর শাব্দিক অর্থ হলো, ‘দুপক্ষের মধ্যে প্রতিরোধ গড়ার স্বার্থে শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করাকে জিহাদ বলা হয়, তা প্রত্যক্ষভাবে হোক কিংবা পরোক্ষভাবে হোক।’

আর শরয়ি, প্রচলিত এবং পারিভাষিক অর্থ হলো, ‘আল্লাহর পথে লড়াই করা।’ হাঁ, এর জন্য শর্ত রয়েছে, স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে, তা ভিন্ন প্রসঙ্গে। যথাস্থানে আমরা তার ওপর আলোকপাত করব।

সুতরাং শরিয়াহর নুসুসে (আয়াত, কিংবা আসারে) যখন জিহাদ শব্দটি প্রয়োগ হবে তখন এর অর্থ হবে ‘আল্লাহর পথে লড়াই’। কখনো যদি তাতে পারিপার্শ্বিক কোনো আলামতের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, শব্দটি

এখানে তার শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তখন তা শব্দের মূল অর্থ হিসেবে বিবেচিত না হয়ে রূপক অর্থ হিসেবে বিবেচিত হয়।

এখানে একটি বিষয় সবিশেষ উল্লেখ্য, জিহাদের এই বিশেষ অর্থটি প্রয়োগ হবে রাসুলুল্লাহ সা.-এর মাদানিজীবনে অবতীর্ণ আয়াত এবং বর্ণিত হাদিসগুলোতে। মাক্কিজীবনে অবতীর্ণ আয়াত এবং বর্ণিত হাদিসগুলোতে যখন 'জিহাদ' শব্দ প্রয়োগ হয় তখন তার দ্বারা শরয়ি জিহাদ উদ্দেশ্য হয় না; বরং শাব্দিক জিহাদ উদ্দেশ্য হয়। কুরআনে এ ধরনের আয়াত রয়েছে চারটি: সুরা আনকাবুতে তিনটি আয়াত, যথাক্রমে ৬, ৮ এবং ৬৯ নম্বর আয়াত। আর সুরা লুকমানে একটি আয়াত, ১৫ নম্বর আয়াত। এ ছাড়া পবিত্র কুরআনের যেখানে যেখানে 'জিহাদ' শব্দটি এসেছে, সব জায়গায় এর দ্বারা শরয়ি, প্রচলিত এবং পারিভাষিক অর্থই উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

একইভাবে বিশেষ কিছু প্রেক্ষাপটে অল্প কয়েকটি হাদিসে বিশেষ কিছু কাজকে জিহাদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এটাও শাব্দিক অর্থের বিবেচনায় করা হয়েছে। যেমন: 'জালিম শাসকের সামনে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে।' এখানে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে; কারণ, এতে জীবনের ঝুঁকি রয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য আসন্ন বিপদকে অম্লানবদনে বরণ করে নেওয়ার বিষয় রয়েছে। ইমাম খাত্তাবি রহ. বলেন,

إنما صار ذلك أفضل الجهاد، لأن من جاهد العدو وكان متردداً بين رجاء وخوف لا يدري هل يَغْلِب أو يُغلَب، وصاحب السلطان مقهور في يده، فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف وأهدف نفسه للهلاك، فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف

'এটা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হিসেবে অভিহিত হয়েছে; কারণ, যে শত্রুর সঙ্গে জিহাদ করে এবং সে আশা ও ভীতির মধ্যে দোদুল্যমান থাকে, সে

[illegible][14]

[illegible]

وَإِنَّمَا كَانَ أَفْضَلَ ; لِأَنَّ ظُلْمَ السُّلْطَانِ يَسْرِي فِي جَمِيعِ مَنْ تَحْتَ سِيَاسَتِهِ، وَهُوَ جَمٌّ غَفِيرٌ، فَإِذَا نَهَاهُ عَنِ الظُّلْمِ فَقَدْ أَوْصَلَ النَّفْعَ إِلَى خَلْقٍ كَثِيرٍ، بِخِلَافِ قَتْلِ كَافِرٍ

[illegible][15]

[illegible] ‘[illegible]’ [illegible]—

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور

[illegible][16]

[illegible]

الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ

[illegible][17]

[illegible]

جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

[illegible][18]

[illegible]

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

[illegible][19]

[illegible]

[illegible]

قَالَ أَبُو العَالِيَةِ: صَلاَةُ اللَّهِ: ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ المَلاَئِكَةِ، وَصَلاَةُ المَلاَئِكَةِ الدُّعَاءُ

[illegible][20]

[illegible]

الصَّلاةُ مِنَ اللَّهِ: الرَّحْمَةُ، وَمِنَ الْمَلائِكَةِ: الاسْتِغْفَارُ، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ: الدُّعَاءُ.

[illegible][21]

[illegible]

[illegible]

বি. দ্র. কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এ বিষয়ক আলোচনা পরিষ্কারভাবে বোঝার সুবিধার্থে নিচের লেখাটি পড়া যেতে পারে:

‘ বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি’র নামের অসারতা

পাদটীকা

[1] ইরশাদুল ফুহুল, শাওকানি: ২০; উসুলুল ফিকহ, আবুন নুর যুহাইর: ২/৫২; আলইহকাম ফি উসুলিল আহকাম, আমুদি: ১/২৭; আলফুরুক, কারাফি: ৩/৮৫

[2] উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য—মুসনাদু আহমাদ: ৩/৪৯৮; সুনানু আবি দাউদ: ৫১৪২; সুনানু ইবনি মাজাহ: ৩৬৬৪

[3] ইজাবাতুস সায়িল, সানআনি: ২৬২; উসুলুল ফিকহিল ইসলামি, ড. ওয়াহবা যুহাইলি: ১/২৯৩

[4] আলকামুসুল মুহিত, লিসানুল আরব, আলমুনজিদ: ‘জুহদুন’ শব্দমূলের অধীনে; শারহুল কাসতাল্লানি আলা সাহিহিল বুখারি: ৫/৩০; বাদায়িউস সানায়ি: ৭/৯৭। সবগুলো গ্রন্থের সারনির্যাস হলো আমাদের উল্লেখিত সংজ্ঞা।

[5] লিসানুল আরব: ‘জুহদুন’ শব্দমূলের অধীনে; তাফসির ফাতহুল কাদির, শাওকানি: ৪/১৯৩

[6] হাশিয়াতুল জামাল আলাল জালালাইন: ৩/৪৪১

[7] তাফসিরুন নাইসাবুরি: ১০/১২৬

[8] দ্রষ্টব্য—সুরা আনকাবুত (২৯) : ৮; সুরা লুকমান (৩১) : ১৫

[9] ফাতাওয়া শামি: ৩/৩৩৬

[10] দ্রষ্টব্য—বাদায়িউস সানায়ি: ৭/৯৭; মিনাহুল জালিল: ৩/১৩৫; হাশিয়া আলা শারহিল খাতিব: ৪/২২৫; আলমুহাযযাব: ২/২২৭

[11] আয়াতগুলো এই—সুরা আনকাবুত (২৯) : ৬, ৮, ৬৯; সুরা লুকমান (৩১) : ১৫

[12] উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য—আলমুসান্নাফ, ইবনু আবি শাইবা: 5/335, 341, 342

[13] শারহুল কাসতাল্লানি আলা সাহিহিল বুখারি: ৫/৩০

[14] মাআলিমুস সুনান: ৪/৩৫০

[15] মিরকাতুল মাফাতিহ: ৬/২৪১২; তুহফাতুল আহওয়াজি: ৬/৩৩০

[16] সহিহ বুখারি: ১৪৪৮; ফাতহুল বারি: ৩/৩৮২

[17] সুনানু ইবনি মাজাহ: ২৯০২; মুসনাদু আহমাদ: ২৬৫২০, ২৬৫৮৫

[18] মুসনাদু আহমাদ: ৯৪৫৯; আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকি: ৮৭৫৯

[19] সুরা আহজাব: ৫৬

[20] সহিহ বুখারি: ৬/১২০

[21] শারহুস সুন্নাহ: ৩/১৮৯

[22] শুয়াবুল ইমান , বায়হাকি : ২০; কানজুল উম্মাল : ১/৭২; মাজমাউজ যাওয়ায়িদ : ১/৫৯

[23] মুসনাদে আহমদ : ১৬৬৯১

[24] সহিহ বুখারি : ১২০; সহিহ মুসলিম : ৩৫২৫

তাকফিরের শর্ত , প্রতিবন্ধকতা ও কারণ

ALI HASAN OSAMA·WEDNESDAY, AUGUST 15, 2018

আলোচ্য অংশটি নেয়া হয়েছে শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল -মাকদিসির রচিত “ الرسالة الثلاثينية - নামক গ্রন্থের শাইখ হারিস বিন গাযী আন -নাযযারি রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত মুখতাসার থেকে। এ গ্রন্থটি মূল আরবীতে পড়তে পারেন নিচের লিঙ্ক থেকে - https://azelin.files.wordpress.com/2015/07/shaykh-abc5ab-mue1b8a5ammad-al-maqdisc4ab-22the-thirtieth-message-in-warning-from-the-extremists-in-the-use-of-takfc4abr22.pdf

ইনশাআল্লাহ অতি শীঘ্রই বাংলায় অনুদিত বইটি প্রকাশিত হবে। তাকফিরের ব্যাপারে শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল -মাকদিসি এবং ইরজা ও গুলু থেকে মুক্ত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাহর সঠিক অবস্থান জানার জন্য ইনশাআল্লাহ এ কিতাবটি অত্যন্ত উপকারী হবে। ভাসাভাসা আলোচনার পরিবর্তে যারা বিস্তারিত ও বিশদ আলোচনা পড়তে পছন্দ করেন , এবং আমানতদারি ও ইনসাফের নীতির উপর আমল করেন , আশা করি তাঁরা উপকৃত হবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাকফিরের শর্ত , প্রতিবন্ধকতা ও কারণ

আল্লাহ সুবহানাহুতা ’লা আমাদের প্রতি এবং আপনার প্রতি রহম করুন ! জানা আবশ্যক , এই স্পর্শকাতর শরঈ ’ হুকুমটির অনেক শর্ত , প্রতিবন্ধক ও কারণ রয়েছে। আপনাকে এগুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে , এগুলোর ব্যাপারে সচেতন হতে হবে এবং জানতে হবে।

এর প্রতি লক্ষ রাখা , বোঝা ও শেখার ক্ষেত্রে অনেকেই ত্রুটি করেছে। ফলে তারা মুহাম্মদ এর উম্মতের ওপর তাকফিরের তরবারি ও দাঁত এমনভাবে বসিয়ে দিয়েছে , তাতে নেককার , গুনাহগার আর কাফেরের মাঝে কোনো তারতম্য করেনি।

এই স্পর্শকাতর বিষয়টিতে স্পষ্ট দলিলের ওপর থাকার জন্যে আমি এখানে তাকফিরের শর্ত , প্রতিবন্ধক ও কারণসমূহের ব্যাপারে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করছি। আর ‘তাকফিরের বিচ্যুতিসমূহ ’ পরিচ্ছেদে অতিরিক্ত বিবরণ ও উদারহণ আসবে; কারণ সেটাই হলো এর বাস্তব প্রয়োগ ও বিশদ বিবরণের স্থান।

প্রথমত *: شروط (শর্তাবলি) :*

শরিয়তের পরিভাষায় شرط হলো, যার উপস্থিতি কোনো কিছুর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিকে আবশ্যক করে না , তবে তার মشروط (শর্তকৃত বিষয়টি) এর অনুপস্থিতিকে আবশ্যক করে।

অর্থাৎ এভাবে বলি , আমাদের আলোচ্য বিষয়ে শর্ত হচ্ছে যার উপস্থিতির ওপর তাকফিরের হুকুমটির উপস্থিতি নির্ভর করে। ফলে তার উপস্থিতি হুকুমের উপস্থিতিকে আবশ্যক করে না , কিন্তু তার অনুপস্থিতি হুকুমের অনুপস্থিতিকে বা বাতিল হওয়াকে আবশ্যক করে।

উদাহণস্বরূপ , إختيار (স্বাধীনতা) থাকা তাকফিরের একটি শর্ত , যা مانع الإكراه (বলপ্রয়োগ জনিত প্রতিবন্ধকতা) এর বিপরীত। সুতরাং যখন إختيار

থাকবে না তখন তাকফিরের বিধানও প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু إختيار এর উপস্থিতিই কারও কুফরিতে লিপ্ত হওয়া বা তা গ্রহণ করে নেয়াকে আবশ্যক করে না।

তাকফিরের শর্তাবলি তিনভাগে বিভক্ত :

প্রথম প্রকার : شروط في الفاعل (কর্তার শর্তাবলি) :

১। مكلف তথা প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিস্ক হওয়া।

২। متعمد قاصد لفعله অর্থাৎ উক্ত কাজের ইচ্ছা থাকা।

৩। مختار له بإرادته অর্থাৎ ইচ্ছায় স্বাধীন হওয়া।

এই প্রকারটির (অর্থাৎ شروط في الفاعل এর) আলোচনা তার বিপরীত موانع তথা প্রতিবন্ধকসমূহের আলোচনায় আসবে। কারণ , موانع হলো شروط এর বিপরীত , যা সামনে আসবে।

দ্বিতীয় প্রকার : شروط في الفعل (কাজের শর্তাবলি), অর্থাৎ যে কাজটি হুকুমের কারণ , তার মধ্যে প্রযোজ্য শর্তাবলি।

এর সবগুলো শর্তের মূলকথা হলো : কাজটি সন্দেহাতীতভাবে কুফরি হওয়া। আর শর্তগুলো হচ্ছে :

১। ব্যক্তির কথা বা কাজটি কুফরের অর্থ বোঝাতে স্পষ্ট হওয়া।

২। উক্ত কথা বা কাজের ফলে যে শরঈ ’ দলিলটি তাকে কাফের সাব্যস্ত করে , উক্ত দলিলটিও কাফের সাব্যস্ত করতে স্পষ্ট হওয়া।

এই প্রকারটির আলোচনা ও দৃষ্টান্তসমূহ এর শর্তদ্বয়সহ ‘তাকফিরের বিচ্যুতিসমূহ’ পরিচ্ছেদে মুহতামাল বিষয়সমূহের দ্বারা তাকফির করার আলোচনা প্রসঙ্গে আসবে।

তৃতীয় প্রকার : شروط في إثبات فعل المكلف (ব্যক্তির কাজটি প্রমাণিত হওয়ার জন্য শর্তাবলি)। অর্থাৎ কাজটি বিশুদ্ধ শরঈ’ পদ্ধতিতে প্রমাণিত হওয়া; কোনো ধারণা, অনুমান, সন্দেহ বা সংশয় দ্বারা না হওয়া।

আর তা হবে :

১। হয়তো স্বীকারোক্তি দ্বারা।

২। অথবা প্রমাণ, তথা দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা।

‘তাকফিরের বিচ্যুতিসমূহ’ আলোচনা প্রসঙ্গেও এর আলোচনা আসবে।

দ্বিতীয়ত *: موانع (*প্রতিবন্ধকসমূহ*) :*

موانع হলো এমন বাহ্যিক ও সুনির্দিষ্ট গুণ, যার উপস্থিতি হুকুমের অনুপস্থিতিকে আবশ্যক করে অর্থাৎ হুকুমকে বাতিল করে দেয়। তবে এর অনুপস্থিতি হুকুমের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি কোনোটিকেই আবশ্যক করে না। যেমন, বলপ্রয়োগ তাকফিরের একটি প্রতিবন্ধক। সুতরাং তার উপস্থিতি, তথা যদি কাউকে কুফরের ব্যাপারে বলপ্রয়োগ করা হয়, তবে তা কুফরের বিধানটির অনুপস্থিতি বা বাতিল হওয়াকে আবশ্যক করবে। তবে বলপ্রয়োগ না থাকা কোনো হুকুমের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিকে আবশ্যক করে না। অর্থাৎ শরিয়তের আওতাভুক্ত ব্যক্তির স্বাধীন থাকা বা বলপ্রয়োগাধীন না থাকাই তার কুফরি করা বা না করাকে আবশ্যক করে না; ও □□□□□□□□□□موانع বরং সে কুফরি করতেও পারে, নাও করতে পারে। এ কারণে

মতো তিন প্রকার হবে। এগুলো পুরোপুরি শর্তাবলির প্রকারসমূহের : বিপরীত

প্রথম প্রকার : موانع في الفاعل (কর্তার মাঝে প্রতিবন্ধকসমূহ) :

তা হচ্ছে কর্তার এমন عارضي (প্রাসঙ্গিক বা পরিপার্শ্বিক) সমস্যা , যার ফলে কথা ও কাজে তার জবাবদিহিতা থাকে না। এগুলো عوارض الأهلية বা 'যোগ্যতার সমস্যা ' বলে পরিচিত। তা দুই প্রকার :

[ক] এমন সমস্যাবলি , যেগুলোকে (سماوية) আসমানি বলা হয়ে থাকে। কারণ তা অর্জনে বান্দার কোনো ভূমিকা থাকে না। যেমন , শিশু হওয়া , পাগল হওয়া, জ্ঞান লোপ পাওয়া , ভুলে যাওয়া ইত্যাদি। অতএব , এ প্রতিবন্ধকসমূহ তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে গুনাহ ও শাস্তি উঠিয়ে নেবে। কারণ , এ ব্যাপারে তার ওপর শরিয়তের আদেশই ওঠে গেছে।

তবে বান্দার হকের জন্য তাকে ধরা হবে। যেমন , নষ্ট করে ফেলা জিনিসের মূল্য দিতে হবে , দিয়্যত ওয়াজিব হবে এবং এ ধরনের যে বিধানগুলো আছে , সেগুলো কার্যকর হবে। কারণ , এগুলো হলো প্রাকৃতিক বিধান।

এই প্রতিবন্ধকগুলোর বিপরীত শর্তগুলো হচ্ছে :

১। 'প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া ' শর্তটির বিপরীত প্রতিবন্ধক হলো শিশু হওয়া।

২। 'সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া ' শর্তটির বিপরীত প্রতিবন্ধক হলো পাগল হওয়া বা জ্ঞান লোপ পাওয়া।

৩। 'ইচ্ছা থাকা ' শর্তটির বিপরীত প্রতিবন্ধক হলো ভুলে যাওয়া।

[খ] عوارض مكتسبة (মানবার্জিত প্রতিবন্ধকসমূহ) : যেগুলো অর্জনে বান্দার কিছুটা اختيار বা স্বাধীনতা থাকে। মানবার্জিত প্রতিবন্ধকগুলো হচ্ছে :

(১) الخطأ (ভুল করা) : যেমন মুখ ফসকে বের হয়ে যাওয়া , অর্থাৎ ইচ্ছা না থাকা। ফলে কুফরি কথা বললো , কিন্তু তা তার ইচ্ছায় ছিল না বা কাফের বানিয়ে দেয় এমন কথা বা কাজ সে করতে চায়নি , বরং তার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। এই প্রতিবন্ধকটি বাতিল হয়ে যাবে তার বিপরীত ইচ্ছার শর্তটি পাওয়া গেলে। তার দলিল হলো , আল্লাহ সুবহানাহুতা ’লার বাণী -

وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ، ولكن ما تعمدت قلوبكم

“তোমাদের দ্বারা কোনো ভুল হয়ে গেলে সেজন্য তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না। কিন্তু তোমরা কোনো কাজ অন্তর দিয়ে জেনে -বুঝে করলে (তাতে তোমাদের গুনাহ হবে)।” (আহযাব-৫০)

ঐ ব্যক্তির ঘটনাও আরেকটি প্রমাণ —এক ব্যক্তি মরুভূমিতে তার সওয়ারি হারিয়ে ফেলে , তারপর যখন তা পায়, তখন আনন্দের আতিশয্যে ভুলবশত বলে ফেলে, ‘হে আল্লাহ ! তুমি আমার বান্দা আমি তোমার মনিব ’। ঘটনাটি রাসুল ﷺ বলেছেন।

এই প্রতিবন্ধকটির মতোই আরেকটি হলো , অন্যের কাছ থেকে বর্ণনা করতে কুফরি কথা বলা।

যেমন আল্লাহ সুবহানাহুতা ’লা তার কিতাবে কাফেরদের যে সমস্ত কথাবার্তা বর্ণনা করেছেন কেউ তা পাঠ করলো। যেহেতু আল্লাহই তার কিতাব তিলাওয়াত করার আদেশ করেছেন তাই তার পাঠকারীকে নিঃসন্দেহে তাকফির করা হবে না ; বরং সে সওয়াব পাবে। অনুরূপভাবে সাক্ষী ব্যক্তি , যে কুফরি কথা শুনেছে। তার জন্য উক্ত কথা কাজি বা অন্য

কারও কাছে বর্ণনা করা। অনুরূপ কাফেরদের কথাবার্তা বর্ণনা করা, তার বিভ্রান্তি বর্ণনা করার জন্য বা তার জবাব দেওয়ার জন্য। এ সবগুলো জায়েয, বরং ওয়াজিব। এর কারণে তার বক্তাকে কাফের বলা যাবে না। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে, কুফর বর্ণনাকারী কাফের নয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হলো, যারা তাকে ভাল মনে করে ও সমর্থন করে তার প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে তা বর্ণনা করে; এটা নিঃসন্দেহে কুফর। আর এ সমস্ত অবস্থা চিহ্নিতকরণে অবস্থার লক্ষণসমূহের ভূমিকা রয়েছে।

কাজী ইয়াজ (রহঃ) বলেন, “কারও এমন কথা অন্যের কাছ থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার বর্ণনা ভঙ্গি লক্ষ করা হবে। আর বর্ণনা ভঙ্গির অবস্থাভেদে এর হুকুম চার ধরনের হবে: কখনো তা বর্ণনা করা ওয়াজিব হবে, কখনো মানদূব হবে, কখনো মাকরূহ হবে আবার কখনো হারাম হবে।”

(আশ শিফা ২/৯৯৭-১০০৩)

দৃষ্টি আকর্ষণ:

এ আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছেন, ‘ইচ্ছা না থাকা’ বলে সেই প্রতিবন্ধক বুঝানো হয় না, যেটাকে বর্তমান যামানার অনেক মুরজিয়ারা শর্ত করে থাকে এবং যা তাকফিরের অসম্ভব শর্তের মতো। তারা এর দ্বারা তাগুতগোষ্ঠী, যিন্দীক ও মুরতাদদের পক্ষে অজুহাত দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। তারা দাবি করে থাকে, কোনো মানুষ যদি কুফরি কথা বা কাজ ইচ্ছাকৃতও করে, তথাপি তাকে ততক্ষণ তাকফির করা যাবে না, যতক্ষণ সে এর দ্বারা দ্বীন থেকে বের হওয়া ও কুফরি করার ইচ্ছা না করে। এখানে ‘ইচ্ছা না থাকা’ প্রতিবন্ধকটির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ভুল করা, যা ইচ্ছার বিপরীত এবং যা তাকফিরের শর্ত। অথবা কারও কুফরি কথা বলা বা কাজ করার ইচ্ছা না থাকা, বরং তার অন্যকিছু উদ্দেশ্য থাকা। যেমন, কুফরি কথা বর্ণনা করলো, অথবা তা থেকে সতর্ক করলো, অথবা অর্থ না

বুঝে কুফরি কথা বললো , অথবা এ জাতীয় ভুল করলো, যেমনটা আগে আলোচিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করা বা উক্ত কথা বা কাজের মাধ্যমে কুফরি করার ইচ্ছা করা , এটা তো কম লোকই ইচ্ছা করে বা স্পষ্টভাবে বলে। এমনকি ইহুদি ও খৃষ্টানদেরও যদি জিজ্ঞেস করা হয় , তারা যে ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে , বা ওযায়েরকে আল্লাহর পুত্র বলে , বা এ জাতীয় অন্যান্য কুফরিগুলো করে , এর দ্বারা কি তারা কুফরি করার ইচ্ছা করে ? তাহলে তারা তা অস্বীকার করবে এবং এর মাধ্যমে কুফরি করার কথা নাকচ করে দেবে।

যেমন, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) আস সারিমিল মাসলুল কিতাবে ১৭৭-১৭৮ নং পৃষ্ঠায় বলেন , "মোটকথা, যে কোনো কুফরি কথা বলে , বা কুফরি কাজ করে, এর কারণে তাকে কাফের আখ্যা দেওয়া হবে। যদিও এতে সে কাফের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা না করে। কেননা কেউই কুফরি করার ইচ্ছা করে না , একমাত্র আল্লাহ ব্যতিক্রম যা চান। "

এখানে সারকথা হলো , ইচ্ছা থাকার শর্ত করা ও ইচ্ছা না থাকাকে প্রতিবন্ধক মনে করার ক্ষেত্র শুধু কুফরি কাজটির ইচ্ছা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ; কাজটির মাধ্যমে আলাদা করে কুফরের ইচ্ছা করা জরুরি নয়।

(২) التأويل (ব্যাখ্যা করা):

এখানে ব্যাখ্যা করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো , শরঈ' কোনো দলিলকে অনুপযুক্ত জায়গায় প্রয়োগ করা , কোনো ইজতিহাদ তথা অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে , অথবা শরঈ' বর্ণনা না বুঝা থেকে সৃষ্ট সংশয়ের কারণে , অথবা শরঈ' বর্ণনা ভুল বুঝে সেটাকে সঠিক মনে করার কারণে , অথবা যা দলিল নয় তাকে দলিল বোঝার কারণে। যেমন দুর্বল হাদিসকে সহিহ

মনে করে তা দিয়ে দলিল পেশ করা। ফলে একজন শরঈ’ দায়িত্বশীল ব্যক্তি কোনো কুফরি কাজে লিপ্ত হয়, কিন্তু সে সেটাকে কুফরি বলে মনে করত না। এর ফলে ‘ইচ্ছা থাকা’ শর্তটি পাওয়া যাবে না। ফলে ব্যাখ্যার এই ভুলটি তাকফিরের জন্য একটি প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে।

সুতরাং, যদি তার কাছে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয় এবং তার ভুল স্পষ্ট করে দেওয়া হয় এবং এরপরও সে নিজ কর্মে অনড় থাকে, তখন তাকে তাকফির করা হবে।

এর দলিল হলো, এই ধরনের ব্যাখ্যাকে ঐ সব ভুলের অন্তর্ভুক্ত ধরার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন, যেগুলো আল্লাহ সুবহানাহুতা’লা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা পূর্বোক্ত দলিলাদির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের ইজমার ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল কুদামা ইবনে মাজউনের ঘটনার প্রেক্ষিতে, যখন তিনি নিম্নোক্ত আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করে তার সাথীদের নিয়ে মদ পান করেছিলেন:

ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين

“যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা-কিছু খেয়েছে তার কারণে তাদের কোনোও গুনাহ নেই - যদি তারা আগামীতে তা হতে বেঁচে থাকে, ইমান রাখে ও সৎকর্মে রত থাকে এবং *(আগামীতে যেসব জিনিস নিষেধ করা হয় তা থেকে)* বেঁচে থাকে ও ঈমানে প্রতিষ্ঠিত থাকে আর তারপরে তাকওয়া ও ইহসান অবলম্বন করে। আল্লাহ ইহসান অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন।” *(মায়িদাহ : ৯৩)*

ঘটনাটি আব্দুর রাজ্জাক তার মুসান্নাফে বর্ণনা করেছেন,

কুদামা (রাঃ)-কে হযরত উমার (রাঃ) বাহরাইনের গভর্নর বানিয়েছিলেন। এরপর যখন তার বিরুদ্ধে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও অন্যান্যরা সাক্ষ্য দেন এবং তাঁদের সাথে তাঁর স্ত্রীও সাক্ষ্য দেন যে, তিনি মদ পান করেছেন, তখন উমার (রাঃ) তাঁকে ডেকে এনে পদচ্যুত করেন। তারপর তাঁর ওপর হদ প্রয়োগ করতে উদ্যত হলে কুদামা (রাঃ) উল্লেখিত আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করেন। তখন উমার (রাঃ) বলেন, তুমি ব্যাখ্যায় ভুল করেছ। তোমার নিতম্ব গর্ত অনুসন্ধানে ভুল করেছে।...

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) আস সারিমিল মাসলুল কিতাবে বলেন,

“অবশেষে তার সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ পরিষদের সিদ্ধান্ত এ ব্যাপারে ঐক্যমত হলো যে, তাঁর ও তাঁর সাথীদের কাছ থেকে তাওবা চাওয়া হবে, যদি তারা একে হারাম বলে স্বীকার করে নেয়, তাহলে তাদের দুররাহ মারা হবে, আর যদি হারাম বলে স্বীকার না করে, তবে তাদের কাফের সাব্যস্ত করা হবে।” (পৃ: ৫০৩)

তারপর উমার (রাঃ) তাঁর ভুলটি বুঝিয়ে দিয়ে বলেন: তুমি যদি আল্লাহকে ভয় করতে, তবে যা তোমার ওপর হারাম করা হয়েছে তা থেকে বেঁচে থাকতে। মদ পান করতে না..। এতে হযরত কুদামা (রাঃ) পূর্ব মত থেকে ফিরে আসলেন, আর উমার (রাঃ)-ও তাঁকে কাফের সাব্যস্ত করলেন না, বরং তাঁর ওপর মদ পানের শাস্তি প্রয়োগ করেই ক্ষান্ত হলেন। আর এ ব্যাপারে কোনো সাহাবিও তাঁর বিরোধিতা করলেন না।

উলামায়ে কেরাম এই ব্যাপারে স্পষ্ট বিবরণ পেশ করেছেন যে, কোনো শরঈ’ দলিল ছাড়া কোনো শব্দকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা, এটা কোনো বৈধ ব্যাখ্যা নয়। কারণ এভাবে করেই পরবর্তীকালের লোকেরা শরঈ’ বিবরণসমূহের ওপর নিজেদের মনগড়া কর্তৃত্ব চর্চা করেছিল, আর বলেছিল, আমরা তো ব্যাখ্যা করছি। মানুষের কাছে সাজিয়ে তোলার জন্য তারা বিকৃতিকে ব্যাখ্যা বলে নাম দিয়েছিল, যাতে মানুষ

তা গ্রহণ করে। আর যারা মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ভ্রান্ত বিষয়কে সাজিয়ে ও প্রলেপ দিয়ে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে, তাদের নিন্দা করে আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা বলেন,

وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا

"এবং (তারা যেমন আমার নবির সাথে শত্রুতা করেছে) এভাবেই আমি (পূর্ববর্তী) প্রত্যেক নবির জন্য কোনোও না কোনো শত্রুর জন্ম দিয়েছি অর্থাৎ মানব ও জিনদের মধ্য থেকে শয়তান কিসিমের লোকদেরকে, যারা ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একে অপরকে বড় চমৎকার কথা শেখাত।" (আনআম: ১১২)

(৩) مانع الجهل (অজ্ঞতাজনিত প্রতিবন্ধক): এটা তখনই ওযর বা প্রতিবন্ধক হিসাবে গণ্য হবে যখন তা এমন অজ্ঞতা হবে, যা একজন মুকাল্লাফ (বিধানাবলির আওতাধীন ব্যক্তি) দূর করতে সক্ষম না।

কিন্তু যদি অজ্ঞতা এমন হয় যে, একজন ব্যক্তি তা দূর করতে সক্ষম, কিন্তু সে শৈথিল্য ও বিমুখতাবশত অজ্ঞতা দূর করলো না, তাহলে এটা নিজের অর্জিত অজ্ঞতা, যা ওযর হিসাবে গৃহীত নয়। শরঈ'ভাবে তাকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত বলেই ধরা হবে, যদিও বাস্তবে সে জ্ঞাত নয়। কারণ এটাই তো আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখতা অবলম্বনকারীর অবস্থা, অর্থাৎ যার কাছে ভীতি প্রদর্শনকারী আল্লাহর কিতাব পৌঁছেছে কিন্তু সে তা শেখা ও এর ব্যাপারে চিন্তা করা থেকে বিমুখ থেকেছে। সে-ই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝার ব্যাপারে অবহেলা করেছে, যার জন্য আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা সমস্ত সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করলেন...। আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা বলেন,

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

“তাদের কী হলো , তারা উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে ? যেন তারা বন্য গাধা , যা কোনো সিংহের ভয়ে পলায়ন করছে। ” (: ৪৯-৫১)

আল্লাহ সুবহানাহু অন্যত্র বলেন ,

وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ

... বলে দিন , আল্লাহই আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আমার প্রতি ওহীরূপে এই কুরআন নাযিল করা হয়েছে , যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরও সতর্ক করি এবং যাদের কাছে এই কুরআন পৌঁছবে তাদেরও। ” (আনআম: ১৯)

এ কারণেই উলামায়ে কেরাম তাদের শরঈ ’ মূলনীতিসমূহের আলোচনায় এ ব্যাপারে স্পষ্ট বিবরণ পেশ করেছেন। যেমন , ইমাম করাফি (মৃত্যু : ৬৮৪ হি :) বলেছেন,

‘যে অজ্ঞতা মুকাল্লাফের (বিধানাবলির আওতাধীন ব্যক্তির) পক্ষে দূর করা সম্ভব , তা অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য ওযর হিসাবে গৃহীত হবে না ’। (দেখুন , আলফুরুক ৪/২৬৪ পৃষ্ঠা। এছাড়া ২ /১৪৯-১৫১ পৃষ্ঠাও দেখুন)

বস্তুত : ঐ সব লোকের ক্ষেত্রেই অজ্ঞতাকে প্রতিবন্ধক হিসাবে ধরা হবে , ওযর বলে গ্রহণ করা হবে , যাদের মাঝে মূল তাওহিদের বিশ্বাস বিদ্যমান ; শুধু এমন কিছু মাসআলার ব্যাপারে অস্পষ্টতা রয়েছে , যেগুলো কখনো অস্পষ্ট বা কঠিন হতে পারে , অথবা যেগুলোর সংজ্ঞা ও বিবরণের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের মাসআলাসমূহের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর নাম ও গুণাবলির মাসআলা। তাওহিদে বিশ্বাস স্থাপনকারী কোনো ব্যক্তি যদি এ ক্ষেত্রে ভুলের স্বীকার হয় , তাহলে তার ওযর গ্রহণ করার ব্যাপারে শরঈ ’ দলিল রয়েছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে সংজ্ঞা ও বিবরণ উল্লেখ করার মাধ্যমে দলিল স্পষ্ট করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে তাকফির না করার ব্যাপারেও শরঈ ’ দলিল রয়েছে।

নতুন ইসলাম গ্রহণকারী অথবা যে এমন দূর পল্লিতে প্রতিপালিত হয়েছে , যেখানে শরিয়তের বিস্তারিত বিবরণসমূহ পৌঁছা কষ্টকর , তাদের ওযর গ্রহণ করার বিষয়টিও এরই অন্তর্ভুক্ত। যে বিষয়ে তারা জনে না সে বিষয়ে তাদের ওযরও গ্রহণ করা হবে , যদি তারা তাওহিদে বিশ্বাসী হয় এবং বড় শিরক ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকে।

(৪) مانع الإكراه (বলপ্রয়োগ -জনিত প্রতিবন্ধক):

এর বিপরীত শর্তটি হলো , مكلف তথা শরঈ’ দায়িত্বশীল ব্যক্তি স্বীয় কর্মে স্বাধীন হওয়া। এই প্রতিবন্ধকটির প্রমাণ মেলে আল্লাহর এই বাণীতে -

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان

“যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ইমান আনার পর তাঁর কুফরিতে লিপ্ত হয় , অবশ্য সে নয় , যাকে কুফরির জন্য বাধ্য করা হয়েছে , কিন্তু তার অন্তর ঈমানে স্থির রয়েছে। ” *(নাহল : ১০৬)*

উলামায়ে কেরাম বলপ্রয়োগ -জনিত প্রতিবন্ধকটি বিশুদ্ধভাবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত উল্লেখ করেছেন ,

১। এক বলপ্রয়োগকারী ব্যক্তি যে বিষয়ের হুমকি দিচ্ছে তা বাস্তবিকই কার্যকর করার ক্ষমতা রাখা , আর যাকে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে সে তা থেকে আত্মরক্ষা করতে অক্ষম হওয়া , এমনকি পলায়ন করতেও সক্ষম না হওয়া।

২। বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির প্রবল ধারণা হওয়া যে , সে অমত করলে তার ওপর উক্ত শাস্তিটি কার্যকর করে ফেলবে।

৩। বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির মাঝে ব্যক্তিগত অবাধ্যতার কোনো নিদর্শন পাওয়া না যাওয়া। উদাহণত: যতটুকু দ্বারা বিপদ দূর করা সম্ভব সে নিজ থেকে তার বেশি কুফরি কথা বললো বা কুফরি কাজ করলো।

উলামায়ে কেরাম এ শর্তও করেছেন যে, কুফরি কথা উচ্চারণের জন্য যে শাস্তির হুমকি দেওয়া হচ্ছে তা এমন হতে হবে, যা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের নেই। উলামায়ে কেরাম এর উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন, ভীষণ নির্যাতন করা, অঙ্গ কেটে ফেলা, আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া, হত্যা করা বা এই জাতীয় শাস্তি।

এর কারণ হচ্ছে, যার উসিলায় বলপ্রয়োগকৃতদের ওযর গ্রহণ করা সংক্রান্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে—হযরত আম্মার (রাঃ)—তিনি তখনই কুফরি কথা বলেছিলেন, যখন তার পিতামাতাকে হত্যা করা হয়েছিল, তাঁর পাজর ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, আল্লাহর পথে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

তারা আরো শর্ত করেছেন যে, বলপ্রয়োগ অব্যাহতির পর তার ইসলাম প্রকাশ করতে হবে। যদি তখন ইসলাম প্রকাশ করে তাহলে সে ইসলামরে ওপর অটল থাকবে, আর যদি কুফরি প্রকাশ করে তবে যে সময় সে কুফরি কথা উচ্চারণ করেছে সে সময় থেকেই তার ব্যাপারে কুফরের হুকুম দেওয়া হবে। এর সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সঙ্গত মনে করছি যে, উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা পেশ করেছেন, যার ব্যাপারে এই প্রমাণ উপস্থিত হবে যে, সে কুফরি কথা উচ্চারণ করেছে, আর তখন সে কাফেরদের কাছে আটকা ছিল, ভয় ও শংকার মাঝে তাদের কাছে বন্দী ছিল, এমন ব্যক্তির ব্যাপারে কুফরের হুকুম আরোপ করা হবে না।

কেননা যতক্ষণ সে তাদের কর্তৃত্বাধীন বন্দী বা আটক ছিল, ততক্ষণ তার ব্যাপারে বলপ্রয়োগের ধারণা করা যায় এবং তখন কাফেররাও তার ওপর যা ইচ্ছা শাস্তি কার্যকর করতে পারত। আর যদি এই সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে,

সে তা উচ্চারণ করার সময় নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন ছিল, তাহলে তার ওপর কুফরের হুকুম আরোপ করা হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন, উলামায়ে কেরাম যে প্রকার বলপ্রয়োগের ব্যাপারে আলোচনা করেন—বলপ্রয়োগের কারণে কুফরি কথা বলে বা কুফরি কাজ করে আবার পুনরায় ইসলামে ফিরে আসা, যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। পক্ষান্তরে কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ও তাতে সবসময় বহাল থাকার ব্যাপারে বলপ্রয়োগ করা হলে, সেটাকে উলামায়ে কেরাম ধর্তব্য করেন না এবং তার অমুমোদনও দেন না। তাঁরা এই প্রতিষ্ঠিত থাকার মাঝে আর বলপ্রয়োগের গ্রহণযোগ্য ওযরের স্থানগুলোর মাঝে পার্থক্য করেন।

যেমন, ইমাম আসরাম (রহঃ) আবু আব্দুল্লাহ তথা ইমাম আহমাদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন,

“তাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হলো, যাকে বন্দী করে তার সামনে কুফর পেশ করা হয়েছে, তাতে বাধ্য করা হয়েছে, তার কি ধর্ম ত্যাগ করার অনুমতি আছে? তিনি এটাকে খুব কঠিনভাবে অপছন্দ করলেন। তিনি বললেন, ‘আমার কাছে এদের অবস্থা ঐ সমস্ত সাহাবাদের অবস্থার মত মনে হয় না, যাদের ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয়েছে। তাদেরকে কুফরি কথা বলতে বাধ্য করা হত, তারপর ছেড়ে দেওয়া হত, তারা যা ইচ্ছা করতে পারতেন। কিন্তু এরা তো তাদেরকে কুফরির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে এবং স্বীয় দ্বীন পরিত্যাগ করতে বাধ্য করছে। এ দুটো এক নয়। কারণ যাদের কুফরি কথা উচ্চারণের জন্য বাধ্য করা হয়, তারপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তাদের তো এতে কোনো ক্ষতি নেই। আর এই ব্যক্তি, যে তাদের মাঝে অবস্থানরত, সে তো স্থায়ী কুফরকে গ্রহণ করা, হারামসমূহকে হালাল করা, ফরজ ও ওয়াজিবসমূহকে বর্জন করা এবং অন্যায় ও নিষিদ্ধ কাজসমূহে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে তাদের আহ্বানগুলোকে গ্রহণ করে নিচ্ছে। সে যদি নারী হয়, তাহলে তারা তাকে বিয়ে করবে, তার থেকে তাদের কাফের

বাচ্চা জন্ম দেবে। এমনিভাবে পুরুষ হলেও। তাদের বাহ্যিক অবস্থা এটাই যে , তারা প্রকৃত কুফর গ্রহণ করে নিয়েছে এবং সরল দ্বীন থেকে সরে গিয়েছে। ' ”

(আল-মুগনি , মুরতাদ অধ্যায় , পরিচ্ছেদ : ‘যাকে কুফরি কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়েছে তার জন্য উত্তম হলো অটল থেকে তা না বলা ’...)

দ্বিতীয় প্রকার প্রতিবন্ধকসমূহ : موانع في الفعل

অর্থাৎ , যে কাজের কারণে তাকফির করা হয় উক্ত কাজের মধ্যে প্রতিবন্ধকসমূহঃ

১। কথা বা কাজটি কুফরের অর্থ বুঝাতে স্পষ্ট না হওয়া।

২। উক্ত কথা বা কাজটিকে কুফর প্রমাণ করতে যে শরঈ ' দলিলটি পেশ করা হয়েছে সে দলিলটি উক্ত কথা বা কাজটিকে কুফর বোঝাতে অকাট্য না হওয়া।

তাকফিরের বিচ্যুতিসমূহ শিরোনামের অধীনে ষষ্ঠ ও সপ্তম ভুলের মাঝে এ ব্যাপারে আলোচনা আসবে ইন -শা -আল্লাহ।

তৃতীয় প্রকার : موانع في الثبوت (প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকসমূহ):

এটা হচ্ছে প্রতিবন্ধকসমূহের বিচারিক দিক। এক্ষেত্রে যদি তার মাঝে কুফরের অবশ্য ফলাফলগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেতে থাকে , যেমন মুসলমানদের রক্ত ও সম্পদ নিজের জন্য বৈধ করে নেয় , তাহলে এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এই প্রতিবন্ধকটি হচ্ছে এমন , অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর কুফরটি শরঈ'ভাবে প্রমাণিত হলো না। অর্থাৎ তার নিজের স্বীকারোক্তি বা

ন্যায়পরায়ণ দুজন ব্যক্তির সাক্ষ্য , এর কোনোটাই হলো না। অথবা সাক্ষীদের কেউ পাগল হওয়ার কারণে বা শিশু হওয়ার কারণে বা অন্য কোনো কারণে এ ব্যাপারে অগ্রহণযোগ্য। অথবা এমন হলো যে , সাক্ষী অভিযুক্ত ব্যক্তির শত্রু , অথবা সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণতা প্রশ্নবিদ্ধ , আর অভিযুক্ত ব্যক্তিও তার অভিযোগ অস্বীকার করে এবং কসম করে তার কথা প্রত্যাখ্যান করে।

তাকফিরের প্রতিবন্ধকগুলো প্রসঙ্গে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

(জ্ঞাতব্য : ১) তাকফিরের প্রতিবন্ধকগুলো বর্ণনা করা ওয়াজিব হচ্ছে , مقدورعليه তথা কর্তৃত্বাধীনের ক্ষেত্রে ; ممتنع অর্থাৎ প্রতিরোধ বা যুদ্ধ পরিচালনাকারীর ক্ষেত্রে তা ওয়াজিব নয় :

পূর্বোক্ত আলোচনার পর যে বিষয়টি আপনাদেরকে জানতে হবে , তা হচ্ছে এই যে, এই প্রতিবন্ধকগুলো বর্ণনা করা কেবল কর্তৃত্বাধীনের কাছেই ওয়াজিব; প্রতিরোধকারীর কাছে তা বর্ণনা করা ওয়াজিব নয়।

الامتناع তথা প্রতিরোধ করার দুইটি অর্থঃ

১) পূর্ণ শরিয়ত বা আংশিক শরিয়ত পালন করতে অস্বীকার করা।

২) মুসলমানদের ক্ষমতাবলয় থেকে নিজেকে নিরাপদ করে নেওয়া , যাতে মুসলমানরা তাকে আল্লাহর শরিয়তের সম্মুখীন করতে না পারে।

উল্লেখ্য , উভয় প্রকারের মাঝে সমন্বয় আবশ্যক নয়। কখনো হতে পারে , কেউ শরিয়ত পালন করতে অস্বীকার করেছে , কিন্তু সে ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলমানদের ক্ষমতাধীন রয়েছে। যেমন , কোনো একজন ব্যক্তি যাকাত অস্বীকার করলো এবং সে মুসলমানদের ক্ষমতাধীন ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করছে। কখনো উভয়টি একসাথেও হতে পারে। যেমন , শরিয়ত পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ব্যক্তি দারুল কুফরের মাধ্যমে আত্মরক্ষা

করলো, অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, সেনাবাহিনী বা আইন-কানুনের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুললো। যার ফলে মুসলমানেরা তাকে আল্লাহর হুকুমের সামনে উপস্থিত করতে এবং তার উপর আল্লাহর শাস্তি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হচ্ছে না।

মুসলমানদের ক্ষমতাবলয় থেকে নিরাপত্তা অবলম্বনকারী কখনো হাত দ্বারা যুদ্ধ করতে পারে, কখনো বা জবান দ্বারাও যুদ্ধ করতে পারে। (দেখুন আস সারিমুল মাসলুল, পৃ:৩৮৮)

উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলেছেন যে, মুসলমানদের ক্ষমতা বলয় থেকে নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষা অবলম্বনকারী থেকে তওবা চাওয়া ওয়াজিব নয়। সুতরাং যে আগ্রাসী মুসলমানদের দেশসমূহে আক্রমণ করে তা দখল করে নেয় এবং শাসনের চাবিকাঠি হাতে নিয়ে নেয়, তার থেকে তো কিছুতেই তওবা চাওয়া হবে না।

এখানে তওবা চাওয়ার দুটি অর্থ:

১) যার ওপর ধর্ম ত্যাগের বিধান আরোপ করা হয়েছে তার কাছ থেকে তওবা চাওয়া।

২) কারও ওপর ধর্ম ত্যাগের বিধান আরোপের আগে তার কাছে তাকফিরের শর্তাবলি ও তার প্রতিবন্ধকসমূহ বর্ণনা করা। আর এই প্রকারটির ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

(জ্ঞাতব্য: ২) এমন কতগুলো অজুহাত, যেগুলোকে মুরতাদরাসহ অন্যান্যরা ওযর হিসাবে পেশ করে থাকে, অথচ সেগুলো তাকফিরের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়:

১। কারও বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেওয়া, চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া, দুনিয়াবি কোনো সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, দুনিয়ার সামান্য স্বার্থ

বন্ধ করে দেওয়া ও এ জাতীয় যেসব বিষয়গুলোর মাধ্যমে হুমকি দেওয়া হয়ে থাকে, তার আশঙ্কা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله

“মানুষের মধ্যে কতক লোক এমন আছে, যারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি। তারপর যখন আল্লাহর পথে তাদের কোনো কষ্ট-ক্লেশ দেখা দেয়, তখন তারা মানুষের দেওয়া কষ্টকে আল্লাহর আযাব তুল্য গণ্য করে।” (আনকাবুত: ১০)

আল্লাহ সুবহানাহুতা’লা অন্যত্র বলেন,

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين * فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين * ويقول الذين أمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين * يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه

“হে মুমিনগণ! ইয়াহুদি ও খৃষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই একে অন্যের বন্ধু! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না।

সুতরাং যাদের অন্তরে (মুনাফেকির) ব্যাধি আছে, তুমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছ যে, তারা অতি দ্রুত তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। তারা বলছে, আমাদের আশঙ্কা হয়, আমরা কোনো মুসিবতের পাকে পড়ে যাব। (কিন্তু) এটা দূরে নয় যে, আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় দান করবেন অথবা নিজের পক্ষ হতে

অন্য কিছু ঘটাবেন, ফলে তখন তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল, তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে।

এবং (তখন) মুমিনগণ (পরস্পরে) বলবে, এরাই কি তারা, যারা জোরদারভাবে কসম করে বলত যে, তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে। তাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে গেছে এবং তারা অকৃতকার্য হয়েছে।

হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি নিজ দ্বীন থেকে ফিরে যায়...।” (মায়িদাহ: ৫১-৫৪)

সুতরাং এই সব আয়াতসমূহে ঐ সব লোকদের ধর্ম ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, যারা শুধু ভয়ের কারণে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে এবং এ কথাও স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে, তাদের সব কর্ম বিনষ্ট হয়ে গেছে। আর এটা একমাত্র কুফরের কারণেই হতে পারে।

২। এ কারণে এটাও তাকফিরের কোনো প্রতিবন্ধক নয় যে, মুরতাদরা ও তাদের সহযোগীরা অসহায়ত্বের ওযর পেশ করে এবং এই ওযর পেশ করে যে, শাসকদের কারণে তাদের কিছু করার নেই।

কেননা তাদের যদি বাস্তবে গ্রহণযোগ্য ওযর থেকেও থাকে, তথাপি তা তো তাদের শিরক ও কুফরের সাহায্য করা এবং তার অনুসারীদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার অনুমোদন দেয় না। কেননা কেউ তো তাদের এই কাজটিতে বাধ্য করে না, কেউ তাদের ঐ সব পদের দায়িত্ব নিতেও বাধ্য করে না, যাতে এ ধরনের কুফরিসমূহ রয়েছে। বরং তারাই তা অর্জনের জন্য মৃত্যুর ঝুঁকিও নিতে চায় এবং তা লাভের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ ও মাধ্যম তালাশ করতে থাকে।

অতএব বুঝা গেল, আল্লাহ সুবহানাহুতা’লা, অসহায় হওয়ার দলিল দিয়ে কাফেরদের কুফর ও শিরকের অনুসরণকারীদের ওযর গ্রহণ করেননি, যা অনেক আয়াতে স্পষ্ট। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعاً فهل انتم مغنون عنا نصيباً من النار * قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد

“এবং সেই সময়কে স্মরণ রাখ, যখন তারা জাহান্নামে একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করবে। সুতরাং (দুনিয়ায়) যে ছিল দুর্বল, সে আত্মগর্বীদের বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুগামী ছিলাম। তা তোমরা কি আমাদের পরিবর্তে আগুনের কিছু অংশ গ্রহণ করবে?

যারা আত্মগর্বী ছিল তারা বলবে, আমরা সকলেই জাহান্নামে আছি। আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করে ফেলেছেন।” (গাফির : ৪৭-৪৮)

অন্যত্র বলেন,

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين * وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون

“তুমি যদি সেই সময়ের দৃশ্য দেখতে, যখন জালিমদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে আর তারা একে অন্যের কথা রদ করবে। দুনিয়ায় যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়েছিল, তারা ক্ষমতা-দর্পীদের বলবে, তোমরা না হলে আমরা অবশ্যই মুমিন হয়ে যেতাম।

যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা , যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদের বলবে, হিদায়াত তোমাদের কাছে এসে যাওয়ার পর আমরাই কি তোমাদের তা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি ? প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরাই অপরাধী ছিলে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়েছিল তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে , না , বরং এটা তো তোমাদের দিবা -রাত্রের চক্রান্তই ছিল (যা আমাদেরকে হিদায়াত থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল), যখন তোমরা আমাদের আদেশ করছিল আমরা যেন আল্লাহর কুফরি করি এবং তার সাথে (অন্যদেরকে) শরিক সাব্যস্ত করি। তারা যখন আযাব দেখবে তখন তারা অনুতাপ গোপন করবে এবং যারা কুফরি অবলম্বন করেছিল আমি তাদের সকলের গলায় বেড়ি পরাব। তাদের তো কেবল তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে। ”

(সাবা : ৩১-৩৩)

৩। মুরতাদরা এবং তাদের সহযোগীরা নিজেদের মুমিন দাবি করে , অথবা এই দাবি করে যে , তারা যেসব কুফরিতে লিপ্ত হচ্ছে , তাতে তারাই সত্যের ওপর আছে, এটাও তাকফিরের প্রতিবন্ধকসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কারণ আল্লাহ সুবহানাহুতা 'লা অনেক কাফেরদেরই এরূপ অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আর তিনি এটাকে তাদের জন্য তাকফিরের প্রতিবন্ধক হিসবে গণ্য করেননি।

যেমন আল্লাহ সুবহানাহুতা 'লা বলেন ,

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا

“বলে দাও , আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব , কর্মে কারা সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ? তারা সেই সব লোক , পার্থিব জীবনে যাদের সমস্ত দৌড় -ঝাপ

সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে , অথচ তারা মনে করে , তারা খুবই ভাল কাজ করছে।” (কাহফ: ১০৪)

তিনি আরো বলেন,

إنهم اتخذوا الشياطين أولياء لهم من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون

“নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে আর তারা মনে করছে যে, তারা সরল পথে প্রতিষ্ঠিত আছে। ” (আ’রাফ: ৩০)

৪। যাকে কুফরির কারণসমূহের কোনো কারণে লিপ্ত হওয়ার ফলে বা ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের কোনো বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার ফলে তাকফির করা হয় , সে ইসলামের কিছু কিছু বিধান পালন করে , যেমন নামায পড়ে বা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের ব্যাপারে স্বাক্ষ্য দেয় বা এজাতীয় আরো কিছু করে - এটাও তাকফিরের কোনো প্রতিবন্ধক নয়।

আল্লাহ সুবহানাহুতা ’লা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে , মুশরিকদেরও অনেক আমল আছে এবং তাদের কারও মাঝে ইমানের শাখাসমূহের অনেক শাখা বিদ্যমান , কিন্তু এগুলো তার শিরককে মুছে ঢেকে দেয় না। যেমন আল্লাহ সুবহানাহুতা ’লা বলেন ,

وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون

“তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই এমন যে , তারা আল্লাহর প্রতি ইমান রাখলেও তা এভাবে যে , তাঁর সঙ্গে শরীক করে। ”

৫। যে স্পষ্ট কোনো কুফরি কাজে লিপ্ত হয়েছে সে ধর্মীয় গুরু , সন্ন্যাসী , নেতা , শাসক বা অন্যান্যদের দ্বারা পথভ্রষ্ট হওয়াও তাকফিরের কোনো প্রতিবন্ধক নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন ,

إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا * خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا *
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا * وقالوا ربنا إنا
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا * ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا

“এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ কাফেরদেরকে তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন।
তাতে তারা সর্বদা এভাবে থাকবে যে, তারা কোনো অভিভাবক পাবে না এবং সাহায্যকারীও না।

যেদিন আগুনে তাদের চেহারা ওলট-পালট হয়ে যাবে, তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসুলের কথা মানতাম! এবং বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও আমাদের গুরুজনদের আনুগত্য করেছিলাম, তারা আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে।

হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের প্রতি এমন লানত করুন, যা হবে অতি বড় লানত।” (আহযাব: ৬৪-৬৮)

এই বিষয়ে অনেক আয়াত রয়েছে।

৬। মুরতাদ ইলমের অধিকারী, বা শ্মশ্রুমণ্ডিত বা অমুক ইসলামি দলের সদস্য বা শরিয়া বিষয়ে এত এত ডিগ্রিধারী বা এ জাতীয় যা কিছু রয়েছে, এগুলোও তাকফিরের কোনো প্রতিবন্ধক নয়, যেমনটা কেউ কেউ মনে করে থাকে।

কেননা স্বীয় যামানার সবচেয়ে বড় আলেম ছিল, এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহুতা’লা বলেছেন,

واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين

“এবং (হে রাসুল!) তাদেরকে সেই ব্যক্তির ঘটনা পড়ে শোনান, যাকে আমি আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা সম্পূর্ণ বর্জন করে। ফলে শয়তান তার পিছু নেয়। পরিণামে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়”

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরেক স্থানে তার সৃষ্টির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দল তথা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের ব্যাপারে বলেন,

ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون * أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة

“তারা যদি শিরক করত, তবে তাদের সমস্ত (সৎ) কর্ম নিস্ফল হয়ে যেত। তারা এমন লোক, যাদেরকে আমি কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করেছিলাম।” (আনআম: ৮৮-৮৯)

কিন্তু এখানে দুটি বিষয়ের মাঝে পার্থক্য করতে হবে: একটি হলো, এমন স্পষ্ট কুফর, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয়। উপরে এইমাত্র এটার কথাই আলোচিত হয়েছে।

আরেকটি হলো, যা কুফর নয়, বরং এমন ভুল ইজতিহাদ বা গবেষণা, যার জন্য ইজতিহাদকারীকে ইজতিহাদের সাওয়াব দেওয়া হবে, অথবা ঐ সব ত্রুটি-বিচ্যুতি, যা কখনো কখনো উলামায়ে কেরাম ও তালিবুল ইলমদের হয়ে যায়। এর কারণে তাদের সাথে অশিষ্ট আচরণ করা বা তাদের ব্যাপারে জবানের অসংযত চর্চা করা বা তাদের ইলম থেকে বিমুখতা অবলম্বন করা বা যুবকদের তাদের কিতাবসমূহ থেকে দূরে রাখা উচিত হবে না। বিশেষত যখন তারা আল্লাহর দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও তার সাহায্যকারী হয় এবং তাগুত ও মুরতাদগোষ্ঠী থেকে সম্পর্ক ছিন্নকারী হয়, তখন তো কিছুতেই না।

৭। নির্দিষ্ট কোনো কুফরি কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে যাদের তাকফির করা হবে, তারা সংখ্যায় অনেক, এটাও তাকফিরের কোনো প্রতিবন্ধক নয়। কেননা আল্লাহর দ্বীন কারও প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা বলেন,

وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد

"এবং মূসা বলেছিল, তোমরা এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী সকলেই যদি অকৃতজ্ঞতা কর, তবে (আল্লাহর কোনোও ক্ষতি নেই। কেননা) আল্লাহ অতি বেনিয়ায, তিনি আপনিই প্রশংসার উপযুক্ত।" *(ইবরাহিম : ৮)*

আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা আরো বলেন,

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين

"এতদসত্ত্বে অধিকাংশ লোক ইমান আনার নয়, তা তোমার অন্তর যতই কামনা করুক না কেন।"

(ইউসুফ : ১০৩)

আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা আরো বলেন,

وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون

"বহু লোকই এমন, যারা নিজ প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়াকে অস্বীকার করে।" *(রূম : ৮)*

৮। কুফরি কথা, ঠাট্টা, বিনোদন ও খেল-তামাশাচ্ছলে বলাও উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে তাকফিরের কোনো প্রতিবন্ধক নয়। তার দলিল হলো আল্লাহ সুবহানাহুতা'লার বাণী -

ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো হাসি-তামাশা ও ফূর্তি করছিলাম। বল, তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত ও তার রাসুলকে নিয়ে ফূর্তি করছিলে? অজুহাত দেখিও না। তোমরা ইমান জাহির করার পর কুফরিতে লিপ্ত হয়েছ।" (তাওবা: ৬৫-৬৬)

আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা তাদের এই ওযর গ্রহণ করলেন না। অথচ তারা রাসুল ﷺ এর সাথে সংকটময় যুদ্ধে জিহাদের জন্য বের হয়েছে। আর ঐ সব কুফরি বাণীগুলো তারা ঠাট্টাচ্ছলে ও সফরের পথে সময় কাটানোর জন্য বলেছিল, যেমন, সওয়ারিরা রাস্তা পার করার জন্য পরস্পরে বিভিন্ন কথাবার্তা বলে থাকে, যেমনটি আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

৯। কাফের আখ্যা দানকারীগণ যাদের কাফের আখ্যা দিয়েছেন, তাদের ওপর কুফরের শাস্তিগুলো বাস্তবায়ন করতে পারবেন না, এটাও তাকফিরের কোনো গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক নয়। যেমন, তাদের ওপর ধর্ম ত্যাগের শাস্তি বাস্তবায়ন করতে পারবেন না, কাফের শাসককে হটাতে পারবে না ইত্যাদি।

এ ব্যাপারে সত্য এবং সঠিক কথা হলো, যা আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা আমাদেরকে তাঁর প্রজ্ঞাময় কিতাবে আদেশ করেছেন:

فاتقوا الله ما استطعتم

"সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করে চলো।" (তাগাবুন: ১৬)

অনুরূপ আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা শুআইব (আঃ) এর ব্যাপারে বলেন:

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

“নিজ সাধ্যমত সংস্কার করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই।” (হুদ: ৮৮)

এ হিসাবেই ফুকাহায়ে কেরাম তাদের প্রসিদ্ধ ফিকহি মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন, “কঠিন বিষয়টির কারণে সহজ বিষয়টি রহিত হয়ে যাবে না।” সুতরাং যখন কোনো সময় মুসলমানগণ কাফের শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এবং তাকে হটাতে না পারবে তখন এর অর্থ এই হবে না যে, তারা তাকে তাকফির করাও ছেড়ে দেবে, বরং এটি একটি শরঈ’ হুকুম, যা তারা করতে সক্ষম।

সুতরাং তাদের এর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং শাসককে তাকফির করার অন্য যেসব ফলাফল রয়েছে, যেগুলো তারা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম সেগুলোর ব্যাপারেও আল্লাহকে ভয় করা উচিত।

অর্থাৎ তার সাহায্য করা, পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং তার কুফরি আইনের কাছে বিচার-ফয়সালা চাইতে যাওয়া থেকে বিরত থাকবে, তাকে তাদের দ্বীনি বিষয়ের দায়িত্বশীল বানাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো উপায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে তাদের ওপর কর্তৃত্বশীল বানাবে না, তার বায়আতে প্রবেশ করবে না, তার পতাকাতলে যুদ্ধ করবে না, তাকে তার বাতিলের ওপর সাহায্য করবে না বা কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করবে না, ইত্যাদি যে যে বিষয়গুলো তারা করতে পারবে তা করবে। এছাড়া শাসকের কুফরি জানতে পারলে তার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে প্রেরণা জোগাবে এবং এর ফলে কোনো একদিন তাকে হটানোর মত যোগ্যতা সৃষ্টি হবে।

১০। কুফরিতে লিপ্ত ব্যক্তি মন্দভাবে প্রতিপালিত হয়েছে, এটাও তাকফিরের কোনো প্রতিবন্ধক নয়। অথচ এমন কতিপয় লোক এটাকে তাকফিরের প্রতিবন্ধক মনে করছে, যাদের অনুসরণ করা হয় এবং যাদের দিকে রীতিমত

আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা যায়। তাও এমন লোকদের ব্যাপারে , যারা আল্লাহ , দ্বীন ও রাসুল ﷺ-কে গালিগালাজ করে।

অথচ অধিকাংশ কাফের মুশরিকরা তো মন্দভাবে প্রতিপালিত ও বেড়ে উঠার কারণেই কুফর ও শিরক করেছে। যেমন , চির সত্যবাদী নবি ﷺ বলেছেন,

“প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাত , তথা ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে , তারপর তার পিতা -মাতা তাকে ইহুদি , অগ্নিপূজক বা মুশরিক বানায়। ” (হাদিসটি ইমাম মুসলিম ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন)

সুতরাং এটা তাদেরকে কাফের আখ্যাদান করতে বাধা দেবে না।

১১। কোনো প্রকাশ্য ও স্পষ্ট কুফরিকে কল্যাণ বিবেচনা করে বা সময়োপযোগী মনে করে করা, অথবা ‘দাওয়াতের স্বার্থ ’র নাম দিয়ে কুফরি করা, এগুলোও তাদের কাফের সাব্যস্ত হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক নয়।
কেননা শিরক বা কুফরিতে কোনো গ্রহণযোগ্য কল্যাণ নেই।

কারণ এটা হচ্ছে আসমান -জমিনের সবচেয়ে বড় গুনাহ , যার দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহুতা ’লার অবাধ্যতা করা হয়। এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহুতা ’লা বলেন ,

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না। এর নিচের যে -কোনো গুনাহ যার ক্ষেত্রে চান ক্ষমা করে দেন। ” *(নিসাঃ ১১৬)*

বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে :

রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো : কোন গুনাহ সবচেয়ে বড় ?

রাসুল বললেন, তা হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করলে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

(জ্ঞাতব্য : ৩) أسباب التكفير (তাকফিরের কারণসমূহ):

ফিকহি মূলনীতিবিদদের মতে শরিয়তে ‘কারণ’ হলো, এমন একটি বাহ্যিক ও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, যার দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত হয়, এই হিসাবে যে, শরিয়ত তার সাথে উক্ত হুকুমটিকে সম্পৃক্ত করেছেন। অথবা তার সংজ্ঞাটি এভাবেও বলা যায়, ‘কারণ’ বলা হয়, যার উপস্থিতির কারণে তার ফলাফল বা পরিণতিটির উপস্থিতি এবং তার অনুপস্থিতির দ্বারা পরিণতিটির অনুপস্থিতি অনিবার্য হয়।

যেহেতু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মত হলো, ইমান তিনটি রুকন বা ভিত্তি-বিশিষ্ট : বিশ্বাস, কথা ও কাজ। এ কারণে হুবহু এর বিপরীত তিনটি বিষয় হবে তাকফিরের কারণ। অর্থাৎ কুফরি কথা, অথবা কুফরি কাজ (এর মাঝে ঐ সব জিনিস পরিত্যাগ করাও অন্তর্ভুক্ত, যা পরিত্যাগ করা কুফর) অথবা সন্দেহ বা কুফরি বিশ্বাস।

সাধারণত : এগুলোই কুফরির কারণ।

তবে তাকফিরের সেই সব কারণ, যা দুনিয়াবি বিধানাবলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে সেগুলো কেবল কুফরি কথা বা কুফরি কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শরিয়ত দুনিয়াতে কাফের সাব্যস্ত করার কারণগুলোকে শুধু এর মাঝেই সীমাবদ্ধ করেছে। কারণ অবিশ্বাস ও সন্দেহ হলো, অপ্রকাশ্য কারণ, যা দুনিয়াবি বিধানগুলোতে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে শরিয়ত তার সাথে কোনো দুনিয়াবি বিধানের সম্পর্ক রাখেনি এবং দুনিয়াতে তাকে তাকফিরের কারণও গণ্য করেনি। এটাকে সেই সত্তার কাছে কারণ হিসাবে গণ্য করেছে, যিনি অন্তরের রহস্য ও গোপন বিষয়গুলো

জানেন। এ কারণে এটা হচ্ছে কাফের সাব্যস্ত করার পরকালীন কারণ। তার সাথে দুনিয়াবি বিধি-বিধানের কোনো সম্পর্ক নেই।

এ কারণে যে কুফর গোপন রাখে, প্রকাশ করে না; বরং ইসলামের নিদর্শনগুলোই প্রকাশ করে তাকে বলা হয় মুনাফিক। দুনিয়াতে তার সাথে মুসলমানদের অনুরূপ আচরণ করা হবে। আর সে যে কুফরি বিষয়গুলোকে গোপন রাখত এর হিসাব আল্লাহ পরকালে নেবেন। ফলে তার পরিণাম হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর। এ কারণে যখন মুকাল্লাফ (বিধানাবলির আওতাধীন ব্যক্তি) কুফরের প্রকাশ্য কারণসমূহের কোনোটিতে লিপ্ত হয়, তথা কুফরি কথা বলে বা কুফরি কাজ করে, আর তাকফিরের শর্তগুলো পাওয়া যায় এবং কোনো প্রতিবন্ধকও না থাকে, তখন তাকে তাকফির করা হবে, যদিও সে এ কথা বলে যে, সে এর দ্বারা কুফরি করা বা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেনি। কেননা কেউই এর ইচ্ছা করে না, একমাত্র আল্লাহ যা ব্যতিক্রম চান। এমনকি খৃষ্টানদেরকেও যদি জিজ্ঞাস করা হয়, তোমরা কি ‘ঈসা আল্লাহর পুত্র’ এ কথার দ্বারা কুফরি করার ইচ্ছা করো? তারা না করবে এবং তা অস্বীকার করবে।

তাকফিরের কারণগুলোর ব্যাপারে একটি জ্ঞাতব্য:

মনে রাখবেন, যখনই কোনো মুকাল্লাফ কুফরের প্রকাশ্য কারণসমূহের কোনোটিতে লিপ্ত হয় আর তার ক্ষেত্রে তাকফিরের কোনো প্রতিবন্ধকও না থাকে, তখনই তাকে কাফের আখ্যা দেওয়া যাবে। তাকফিরের জন্য একাধিক কারণ জমা হওয়া শর্ত নয়; বরং একাধিক কারণ কুফরিকে আরো কঠিন ও বৃদ্ধি করবে। অতএব ইমানের মতো কুফরেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

কার্টেসি: Muhammad Abdus Salam Faraj

প্রচলিত ‘আল-ইবানাহ’ কিতাবটি কি ইমাম আবুল হাসান আশআরির রচনা?

ALI HASAN OSAMA·WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2018

আমাদের সহিহ আকিদার দাবিদার ভাইয়েরা মাঝেমধ্যে অসহিহ কাজ করেন। ‘আল-ইবানাহ’ কিতাবটিকে এখন যে রূপে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইমাম আবুল হাসান আশআরি রহ. কি কিতাবটিকে এভাবেই রচনা করেছিলেন, নাকি কোনো ফিরকা তাতে বিকৃতি সাধন করেছে, যেমনিভাবে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা তাওরাত ও ইঞ্জিলে বিকৃতি সাধন করেছে? এ লেখায় আমরা সে বিষয়টির ওপরই সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করার চেষ্টা করব। কারণ, এই প্রমাণ দেখিয়েই নব্য সালাফিরা আশআরিদের উদ্দেশ্য করে বলতে চায়, তোমরা তো তোমাদের ইমাম আবুল হাসান আশআরির মাযহাব থেকে সরে গেছ এবং তিনি ফিরে আসার পরও তোমরা অদ্যাবধি বিদআতের (!) মধ্যেই পড়ে রয়েছ। অথচ এ বিষয়টি তো ভাবাই যায় না যে, উম্মাহ এতকাল ধরে নিজেদেরকে ইমাম আশআরির দিকে নিসবত করে আসছে, অথচ তাদের এত বিদগ্ধ যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণীদের কেউই এতকাল তাররুজু (প্রত্যাবর্তন) সম্পর্কেই জানতে পারেনি। একমাত্র নব্য সালাফিরাই বিষয়টি জানতে পেরেছে।

ইমাম ইবনু আসাকির রহ. বলেন:

بل هم ـ يعني الأشاعرة ـ يعتقدون ما فيها ـ أي الإبانة ـ أسدّ اعتقاد، ويعتمدون عليها أشدّ اعتماد، فإنهم بحمد الله ليسوا معتزلة ولا نفاة لصفات الله معطلة، لكنهم يثبتون له سبحانه ما أثبته لنفسه من الصفات، ويصفونه بما اتصف به في محكم الآيات، وبما وصفه به نبيّه صلى الله عليه وسلم في صحيح الروايات، وينزهونه عن سمات النقص والآفات

বরং তারা—অর্থাৎ আশআরিরা—তাতে—অর্থাৎ ‘আল-ইবানাহ’ কিতাবে—যা কিছু রয়েছে, তার প্রতি যথাযথ বিশ্বাস রাখে এবং তার ওপর প্রচণ্ড নির্ভরতা রাখে। কারণ, আল্লাহর প্রশংসা, আশআরিরা মুতাজিলা নয় এবং আল্লাহ তাআলার সিফাতসমূহকে নাকচকারী মুআত্তিলাও নয়। তারা আল্লাহ তাআলা—আমি তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি—এর জন্য সে সকল সিফাতকে সাব্যস্ত করে, আল্লাহ

তাআলা নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন। তারা আল্লাহকে সেসব গুণে গুণান্বিত করে, আল্লাহ তাআলা দ্ব্যর্থহীন আয়াতসমূহে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁর নবি ﷺ সহিহ বর্ণনায় তাঁকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন। তারা আল্লাহ তাআলাকে অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটির সকল নিদর্শন থেকে পবিত্র ঘোষণা করে। [তাবয়িনু কাযিবিল মুফতারি : ৩৮৮]

এ থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে যে, আশআরিরা নিজেদের মাযহাবের ভিত্তি 'আল-ইবানাহ' কিতাবের ওপরও সুদৃঢ়ভাবে রেখে থাকে। অথচ 'আল-ইবানাহ' কিতাবে আজকাল যা দেখা যাচ্ছে, তা তাদের মাযহাবকে সত্যায়িত না করে নব্য সালাফিদের মাযহাবের পক্ষে প্রমাণ পেশ করে। এর কী কারণ? আজকাল আমরা 'আল-ইবানাহ' কিতাবে যা দেখতে পাচ্ছি, আদতে যদি ইমাম আবুল হাসান আশআরি রহ. নিজেই সেগুলো রচনা করে থাকেন আর আশআরিরাও সেগুলোর ওপর মাযহাবের দ্ব্যর্থহীন বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে, তাহলে তো তাদের মধ্যে আর নব্য সালাফিদের মধ্যে পার্থক্য থাকার কথা ছিল না। এ দুই মাযহাবের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় মৌলিক অনেক পার্থক্য এবং ভিন্নতা। এমনকি ইতিহাস বলে, এ কিতাবটি যখন রচনা করা হয়, তখন অনেক সালাফি এ কিতাবটির প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। [দ্রষ্টব্য : সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৫/৯০; তাবাকাতুল হানাবিলা : ২/১৮; আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত : ১২/১৪৬] যদি এ কিতাবটি সালাফিদের মাযহাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণই হয়ে থাকে, তাহলে তাদের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনেরই বা কী কারণ ছিল?

শাইখ জাহিদ কাউসারি রহ. 'তাবয়িনু কাযিবিল মুফতারি' গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন :

والنسخة المطبوعة في الهند من الإبانة نسخة مصحفة محرفة تلاعبت بها الأيدي الأثيمة، فيجب إعادة طبعها من أصل موثوق

হিন্দুস্তানে 'আল-ইবানাহ'র প্রকাশিত নুসখা একটি ভুলভাবে লিখিত এবং বিকৃত নুসখা। অনেক পাপিষ্ঠ হাত তা নিয়ে প্রতারণা করেছে। সুতরাং নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তা পুনরায় প্রকাশ করা অপরিহার্য।

তিনি আরও লেখেন :

ومن العزيز جدّاً الظفر بأصلٍ صحيح من مؤلفاته على كثرتها البالغة، وطبْعُ كتاب الإبانة لم يكن من أصل وثيق، وفي المقالات المنشورة باسمه وقفة

ইমাম আশআরির কিতাবগুলোর বিশুদ্ধ সূত্র লাভ করা একটি অত্যন্ত দুরূহ বিষয়; যেহেতু তার সংখ্যা অনেক বেশি। ‘আল-ইবানাহ’ গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে প্রকাশ করা হয়নি। তার নামে প্রকাশিত ‘আল-মাকালাহ’ গ্রন্থটি নিয়েও সংশয় রয়েছে।

শাইখ জাহিদ কাউসারি রহ. একই বিষয়ে ‘আস-সাইফুস সাকিল’ গ্রন্থের টীকায়ও সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। দ্রষ্টব্য: আস-সাইফুস সাকিল: ১৫৫-১৯৬।

আরও অনেক মুহাক্কিক আলিমই শাইখ জাহিদ কাউসারি রহ.-এর মতো একই মত পোষণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ড. আবদুর রহমান বাদাওয়ি লেখেন:

..وقد لاحظ الشيخ الكوثري بحق أن النسخة المطبوعة في الهند.. تلاعبت بها الأيدي الأثيمة

শাইখ কাউসারি যথাযথ পর্যবেক্ষণই করেছেন যে, হিন্দুস্তানে ‘আল-ইবানাহ’র প্রকাশিত নুসখা একটি ভুলভাবে লিখিত এবং বিকৃত নুসখা। অনেক পাপিষ্ঠ হাত তা নিয়ে প্রতারণা করেছে। সুতরাং নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তা পুনরায় প্রকাশ করা অপরিহার্য। [মাযাহিবুল ইসলামিয়্যিন: ১/৫১৭]

স্বনামধন্য গবেষক শাইখ ওয়াহবি গাওয়িজি রহ. এ বিষয়ে একটি পুস্তিকাই রচনা করেছেন। পুস্তিকাটির নাম: نظرة علمية في نسبة كتاب الإبانة جميعه إلى الإمام أبي الحسن

সেখানে তিনি অসংখ্য স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন যে, বর্তমানে ইলমি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত এবং ইলমচর্চাকারীদের মধ্যে প্রচলিত ‘আল-ইবানাহ’র অনেক বিষয়ই এমন, ইমাম আবুল হাসান আশআরি রহ.-এর দিকে যেগুলোকে নিসবত করা নিরেট গলদ।

শাইখ ফাওকিয়্যাহ হুসাইনের তাহকিকে ‘আল-ইবানাহ’র একটি নুসখা কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে; যেটাকে চারটি পাণ্ডুলিপির আলোকে তুলনা করে প্রকাশ করা হয়েছে। এ নুসখাটি যদিও পূর্বের নুসখার চাইতে ভালো; কিন্তু এর মধ্যেও অনেক বিষয় এমন রয়ে গেছে, ইমাম আশআরির দিকে যেগুলোর নিসবত সহিহ নয়। যুগে যুগে জালিয়াতিকারীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এমন মন্দ পন্থারই আশ্রয় নেয়। চার-চারটি হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিকে সামনে রেখেও যার কারণে প্রকৃত ‘আল-ইবানাহ’কে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

উদাহরণস্বরূপ, ‘আল-ইবানাহ’র প্রচলিত নুসখায় (পৃ. ১৬) রয়েছে:
وأنكروا أن يكون له عينـان مـع قولـه تجري بأعيننا..
এখানে আল্লাহ তাআলার জন্য দুটো আইন (শাব্দিক অর্থ: চোখ) সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ মূল ‘আল-ইবানাহ’ থেকে এ ইবারতটিকে ইমাম ইবনু আসাকির বহুকাল আগে উদ্ধৃত করেছিলেন (পৃ. ১৫৭) এভাবে:
وأنكروا أن يكون له عين...
যেখানে স্পষ্ট একটি ‘আইন’-এর কথা রয়েছে।
একইভাবে প্রচলিত নুসখায় (পৃ. ১৮) আরও রয়েছে:
وأن له عينين بلا كيف..
আরও (পৃ. ২২) রয়েছে:
وأن له سبحانه عينين بلا كيف
অথচ ইবনু আসাকিরে (পৃ. ১৫৮) রয়েছে এভাবে:
وأن له عيناً بلا كيف..

আপনি বলবেন, একবচন আর দ্বিবচনে কী পার্থক্য? পার্থক্য তো অনেক। একবচন ব্যবহার করলে তা কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আর দ্বিবচন ব্যবহার করলে তা বিদআত হয়। কারণ, কুরআন-সুন্নাহর কোথাও তা বিবৃত হয়নি।

বিদআত যে হয় এর প্রমাণ কী? এখানে তিনজন ইমামের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি; যাদের বক্তব্যের আলোকে ইন শা আল্লাহ বিষয়টি স্পষ্ট প্রতিভাত হবে:
শাইখ জাহিদ কাউসারি রহ. ইমাম বায়হাকির আল-আসমা ওয়াস-সিফাত গ্রন্থের ৩১৩ নম্বর পৃষ্ঠার টীকায় লেখেন:
(لم ترد صيغة التثنية في الكتاب ولا في السنة، وما يروى عن أبي الحسن الأشعري من ذلك فمدسوس في كتبه بالنظر إلى نقل الكافة عنه) ثم قال: (قال ابن حزم: لا يجوز لأحد أن يصف الله عز وجل بأن له عينين لأن النص لم يـأت بـذلك) اهـ.
কুরআন অথবা সুন্নাহয় দ্বিবচনের শব্দ বিবৃত হয়নি। ইমাম আবুল হাসান আশআরি রহ. থেকে দ্বিবচনের যে শব্দ বর্ণনা করা হয়েছে, তা তার কিতাবে পরবর্তীতে সংযোজন করা হয়েছে। তার থেকে এ বিষয়ক আকিদা বর্ণনাকারীদের সবার বর্ণনা সামনে রাখলে যা স্পষ্ট অনুমিত হয়। ইমাম ইবনু হাজম রহ. বলেছেন, কারও জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে আল্লাহকে দুটো ‘আইন’ (শাব্দিক অর্থ: চোখ)-এর গুণে গুণান্বিত করবে। কারণ, কোনো নসে তা বিবৃত হয়নি।

[illegible]

[illegible] :

يحسب بعض الجهلة أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما نفى العور عن الله عز وجل أثبت من دليل الخطاب أنه ذو عينين، وهذا بعيد من الفهم، إنما نفى العور من حيث نفي النقائص..

[illegible] :

قلت: وهذا ابتداع لا دليل لهم عليه، وإنما أثبتوا عينين من دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: " وإن الله ليس بأعور " وإنما أراد نفي النقص عنه تعالى

[illegible]

[illegible] :

إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له نقول: إن الله عز وجل مستوٍ على عرشه كما قال : (الرحمن على العرش استوى)

[illegible] :

نقول إن الله عز وجل استوى على عرشه استواءً يليق به من غير حلول ولا استقرار ..

[illegible]

[illegible] :

فكل ذلك يدل على أنه تعالى في السماء مستوٍ على عرشـه، والسماء بإجماع الناس ليست الأرض، فدل على أن الله تعالى منفرد بوحدانيته مستوٍ على عرشه

[illegible] :

فدل على أنه تعالى منفرد بوحدانيته مستوٍ على عرشه استواءً منزهاً عن الحلول والاتحاد

[illegible]

[illegible]

[illegible] :

ولم يزل كتاب الإبانة مُستصوباً عند أهل الديانة، وسمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن بشار البوشنجي المعروف بالخسروجـردي الفقيه الزاهد يحكي عن بعض شيوخه أن الإمام أبا عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني النيسابوري ما كان يخرج إلى مجلس درسه إلا وبيده كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، ويظهر الإعجاب به،

ويقول: ماذا الذي يُنكر على من هذا الكتاب شرح مذهبه. فهذا قول الإمام أبي عثمان وهو من أعيان أهل الأثر بخراسان.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وذكر هارون بن إسحاق الهمداني عن أبي نعيم عن سليمان بن عيسى القاري عن سفيان الثوري، قال: قال لي حماد بن أبي سليمان: بلِّغ أبا حنيفة المشرك أنِّي منه بريء ـ قال سليمان: ثم قال سفيان: لأنه كان يقول القرآن مخلوق.

وذكر سفيان بن وكيع قال عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال أخبرني أبي قال: الكلام الذي استتاب فيه ابن أبي ليلى أبا حنيفة هو قوله: القرآن مخلوق. قال: فتاب منه وطاف به في الخلق. قال أبي: فقلت له كيف صرت إلى هذا؟ قال: خفت أن يقوم عليّ، فأعطيته التقيّة.

وذكر هارون بن إسحاق قال سمعت إسماعيل بن أبي الحكم يذكر عن عمر بن عبيد الطنافسي أن حمّاداً ـ يعني ابن أبي سليمان ـ بعث إلى أبي حنيفة: إني بريء مما تقول، إلا أن تتوب. وكان عنده ابن أبي عقبة، قال، فقال: أخبرني جارك أن أبا حنيفة دعاه إلى ما استتيب منه بعد ما استتيب.

وذكر عن أبي يوسف قال: ناظرت أبا حنيفة شهرين حتى رجع عن خلق القرآن

[illegible]

[illegible]

وحاشى الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه من هذا القول بل هو زور وباطل فإن أبا حنيفة من أفضل أهل السنة

[illegible]

বাতিল। কারণ, ইমাম আবু হানিফা ছিলেন আহলুস সুন্নাহর শ্রেষ্ঠ মনীষীগণের মধ্যে অন্যতম।

এর কয়েক ছত্র পর ইবনু আবি আকাবাহর বক্তব্য :
أخبرني جارك أن أبا حنيفة دعاه لما استتيب منه بعد ما استتيب.
-এর পর পুনরায় তার কথা উল্লেখিত রয়েছে :
وهذا كذب محض على أبي حنيفة رضي الله عنه

এটা ইমাম আবু হানিফা রা.-এর ওপর নিরেট মিথ্যাচার।

এমনকি কোনো কোনো নুসখায় তো জালিয়াতি করে হাম্মাদ রহ.-এর ভাষ্যে ইমাম আবু হানিফা রহ.-কে মুশরিক পর্যন্ত অভিহিত করা হয়েছে। শাইখ জাহিদ কাউসারি রহ. ইমাম ইবনু কুতায়বার 'আল-ইখতিলাফ ফিল-লাফজ' গ্রন্থের টীকায় (পৃ. ৪৯) লেখেন :

ومن غريب التحريف ما دُسَّ في بعض نسخ الإبانة للأشعري كما دُسَّ فيها أشياء أخر من أن حمّاد بن أبي سليمان قال " بلِّغ أبا حنيفة المشرك أني بريء من دينه " وكان يقول بخلق القرآن. فإن لفظ حمّاد " بلّغ أبا فلان " لا أبا حنيفة! كما في أول خلق الأفعال للبخاري، وجعل من لا يخاف الله لفظ " أبا حنيفة " في موضع " أبا فلان " والله أعلم من هو أبو فلان هذا، وما هي المسألة..

ইমাম বায়হাকি রহ. তার 'আল-ইতিকাদ' (পৃ. ১১২) গ্রন্থে লেখেন :
روّينا عن محمد بن سعيد بن سابق أنه قال : سألت أبا يوسف فقلت : أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ فقال : معاذ الله، ولا أنا أقوله. فقلت : أكان يرى رأي جهم؟ فقال : معاذ الله، ولا أنا أقوله. رواته ثقات
মুহাম্মাদ ইবনু সাইদ রহ. বলেন, আমি আবু ইউসুফ রহ.-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'আবু হানিফা রহ.-কে বলতেন যে, কুরআন মাখলুক?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমিও এ কথা বলি না।' এরপর আমি তাকে বললাম, 'তিনি কি জাহামের মত পোষণ করতেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমিও এ কথা বলি না।' (ইমাম বায়হাকি রহ. বলেন,) এই বর্ণনার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

এ জালিয়াতির বিষয়টিকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন শাইখ ওয়াহবি গাওয়িজি হাফি. তার نظرة علمية في نسبة كتاب الإبانة جميعه إلى الإمام أبي الحسن

[illegible] ([illegible]. [illegible]) :

ولا بأس أن نقول: لو كان الإمام الأشعري رحمه الله تعالى نسب حقاً إلى الإمام ـ يعني أبا حنيفة ـ القول بخلق القرآن لما كان للإمام الأشعري تلك المكانة العالية عند الحنفية أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فلا تلتفت أيها القارئ إلى تلك النقول المبتورة مبتدأً والباطلة سنداً، وأحسن الظن بالإمام الأشعري كما تحسن الظن بإمام الأئمة الفقهاء وسائر الأئمة رضوان الله تعالى عليهم. وتذكر أنه أُدخِل الكثيرُ من الأباطيل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رُكّبت لها أسانيد باطلة، لكلمات باطلة. كذلك ولا تنس أنه حُشِر في كتب كثير من العلماء كلماتٌ وعبارات وحذف منها كلمـات وعبارات حتى في حيـاة أصحابها

[illegible]

([illegible])

শাশ্বত কালিমা

ALI HASAN OSAMA·SUNDAY, FEBRUARY 3, 2019

চেতনার শিকড় - ১

ইসলামের মূলভিত্তি হচ্ছে তাওহিদ। তাওহিদের কালিমা হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। তাওহিদের গুরুত্ব সকল ইবাদত, এমনকি সকল আকিদার চাইতেও বেশি। কুরআন মাজিদে এর প্রতি অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কুরআনের বিস্তৃত জায়গা জুড়ে এই তাওহিদের কথাই আলোচিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ -এর মক্কিজীবনে অবতীর্ণ সুরাগুলোতে তুলনামূলকভাবে এর আলোচনা সবচে বেশি স্থান পেয়েছে।

কারও কারও ধারণা, কুরআনের সম্বোধিত শ্রোতারা মুশরিক ছিল বিধায় হয়তো কুরআন তাদেরকে এই তাওহিদের দিকে বেশি পরিমাণে আহ্বান করেছেন, তাওহিদের কালিমাকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু মদিনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর, এমনকি ইসলামের সর্বোচ্চ বিধান জিহাদ পর্যন্ত নিয়মিত জারি থাকা সত্ত্বেও বারবার তাওহিদের কালিমার প্রতি গুরুত্বারোপ এ কথারই নির্দেশ করে যে, তাওহিদের কালিমার গুরুত্ব শুধু মুশরিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং এর গুরুত্ব মানবজীবনের প্রতিটি শাখায় পরিব্যাপ্ত। সুতরাং তাওহিদের কালিমা এমন কোনো কালিমা নয়, যা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করে তা রেখে অন্যান্য ধাপে পা রাখা হবে; বরং আমৃত্যুই এই কালিমা সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। জীবন-মৃত্যু সবকিছু কালিমার ওপরই হবে। যার কারণে বিভিন্ন আয়াতে মুমিনদের বিশেষভাবে সম্বোধন করে ইমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাওহিদকে আঁকড়ে ধরার আদেশ করা হয়েছে। এ থেকেই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, তাওহিদের কালিমা কেবল কাফির-মুশরিকদের জন্যই নয়; বরং এই কালিমা মুমিনদের জন্যও।

আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

[illegible]

[illegible]

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

[illegible]

সুতরাং ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ মুমিনের জীবনে এক শাশ্বত প্রক্রিয়া, যার কোনো সমাপ্তি নেই, কোনো বিরাম নেই। কাফিররা যেহেতু এই কালিমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাই এই কালিমা শুধু তাদের জন্য কিংবা মুশরিকরা যেহেতু এই কালিমার এককত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে না, বরং এর সঙ্গে অন্যদের অংশীদারত্ব স্থাপন করে, তাই এই কালিমা শুধু তাদের জন্য—বিষয়টি কখনোই এমন নয়। বরং এই কালিমার দিকে আহ্বান করা হবে মুমিনদেরও, যাতে করে তাদের জীবন হয় তাওহিদের আলোয় আলোকিত, তাদের অন্তর হয় জীবন্ত এবং তারা যেন উদাসীনতাকে ভেতরে কোনো প্রশ্রয় না দেয়। আর তাই স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই এই দাওয়াতি প্রক্রিয়া জারি করছেন: ‘হে ওই সকল লোকেরা যারা ইমান এনেছ, তোমরা ইমান রাখো...।’

তাওহিদের কালিমা শুধু মানুষকে মুমিনই বানায় না; বরং এই কালিমা মুমিনের সামনে উদ্ভাসিত করে এক আলোকোজ্জ্বল পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। কারণ, মানুষের অবলম্বিত জীবনব্যবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত যথাযথ হবে না, যতক্ষণ না সে সত্যের সামনে নির্দ্বিধ আত্মসমর্পণ করবে এবং সত্যকে পরম যতনে আঁকড়ে ধরবে। সত্য হলো, আল্লাহ তাআলা এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টা, রিজিকদাতা, নিয়ন্ত্রক, পরিচালক এবং মহাশক্তির আধার। তিনি ছাড়া এমন কেউ নেই, যে সকলের স্রষ্টা হতে পারে, সবার জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতে পারে কিংবা সকল বিষয়আশয় পরিচালনা করতে পারে। সুতরাং এর দাবিই হলো, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা হবে, তাঁর সামনেই নির্দ্বিধ আত্মসমর্পণ করা হবে, তাঁর দাসত্বকেই সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা হবে, তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা হবে না এবং তিনি ছাড়া অন্য কারও জন্য কোনোপ্রকার ইবাদত অর্পণ করা হবে না।

এটা শুধু বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার হকই নয়; বরং এ হলো বান্দার অস্তিত্বের সার্থকতা ও তার জীবনের পূর্ণতা। কারণ, আল্লাহ তাআলা যদিও সৃষ্টিজীবের এক ও অদ্বিতীয় প্রতিপালক ও উপাস্য হওয়ার

يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَ زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَ نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

[illegible]

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

[illegible]

[illegible]

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

[illegible]

[illegible]

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

[illegible]

[illegible]

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ

[illegible]

[illegible] [[illegible] : [illegible]-[illegible]]

[illegible]

[illegible] :

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

[illegible]? [[illegible] : [illegible]]

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

আপনি বলুন, কে তিনি, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালন করেন? আপনি বলুন, আল্লাহ। বলুন, তবুও তোমরা তাকে ছেড়ে এমন সব অভিভাবক গ্রহণ করলে, যাদের খোদ নিজেদেরও কোনো উপকার সাধনের ক্ষমতা নেই এবং অপকার সাধনেরও না? বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অথবা অন্ধকার ও আলো একই রকম হতে পারে? নাকি তারা আল্লাহর এমন সব শরিক সাব্যস্ত করেছে, যারা আল্লাহ যেমন সৃষ্টি করেন সে রকম কিছু সৃষ্টি করেছে, ফলে তাদের কাছে উভয়ের সৃষ্টিকার্য একই রকম মনে হচ্ছে? (কেউ যদি এ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে থাকে তবে তাকে) বলে দিন, কেবল আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি একাই এমন যে, তাঁর ক্ষমতা সবকছুতে ব্যাপ্ত। [সুরা রাদ: ১৬]

আরবের মুশরিকরা যেসব দেবতাদেরকে উপাস্য মনে করত ও তাদের পূজা- অর্চনা করত, তাদের সম্পর্কে তারা সাধারণভাবে এ কথা স্বীকার করত যে, জগত সৃষ্টিতে তাদের কোনো অংশীদারত্ব নেই। বরং সারা পৃথিবী আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। তবে তাদের বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রভুত্বের বহু ক্ষমতা তাদের ওপর ন্যস্ত করেছেন। তাই তাদেরও উপাসনা করা উচিত, যাতে তারা তাদের সে ক্ষমতা আমাদের অনুকূলে ব্যবহার করে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের পক্ষে সুপারিশও করে। এ আয়াতে প্রথমত বলে দেওয়া হয়েছে, এসব মনগড়া দেবতা খোদ নিজেদেরও কোনো উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না। কাজেই সে অন্যদের উপকার-অপকার করবে কী করে! তারপর বলা হয়েছে, এসব দেবতা যদি আল্লাহ তাআলার মতো কোনো কিছু সৃষ্টি করে থাকত তবে না হয় তাদেরকে আল্লাহ তাআলার শরিক সাব্যস্ত করার যুক্তি থাকত। কিন্তু না তারা বাস্তবে কোনো কিছু সৃষ্টি করেছে আর না আরববাসী এরূপ আকিদা পোষণ করত। এহেন অবস্থায় তাদেরকে আল্লাহ তাআলার শরিক সাব্যস্ত করে তাদের ইবাদত-উপাসনা করার কী বৈধতা থাকতে পারে!

রহমানের ইবাদতকারী ও শয়তানের উপাসনাকারীর জীবনধারাও কখনো এক হওয়ার নয়। আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ (12) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (13) أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ

[illegible]

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (18) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (19) لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ

[illegible]

সুতরাং ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ স্রেফ এক কালিমাই নয়, বরং তা পূর্ণাঙ্গ এক দীনের শিরোনাম। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শুধু কাফির ও মুশরিকদের জন্যই নয়; বরং এই কালিমা প্রতিটি মুমিনের জন্য। এই কালিমা নফস ও শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচানোর জন্য, নিজেকে আল্লাহর রঙে রঙিন করার জন্য। এই কালিমা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং বাতিলের প্রাসাদ চূর্ণ করার জন্য। এই কালিমা তাগুতের প্রতাপ মিটিয়ে দিয়ে মহান প্রতিপালকের শাশ্বত জীবনবিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

চলবে ইনশাআল্লাহ ...

ইসলাম ও জাহিলিয়্যাতের সংঘর্ষ

ALI HASAN OSAMA·SUNDAY, FEBRUARY 3, 2019

চেতনার শিকড় - ২

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ছিল সকল নবির দাওয়াত। সর্বযুগেই এই কালিমা ছিল তাওহিদের কালিমা। আর প্রতিযুগেই তাওহিদের কালিমার প্রতিপক্ষ হয়েছিল জাহিলিয়্যাত। ইসলাম এবং জাহিলিয়্যাত কখনো মিশ্রিত হয়নি, এক পাত্রে একত্রিত হয়নি। সময় বদলেছে। বাহ্যিক রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু মৌলিক উপাদান সর্বদা ছিল এক ও অভিন্ন। কুরআনের দর্পণে একবার ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলানো যাক:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (26) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا

وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ

[illegible]

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ... قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61) قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ

[illegible]

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ... قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا

أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

[illegible]

[illegible]

(দ্রষ্টব্য—সুরা ইয়াসিন: ৭১)। সুতরাং এ মালিকানায় নিজ ইচ্ছামতো বিধি-নিষেধ আরোপ করার (দ্রষ্টব্য—সুরা কাসাস: ৭৭)এবং যেখানে ভালো মনে করেন ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়ার এখতিয়ার তাঁর রয়েছে (দ্রষ্টব্য—সুরা নুর: ৩৩)। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসব বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় এ জন্য, যাতে প্রত্যেকে নিজ অর্থ-সম্পদের আয়-ব্যয় সুষ্ঠু সঠিক পন্থায় সম্পন্ন করে। ফলে আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রত্যেকে সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। কেউ কারও প্রতি জুলুম করতে পারবে না এবং সকলের মধ্যে ইনসাফের সাথে অর্থ-সম্পদ বণ্টিত হবে।

আরব্য জাহিলিয়্যাতও নবোদ্ভাবিত কোনো জাহিলিয়্যাত ছিল না। বরং তা ছিল পূর্বের ধারা থেকে উৎসারিত একটি শাখা মাত্র। আরবজাতির কালিমার বিপরীত অবস্থানের সূত্র কেবল একটি বাক্য ছিল না, বরং সূত্র ছিল সেই বাক্যের অন্তর্ভুক্ত আদর্শ ও মর্ম। অন্যথায় এটা কীভাবে ভাবা যায় যে, কেবল একটি বাক্যের জন্য কুরাইশ গোত্র এই চরম বিরোধপূর্ণ পর্যায়ে উপনীত হবে। কেবল একটি বাক্যের জন্য তারা নিজেদের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, বুকের তাজা খুন বইয়ে দেবে, যুদ্ধের পর যুদ্ধ চালিয়ে যাবে আর তাদের সঙ্গে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীও এসে দলে দলে যোগ দেবে, এরপর সকলে মিলে নিজেদের মুখের ফুৎকারে সত্যের প্রদীপ নিভিয়ে দিতে প্রয়াসী হবে।

কুরাইশের ইতিহাস ছিল, তাদের কোনো গোত্রে সাধারণ কোনো কবির জন্ম হলে এ নিয়ে তারা অন্যদের ওপর গর্ব করত। অহংকারে তাদের বুক ফুলে যেত। সেখানে একজন নবির আবির্ভাব ছিল কত বড় গর্ব ও অহংকারের বিষয়! তদুপরি কুরাইশ ছিল ধর্মপরায়ণ জাতি। পুরো আরবের মধ্যে তাদের ছিল সবিশেষ ধর্মীয় মর্যাদা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাইতুল্লাহর খেদমতে তারা নিজেদের উৎসর্গ করে রেখেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে একজন নবির আবির্ভাব সকল দৃষ্টিকোণ থেকেই তাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট ছিল। এমনকি এর দ্বারা তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটাও স্বাভাবিক ছিল।

তারা কালিমার বিরুদ্ধে এই চরম শত্রুভাবাপন্ন অবস্থান কেন গ্রহণ করল, যদি কালিমা স্রেফ একটি বাক্যই হতো! মানুষ দিনরাত কত কথাই বলে। একটি বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা এমন কী আহামরি ব্যাপারই বা! রাসুলুল্লাহ -এর চাচা আবু তালিব—সারাজীবন যিনি প্রিয়নবির মাথার ওপর মেঘ হয়ে ছায়া দিয়েছেন, সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে তাকে রক্ষা করেছেন—যখন মুমূর্ষু, রাসুলুল্লাহ তাকে কতবার অনুরোধ করেছেন:

'হে চাচা, আপনি শুধু এই কালিমাটা বলুন। আমি এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আপনার জন্য সুপারিশ করব।'

আবু তালিবের মতো একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির ব্যাপারে কি এটা ভাবা যায় যে, তিনি অনন্তকালের জন্য শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলেন, অথচ একটিমাত্র বাক্য বলার সৎ সাহস করতে পারলেন না, যদি এই বাক্যটি কেবল সাধারণ একটি বাক্যই হয়ে থাকে!

এ থেকে স্পষ্ট অনুমিত হচ্ছে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্য নিয়ে তাদের আপত্তি ছিল না। বরং তাদের আপত্তি ছিল এই বাক্যের মধ্যস্থিত মর্ম ও আদর্শ নিয়ে। এই বাক্য তাদের এমন কোনো জীবনধারার দিকে আহ্বান করছিল, যা ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবনাধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অভিনব। যার নির্দেশ ও নির্দেশনা জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তারা এতকাল যে জীবনাচার ধারণ করে আসছিল আর নতুন করে তাদের যে জীবনাচারের দিকে আহ্বান করা হচ্ছিল—এ দুয়ের মধ্যে ছিল বিস্তর তফাৎ, যোজন যোজন দূরত্ব। তাওহিদের কালিমার প্রতি তারা যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ লালন করত, এর পেছনে অনেক কারণই ছিল। যেমন, তারা মুহাম্মাদ -এর ওপর ওহি অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করত। তারা কিয়ামতের দিনের পুনরুত্থান ও সৃষ্টিজীবের একত্রিত হওয়া এবং প্রতিটি কর্মের বিচার হওয়ার বিষয়টিকে অবিশ্বাস করত। তারা অসংখ্য উপাস্যকে এক উপাস্যে পরিণত করাকে মেনে নিতে

[illegible]

[illegible] :

1. [illegible]

2. [illegible]

[illegible] :

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

[illegible]? [illegible]!
[illegible : [illegible]-[illegible]]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (21) وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

যারা শিরক অবলম্বন করেছে, তারা বলে, আল্লাহ চাইলে আমরা তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করতাম না—না আমরা আর না আমাদের বাপ-দাদারা এবং আমরা তার হুকুম ছাড়া কোনো জিনিস হারামও সাব্যস্ত করতাম না। তাদের পূর্বে যে সকল জাতি গত হয়েছে, তারাও এরকমই করেছিল। কিন্তু স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছানো ছাড়া রাসুলগণের আর কোনো দায়িত্ব নেই। [সুরা নাহল: ৩৫]

এই আয়াত দুটিতে আরবজাতির এবং তাদের পূর্ববর্তী জাতিগোষ্ঠীর শিরকের সূত্র বিবৃত হয়েছে। শরিয়াহর সুস্পষ্ট বিধিবিধান থেকে দৃষ্টি রইয়ে পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি আঁকড়ে ধরার কারণেই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা তাদের পথভ্রষ্টতার অপরাধ নিজেদের কাঁধে না নিয়ে আল্লাহর দিকে ছুড়ে দিয়েছে, যেমনটা তাদের পূর্বে ইবলিসও করেছিল।

চলবে ইনশাআল্লাহ...

ইসলাম ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

ALI HASAN OSAMA·THURSDAY, FEBRUARY 14, 2019

চেতনার শিকড় - ৩

রাসুলগণ যখনই তাওহিদের দাওয়াত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তখনই তাদের প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়িয়েছে দুই শ্রেণি: (ক) ক্ষমতাধর শ্রেণি, (খ) সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ। মৌলিকভাবে তাঁদের বিরোধিতায় সরব হয়ে ওঠে ক্ষমতাধর শ্রেণি আর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সর্বদা ক্ষমতাধরদেরই অনুগামী হয়ে থাকে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ পূর্বপুরুষের রীতি আঁকড়ে ধরে থাকতেই ভালোবাসে। ঐতিহ্য সংরক্ষণকে তারা বড় পুণ্যের কাজ মনে করে। আজকের সমাজেও যারা বিদআতি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, তাদের সত্যের দাওয়াহ করা হলে অধিকাংশজনই পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য সংরক্ষণের অজুহাত প্রদর্শন করে। আমাদের দীনি মহলেও বড়দের ভুল আঁকড়ে ধরে রাখার এক চেতনা তার অনুসারী ও বংশধরদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়—তাত্ত্বিকভাবে এই মূলনীতি স্বীকার করলেও অধিকাংশজনই নিজেদের অনুসৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই মূলনীতির প্রয়োগে বিশ্বাসী নয়। আর তাই কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য প্রমাণের মোকাবেলায় তারা কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিরুচি-কর্মপন্থাকে প্রাধান্য দেয়। তারা সত্যকে দেখেও দেখতে চায় না। বুঝেও বুঝতে চায় না। তারা এক কথা বলেই সব তর্কের অবসান ঘটাতে চায়—‘বাস্তবে বিষয়টা যদি এমনই হতো তাহলে তিনি বা তারা এত বড় হওয়া সত্ত্বেও কি তা বুঝতেন না! তার মানে এখানে সূক্ষ্ম কোনো বিষয় রয়েছে, যা আমাদের বোধগম্য নয়। তাই আমরা তাদের অন্ধ অনুসরণকেই নিজেদের ইহ-পরকালের সাফল্যের মাপকাঠি মনে করি।’

মানুষ সাধারণত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে অস্বীকার করতে পারে না। স্রষ্টার অস্তিত্ব, মৃত্যু-পরবর্তী পুনরুত্থান, নবি-রাসুলগণের উপস্থিতি, ফেরেশতা ও জিনজাতির অস্তিত্ব ইত্যাদি বিষয় নির্দ্বিধ অস্বীকার করলেও পৃথিবীর কোনো অবিশ্বাসীকে মৃত্যুর মতো ধ্রুবসত্য অস্বীকার করতে দেখিনি। কারণ, মৃত্যু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর উপরিউক্ত বিষয়গুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। মৃত্যুর পর এ বিষয়গুলোও যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে তখন মানুষ আর এগুলোকেও অস্বীকার করতে পারবে না। পরকালে তাই কোনো অবিশ্বাসীই খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানুষের এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়—এমন বিষয় নির্দ্বিধ অস্বীকার করার চেতনাই যুগে যুগে তাদের দীনের বিরুদ্ধাচারণ করার প্রতি অনুপ্রাণিত করেছে। যদিও সবক্ষেত্রে তারা এই মূলনীতির ওপর অটল থাকতে পারেনি। মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ ছাড়াই দু-জন মানুষকে সর্বদা বাবা-মা ডেকে আসছে। অথচ তারা তার জন্মদাতা হওয়ার

পক্ষে কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণই তার কাছে নেই। মানুষ তার দুর্বল চোখ দ্বারা স্রষ্টাকে দেখতে চায় , অথচ তার চোখ তো এতই দুর্বল যে , নির্ধারিত সীমানার বাইরের দূরত্বের দৃশ্যও তা পরিব্যাপ্ত করতে পারে না। এমনকি মানুষের চোখ বিশ্বের এতকিছু দেখার সক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও সরাসরি তার নিজের চোখকেই দেখতে পারে না। এমনকি চোখের নিকটবর্তী অঙ্গগুলোকেও সে স্পষ্ট দেখে না। সে দেখে না আবরণে আচ্ছাদিত অঙ্গগুলোকে। দেখে না বিপরীত দিকে অবস্থিত বস্তুসমূহকে। এসব কিছুই তো দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতার উজ্জ্বল প্রমাণ। এরপরও অবিশ্বাসীরা দাবি করতে চায় :

أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً

আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ দেখাও। [সুরা নিসা : ১৫৩]

তো মানুষ যখন মূর্তিপূজা করে , কল্পিত দেবদেবীর জন্য মানত করে , পশু জবাই করে তাদের চরণে কুরবানি উৎসর্গ করে , বিপদে ও পূজা চলাকালে তাদের সামনে সিজদাবনত হয় তখন তাদের ভেতরে এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এতে তারা নিজেদেরকে স্রষ্টার নিকটবর্তী ভাবতে থাকে।

অপরপক্ষে ক্ষমতাধর শ্রেণির দীনবিদ্বেষের পেছনে মূল কারণ থাকে হাকিমিয়্যাহ। তারা সরাসরি নিজেদের ক্ষমতা , জনবল ও অস্ত্রবল ব্যবহার করে নিজেদের মুখের ফুঁৎকারে সত্যের প্রদীপকে নিভিয়ে দিতে চায়। এ ক্ষেত্রে কল্পিত দেবদেবীর প্রেম তাদের ভেতর যতটা না কার্যকর থাকে , তারচে বহুগুণ বেশি কার্যকর থাকে অবাধ নেতৃত্ব ও ক্ষমতার মোহ। দেবদেবীর প্রতি তারাও ভালোবাসা প্রদর্শন করে ; কিন্তু তা যতটা না বাস্তবিক , তারচে বেশি বাহ্যিক। বরং তারা এই ভালোবাসা প্রদর্শন করে জনসাধারণের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য। অন্যথায় আদতে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে একরকম উপাস্যের আসনে আসীন

করে রাখে এবং তাদের প্রণীত বিধিবিধানকেই সকলের জন্য শিরোধার্য মনে করে আর তার অন্যথা করাকে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে। তাদের দীনবিদ্বেষের পেছনে মূল সূত্রই হলো ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। জনসাধারণের শাসক কে হবে? কে এই জাতির শাসন করবে? তারা নাকি আল্লাহ? যদি তারা দীনের সামনে আত্মসমর্পণ করে তাহলে তাদের জন্য শরিয়াহ মেনে চলা অপরিহার্য। তখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের বিধিবিধান ও নির্দেশ-নির্দেশনার বাইরে গিয়ে জনসাধারণের ওপর কর্তৃত্ব করা যাবে না। তাদের আইন-কানুন, বিধান-সংবিধান সবকিছু শরিয়াহর অনুগামী রাখতে হবে। ফলে তারা হারাবে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য, হারাবে অবাধ স্বাধীনতা। এটা মেনে নেওয়া ছিল তাদের জন্য দুষ্কর।

যুগে যুগে ক্ষমতাধর শ্রেণির 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রতি বিদ্বেষ লালনের পেছনে মূল কারণ এটাই ছিল। তারা এতকাল নিজেরাই বিধিবিধান প্রণয়ন করে এসেছে। মুক্ত স্বাধীনভাবে জনগণের শাসন ও বিচারকার্য পালন করেছে। এখন ইসলাম এসে তাদের জানাচ্ছে যে, এসব কিছু তাদের অধিকার নয়। বরং এসবই মহান প্রতিপালকের অধিকার, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, জীবন দান করেছেন, রিজিক প্রদান করেছেন এবং যার হাতেই তাদের জীবন ও মৃত্যু, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ছাড়া অন্য কারও জন্যই সিদ্ধ-নিষিদ্ধ করা, বৈধ-অবৈধ'র বিধান প্রণয়ন করার অধিকার নেই। হ্যাঁ, যদি আর কেউ তাঁর মতো সৃষ্টিকর্তা, জীবনদাতা, জীবিকা প্রদানকারী, অনুগ্রহকারী, নিয়ন্ত্রক ও প্রতিপালক হতো তাহলে ভিন্ন কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলো:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। [সুরা শুরা: ১১]

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

তবে কি যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি ওই সত্তার মতো, যে সৃষ্টি করে না। এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? [সুরা নাহল : ১৭]

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

আল্লাহ ছাড়া কি কোনো স্রষ্টা রয়েছে, যিনি আকাশ ও পৃথিবী থেকে তোমাদের জীবিকা প্রদান করে? তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। এরপরও তোমরা উল্টো পায়ে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছ? [সুরা ফাতির : ৩]

ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা সর্বদাই এই প্রোজ্জ্বল বাস্তবতা ভুলে যায়। তারা ভুলে যায় এই বিশ্বাসের কথা। ভুলে যায় নিজেদের কর্তব্য ও অপরিহার্য দায়ের কথা। তারা সব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে অবাধ স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চায়। কখনো তারা রাজার কথাকেই সর্বোচ্চ কথা হিসেবে সিদ্ধান্ত প্রদান করে আর কখনো-বা জনগণের সঙ্গে গণতন্ত্রের ধোঁকার খেলা খেলে। তবে সবক্ষেত্রেই তারা নিজেদেরকে আসীন করে বিধানদাতা ও শরিয়াহ প্রণেতার আসনে।

এরপর যখন রাসুল এসে তাদের সামনে নিঃসঙ্কোচে তাদের আহ্বান জানান—‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কোরো। কারণ, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই।’ তখন পুরো বিষয়টি পাল্টে যায়। এতকাল তারা পরস্পরে বিবাদ করে এসেছে, কে গ্রহণ করবে শাসনভার! কে হবে রাজাধিরাজ! কে দাসত্বের মালা পরাবে জনগণের ঘাড়ে! কতটুকু শাসনক্ষমতা থাকবে তাদের হাতে আর কতটুকু দেখানো হবে জনগণের কর্তৃত্বে! এখন রাসুল এসে তাদের আহ্বান জানাচ্ছে, তাদের হাতে কোনো মুক্ত স্বাধীন শাসনক্ষমতাই থাকবে না। বরং পুরো মানবজাতির থেকে এর অধিকার কেড়ে নিয়ে তা প্রদান করা হবে একমাত্র মহান প্রতিপালককে। তিনিই হবেন বিধান প্রণয়ন ও বৈধ-অবৈধ নির্ধারণের এক ও অদ্বিতীয় ক্ষমতার অধিকারী।

[illegible]

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

[illegible]

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (75) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76) قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (77) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ

[illegible]

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

এভাবেই ফিরআউন নিজ সম্প্রদায়কে বেকুব বানাল এবং তারাও তার কথা মেনে নিল। প্রকৃতপক্ষে তারা সকলে ছিল পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়। [সুরা জুখরুফ : ৫৪]

উল্লেখ্য, শেষোক্ত আয়াতে যেমন ফিরআউনকে পাপিষ্ঠ বলা হয়েছে, একইভাবে তার সম্প্রদায়কেও পাপিষ্ঠ বলা হয়েছে। ফিরআউনকে পাপিষ্ঠ বলার কারণ, সে তার রাজত্বকে ঈশ্বরত্বের নিদর্শন সাব্যস্ত করে নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছিল এবং এভাবে সে নিজ সম্প্রদায়কে বেকুব বানিয়েছিল। তার সম্প্রদায়কে পাপিষ্ঠ বলার কারণ হলো, তারা এরূপ চরম বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে নিজেদের রাজা মেনে নিয়েছিল এবং তার যাবতীয় গোমরাহি কাজে তার আনুগত্য করেছিল। এর দ্বারা জানা গেল, কোনো পথভ্রষ্ট লোক যদি কোনো জাতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে আর তারা তার পতন ঘটানোর চেষ্টা করার পরিবর্তে তার প্রতিটি অন্যায় কাজে তার আনুগত্য করে যায়, তবে তার মতো তারাও অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় তাওহিদের দাওয়াত নিয়ে আবির্ভূত হন তখন সেখানেও একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। মক্কায় কুরাইশ ছিল ক্ষমতাধর সম্প্রদায়। তারা ইসলামের উজ্জ্বল প্রদীপকে নিজেদের মুখের ফুঁৎকারে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল। কিন্তু তাদের এই শত্রুতা নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যক্তিত্বের প্রতি ছিল না। বরং তাদের শত্রুতা ছিল নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াতের প্রতি। আল্লাহ বলেন :

فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

বস্তুত তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না। বরং জালিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। [সুরা আনআম : ৩২]

এ জন্যই তো দেখা যায়, প্রচণ্ড শত্রুতার সময়ও তারা রাসুলুল্লাহ □-এর সামনে নেতৃত্ব, ক্ষমতা এবং সুন্দরী নারীর প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। তারা যেকোনো মূল্যে রাসুলুল্লাহ □-কে তার দাওয়াতি মিশন থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তাকে নিজেদের নেতা মেনে নিতেও তাদের কোনো আপত্তি ছিল না। এ থেকেই সহজে অনুমেয়, তাদের শত্রুতা নবি মুহাম্মাদ □-এর ব্যক্তিত্বের প্রতি ছিল না; বরং ছিল তার তাওহিদের আহ্বান-সংবলিত দাওয়াতের প্রতি।

মানুষ চায় স্রষ্টার দাসত্ব পরিত্যাগ করতে আর স্রষ্টা চান, মানুষ তার দাস হয়ে জীবন পরিচালনা করুক। এই দ্বিমুখী মানসিকতার ফলাফলেই রচিত হয়েছে ইসলাম ও জাহিলিয়্যাতের সংঘর্ষ, ইসলাম ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।

চলবে ইনশাআল্লাহ ...